চার দেওয়াল

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দোলার স্বামী তুহিন সেলস অফিসার, প্রায়ই অফিসের কাজে সে বাইরে বাইরে ঘোরে। ছেলে তিতান কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন নিয়ে জোর মজে আছে। মেয়ে তিয়া মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্টের একটা কোর্স করার পাশাপাশি চাকরিও করছে। হালফিল তিয়া ঢুকেছে এক গাড়ি ডিস্ট্রিবিউটারের শো-রুমে। তিয়ার বয়ফ্রেন্ড সূর্য। সবাই যার যার মতো ব্যস্ত। শুধু দোলারই নিজস্ব জীবন নেই, সে সবার জীবনের সহকারিণী মাত্র। কিশোরী বয়সে দোলা অংশুদার নাটকের গ্রুপে কাজ করেছে কিছুদিন। অংশুদা তাদের হিরো ছিল। হঠাৎ এতদিন পরে আবার মধ্যবয়সী দোলা অংশুদার ফোন পায়, আবার থিয়েটারে ফিরে আসার প্রস্তাব তাকে টলিয়ে দেয় কিছুটা। কিন্তু জীবন বদলানোর সাহস তার কই? এদিকে তিয়ার সঙ্গে আলাপ হয় ইন্দ্রজিৎ রায়ের, যে মূক-বধিরদের নিয়ে একটা এন. জি. ও চালায়। ক'দিন পরেই টিভির খবরে জানা যায় ইন্দ্রজিৎ স্বপ্নের মানুষ নয়, আসলে একজন প্রতারক। তিয়া ভেঙে পড়তে পড়তে টের পায়, ইন্দ্রজিৎ যেমন প্রতারক, তেমনই সূর্য একজন আধিপত্যবাদী। অসুস্থ হয়ে পড়ে তিয়া। অবশেষে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নেয় সে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'চার দেওয়াল' উপন্যাস স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আশ্চর্য এক কাহিনি।

১০০.০০

ISBN 81-7756-693-8

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম ভাগলপুরে, ২৫ পৌষ ১৩৫৬ (১০ জানুয়ারি, ১৯৫০)। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতায়। কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিত জীবনের শুরু। আবার কলেজে পড়তে পড়তেই চাকরিজীবনে প্রবেশ।
বহু ধরনের বিচিত্র চাকরির পর এখন সরকারি অফিসারের পদ থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। তবে লেখালেখিতে মনোযোগী হয়েছেন সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে।
নারীদের একজন হয়ে তাদের নিজস্ব জগতের যন্ত্রণা, সমস্যা আর উপলব্ধির কথা লিখতে আগ্রহী তিনি। সুচিত্রার লেখাতে বারবারই ঘুরে-ফিরে আসে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের আত্মিক দিক, নানান জটিলতা। এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কাছের মানুষ' বৃহত্তম রচনা। পরিশ্রমী এই লেখিকা নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। 'দহন' উপন্যাসের জন্য কর্নাটকের শাশ্বতী সংস্থা থেকে পেয়েছেন নন্‌জনাগুড়ু থিরুমালাম্বা জাতীয় পুরস্কার ১৯৯৬। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী পদক, শরৎ সাহিত্য পুরস্কার, দ্বিজেন্দ্রলাল পুরস্কার, শৈলজানন্দ পুরস্কার, তারাশঙ্কর পুরস্কার, কথা পুরস্কার, সাহিত্যসেতু পুরস্কার প্রভৃতি।

প্রচ্ছদ নির্মলেন্দু মণ্ডল

চার দেওয়াল

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

চিত্রা লাহিড়ী-কে

আজ খেয়ে উঠে স্নানে ঢুকেছিল দোলা। চার দিন শ্যাম্পু করা হয়নি, অনেকক্ষণ ধরে মাথা ঘষেছে আজ। এ পাড়ার জলটা খুব খারাপ, নিয়মিত তেলসাবানের যত্ন না নিলে হুহু করে চুল ওঠে।

তেতলার পুঁচকে ব্যালকনিটায় তোয়ালে মেলতে এসে দোলা টের পেল, রোদ্দুরের আজ বড় তাত। কী যে ছাই হচ্ছে, আবহাওয়ার কোনও ছিরিছাঁদ নেই। এ বছর শীত তো তেমন পড়লই না। এদিকে মাঘ না ফুরোতেই দুপদাপিয়ে এসে গেছে গরম। এখনই যেন দুপুরবেলাটায় গা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। গোটা পৃথিবীরই নাকি উষ্ণতা বাড়ছে ক্রমশ। টিভিতে সে দিন দেখাচ্ছিল, নানান হাবিজাবি গ্যাসের দাপটে বায়ুমণ্ডলের কী সব স্তর নাকি ফেটেফুটে গেছে, এই তাপবৃদ্ধি নাকি তারই পরিণাম। পাহাড়-পর্বতে শতসহস্র বছর ধরে জমে থাকা হিমবাহ পর্যন্ত গলে যাচ্ছে দ্রুত। এমন ধারা চলতে থাকলে শীত গ্রীষ্মের মাঝে বসন্ত ঋতুটা কি আর থাকবে?

অবশ্য কংক্রিটের জঙ্গলে বসন্তকে তো টের পাওয়াই ভার। তেলে-ধুলোয় মলিন গাছে দু'-চারটে ফুল ফোটে বটে, ব্যস ওই পর্যন্তই। বছর পাঁচেক আগেও দোলারা যখন এ পাড়ায় ফ্ল্যাট কিনে উঠে এল, সবুজের ছিটেফোঁটা ছিল এদিক ওদিক। পিছনের জমিটাতেই তো গাছ-আগাছার মাঝে একটা কৃষ্ণচূড়া লকলক বেড়ে উঠছিল। কচি গাছ, তাও চৈত্রমাসে লালে লাল। কোথায় সেই কৃষ্ণচূড়া, এখন সেখানে দামড়া ফ্ল্যাট। বাইপাসের দিকটাতে তো ধড়াধড় হাইরাইজ উঠছে। দখিনা বাতাস যদি বা আসে এ দিকে, ঠেকে ঠেকে। ইটলোহায় ঠোক্কর খেতে খেতে।

গেটে ট্যাক্সি থামল একটা। পাশের ব্লকের দোতলার গার্গী ছেলে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরল। বরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে গার্গীর, কী এক কস্‌মেটিক্স কোম্পানির এজেন্সি নিয়ে ছেলেটাকে একাই মানুষ করছে। ইদানীং মা-ও এসে থাকছে বুঝি। পাশের ফ্ল্যাটের মন্দিরা বলে, ওই এজেন্সি ফেজেন্সি নাকি কামোফ্লেজ, গার্গী নাকি ধান্দায় নেমে গেছে। কে জানে বাবা কী, তবে শুনতেও তো খারাপ লাগে। কী যে ছাই হচ্ছে আজকাল!

টুকটাক ভাবনার মাঝেই টেলিফোনের ঝংকার। কান পেতে দোলা শুনল দু'-এক সেকেন্ড। কার ফোন? দিদি? এই দুপুরবেলাটাই তো দিদির গল্পগাছার সময়। এ কথা সে কথার পর ঘুরেফিরে সেই বাবান। মেলবোর্ন থেকে বাবান ফোনে কী কী বলল, বাবানের বউ সেখানে এখন কোন কোন রান্নায় পোক্ত হয়েছে, উইকএন্ডে তারা ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল...। কাছে যখন ছিল সারাক্ষণ ছেলে ছেলে করেছে, দূরে গিয়েও এখনও বাবানই দিদির টাইমপাস। বাবানের কথা ভেবেই না ই-মেল করা পর্যন্ত শিখে নিল! অবশ্য দ্বিপ্রাহরিক টেলিফোন মাতৃদেবীর হওয়াও বিচিত্র নয়। ভাইয়া-ঝুমা অফিসে, নাতনি স্কুলে, এই অবসরেই না মেয়েদের কাছে বধূনিন্দার পাটটুকু চুকিয়ে নেয় মা।

শোওয়ার ঘর ভেদ করে দোলা লিভিং হলে এল। হল বলাটা অবশ্য ব্যজস্তুতি। তিতানের ভাষায় খড়মের হাফসোল। মাত্র আটশো নব্বই স্কোয়্যার ফিটে তিন তিনখানা ঘর, দুটো টয়লেট, কিচেন ব্যালকনি পুরে দিলে হল আর বেরোবে কোথ্থেকে! আদতে এক ফালি এল শেপের জায়গা, যার এক দিকে খাওয়া, অন্য দিকে বসা। ঠেসেঠুসে। চেপেচুপে।

টেলিফোন থাকে বসার জায়গায়। বেঁটে মতন চৌকো টেবিলে। অলস হাতে রিসিভার তুলে দোলা একটু নাড়া খেয়ে গেল। মা নয়, দিদি নয়, অংশুদা!

কী খবর দোলনচাঁপা? কেমন আছ?

পরিশীলিত চর্চিত ওই কণ্ঠস্বর এক ধাক্কায় দোলার উনপঞ্চাশ বছর বয়সটাকে যেন কয়েক ধাপ কমিয়ে দেয়। নাটুকে ভঙ্গিতে দোলা বলে উঠল,— হঠাৎ অভাগিনীকে স্মরণ এল যে বড়?

তোমায় ভুলব কেন ভদ্রে? আমার কি স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে?

তা হলে এত দিন সাড়াশব্দ নেই কেন?

অ্যাই মেয়ে, তুমি বছরে ক'বার ফোন করো? আমি নয় সাত কাজে থাকি, তুমি তো ঘরেই বসে...। মাসে দু'মাসে একটা রিং করলে কি বরের বেশি পয়সা খরচা হয়?

পলকের জন্য দোলার মনে পড়ল, গত মাসেই টেলিফোনের বিল দেখে খ্যাচখ্যাচ করছিল তুহিন। ফোনে আড্ডা মারার সময়ে টাইমটার দিকেও একটু নজর রেখো! বকবক করেই চলেছ, করেই চলেছ...! অথচ মেয়ে যে ঘন্টার

পর ঘন্টা ইন্টারনেটে বসে, চ্যাট চলছে, গেমস চলছে... সে কথা বাবুর মাথায় থাকে না। কিংবা হয়তো থাকে। মেয়েকে সরাসরি বলতে পারে না, দোলার ওপর চোটপাট।

ক্ষণিকের তিক্ততা সরিয়ে রেখে দোলা একটা আহ্লাদি আহ্লাদি ভাব ফোটাল গলায়,— আচ্ছা বাবা আচ্ছা, সব দোষ আমার।... আপনাদের খবর বলুন। রানিবউদি কেমন আছেন?

আরে সে তো এক জবরদস্ত কেলো করেছিল। দিল্লিতে কল-শো করতে গিয়ে, ঠান্ডা-ফান্ডা লাগিয়ে, লাস্ট মোমেন্টে তার স্বরযন্ত্র বিকল। গলা দিয়ে হড়হাঁসের মতো আওয়াজ বেরোচ্ছে।

তার পর? কী করলেন?

একটা শো শর্মিষ্ঠাকে দিয়ে ম্যানেজ করলাম। বাকি দুটোয় রানি জোর করে নামল। আমাদের অপযশ হল খানিকটা।

কী যে বলেন! রানিবউদির স্টেজ অ্যাপিয়ারেন্সের মূল্যই আলাদা।

সে তো তোমাদের কাছে। যারা গ্যাঁটের কড়ি খসিয়ে আমাদের নিয়ে গেছে, তারা তো হানড্রেড পারসেন্টই চাইবে।... আমাদের শর্মিষ্ঠাও যদি ঠিকঠাক ম্যাচিওর করে যেত, তা হলে এই প্রবলেমগুলো আর হয় না।

শর্মিষ্ঠা কি এখনও স্টেজ-শাই আছে?

তা হয়তো নেই। তবে একটা বড় রোল ক্যারি করার ক্ষমতাও তো নেই। আর আমাদেরও কপাল, একটা ভাল মেয়ে পাচ্ছি না। তুমি যখন আসতে... ভেবেছিলাম যাক, গ্রুপে তাও একটা ফিমেল বাড়ল। তা তুমিও তো সংসারের ছুতো দেখিয়ে কেটে পড়লে।

ছুতো নয়, অসুবিধে তো দোলার সত্যিই হচ্ছিল। ঘরের লোক যদি রোজ রোজ অসন্তোষ প্রকাশ করে, কারণে অকারণে তার নাটকের প্রতি আগ্রহকে কটাক্ষ হানে, কাঁহাতক ভাল লাগে! অশালীন মন্তব্যও তুহিন কম করেনি। ওই অশান্তি বুকে নিয়ে গ্রুপে যাওয়া...! তার চেয়ে বরং জানলাটা বন্ধই থাক। সংসারে সুখের চেয়ে স্বস্তিই তো শ্রেয়, নয় কি?

জোর করে চপল হল দোলা। খিলখিল হাসছে,— কী যে বলেন...! আমায় দিয়ে থোড়াই আপনাদের কাজ চলত! দেখেননি, রিহার্সালে প্রক্সি দিতে গিয়েই কেমন ঠকঠক কাঁপতাম!

সে নয় একটু গড়েপিটে নেওয়া যেত। অন্তত একটা ফিমেল তো বাড়ত।

দ্বিতীয় বার উচ্চারিত বাক্যটি টুং করে বাজল দোলার কানে। একটা ফিমেল তো বাড়ত...! বটেই তো, সে তো শুধুই একটা সংখ্যা। ফিমেল ক্যারেক্টার। ঘরেও। বাইরেও। অংশুদাও তাকে তার বেশি কিছু ভাবে না।

এবারও হালকা বিষাদটাকে ছুঁতে দিল না দোলা। হাসতে হাসতেই বলল,— আমার কথা থাক। গ্রুপের সবাই কে কেমন আছে? পলাশ? বিষাণ? সৌমাল্য?

বিষাণ তো বেরিয়ে গেছে। বাকিদের নিয়ে টুকটুক করে চালাচ্ছি আর কী। আমার পুত্রটি তো কিছুতেই গ্রুপে এল না।

কেন?

তার গানে ইন্টারেস্ট। বাংলা ব্যান্ড করছে। আমি অবশ্য ওটাকে গান বলি না। জন্মে কোনওদিন চর্চা নেই, গিটার নিয়ে চুল ঝাঁকিয়ে শিল্পী বনে গেল?... আমি যে নাটকে অল্পস্বল্প গান গাই, তার জন্যও আমায় রীতিমতো অনুশীলন করতে হয়। অথচ এরা রেওয়াজের নামে গাঁক গাঁক চেঁচাচ্ছে, আর পাড়ার লোকের কান ঝালাপালা করছে।

কী করবেন বলুন, এটাই তো যুগের হাওয়া। বয়সের ধর্ম।

হুম, চটজলদি খ্যাতির বাজার। এখন তো প্রতিভা যাচাই হয় এস-এম-এস পোলে। অংশুর গলা গমগম বাজল,— তোমার ছেলে এবার কলেজে ঢুকেছে না?

হ্যাঁ। বি-কম পড়ছে।

তারও কি মাথায় এখনকার ভূত চেপেছে?

ভূত কিনা জানি না অংশুদা। তবে খুব পলিটিক্স নিয়ে মেতেছে। কলেজে ইউনিয়ন করছে।

দেখো, পলিটিক্স বড় সাংঘাতিক নেশা। বয়সটা তো ভাল নয়, ইমোশনের মাথায় কোথায় কী ঘটিয়ে ফেলে...! এখন রাজনীতি ব্যাপারটাও তো খুব সুস্থ ভাবে চলে না।

বলি তো। শোনে কই?

এটাও বয়সের ধর্ম। দরাজ গলায় হেসে উঠল অংশু,— যাক গে, অনেক প্রিল্যুড হল, এবার কাজের কথায় আসি। আমাদের নতুন নাটক নামছে। ছন্নছাড়া। ফার্স্ট শো মার্চের ছাব্বিশ। অ্যাকাডেমিতে। দেরি আছে, তবু আগাম বলে রাখলাম।

এ কী অংশুদা, ভাল খবরটা এতক্ষণ চেপে রেখেছেন?

ওই যে বললাম... প্যাঁ-পোঁটা বাজিয়ে নিয়ে তার পর...

নিশ্চয়ই আপনার লেখা?

না। এবার অন্যের একটা উপন্যাস ধরে করছি। নতুন ধরনের থিম। কী ভাবে একটা মানুষ এই বাজারি দুনিয়ায় ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে...। তুমি আসছ তো?

সে আর বলতে। অবশ্যই।

তারিখটা মনে রেখো। পারলে সে দিন তুহিনকেও ধরে এনো।

তুহিন যাবে নাটক দেখতে? ভাবাটাই একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? অংশু রায়ের পীড়াপীড়িতে একবারই মাত্র গিয়েছিল, বছর আষ্টেক আগে। ফিরে এসে কী বিরক্তি! ও সব আঁতলামির মধ্যে আর টানবে না বলে দিলাম! আমার পোষায় না! বটেই তো। তুহিন মিত্রর জগৎটাই তো আলাদা।

পলকা শ্বাস ফেলে দোলা বলল,— তুহিনকে বাদ দিন। জানেনই তো কেমন ব্যস্ত মানুষ। এখনও তো মাসের মধ্যে পনেরো দিন ট্যুরে ছুটছে... অফিস থেকেও কখন ফেরে না ফেরে ঠিক নেই...

বেশ। তবে একাই এসো। অংশু একটুক্ষণ চুপ। তারপর ফের গলা বেজেছে,— এর মধ্যে একদিন তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলেছে?

কই, না তো!

বোধহয় ভুলে গেছে। মোবাইলে কথা বলতে বলতে থিয়েটার রোড ধরে হনহন হাঁটছিল। আমার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগার জোগাড়। অনেক কাল দেখিনি তো, প্রথমটা চিনতে পারিনি। ক্রস করে যাওয়ার পর মনে হল, আরে এ তো দোলনচাঁপার মেয়ে! সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ধরেছি।

চিনল আপনাকে? কথা হল?

প্রথমটা একটু থমকেছিল। তারপর ওই...হাই, হ্যালো...! খুব তাড়ায় ছিল মনে হয়।

হুঁ, ওর সারাক্ষণই তাড়া।

দারুণ স্মার্ট হয়েছে কিন্তু মেয়েটা। তোমার মতো সেই ঢলঢলে লাবণ্যটা হয়তো নেই, তবে যথেষ্ট চার্মিং।

স্তুতিটা যেন সেভাবে উপভোগ করতে পারল না দোলা। তার লাবণ্য আছে কি নেই, আদৌ কি অংশুদা লক্ষ করেছে কখনও? অন্তত যে বয়সটাতে

মেয়েরা আশা করে? হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগে অংশু রায় বছরখানেক ইংরিজি পড়িয়েছিল দোলাকে। মাসতুতো দাদার বন্ধু, ইংরিজিতে এম-এ করছে, দোলাকে পড়ানোর জন্য রন্টুদাই তাকে ঠিক করে দিয়েছিল। কী আবেগ দিয়ে যে পড়াত অংশুদা! শেলি, কিট্‌স, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠত। মার্চেন্ট অব ভেনিসের একটা অংশ পাঠ্য ছিল দোলাদের। ব্যাসানিও আর পোরশিয়ার সংলাপ তো প্রায় অভিনয় করে দেখাত। পড়া নয়, হাঁ করে অংশুদাকেই যেন গিলত দোলা। পালটা কোনও মুগ্ধতা কি দেখেছে অংশুদার চোখে? সেভাবে পাত্তাই দিল না কখনও। আজ হঠাৎ দোলার রূপের প্রশংসা তো নির্মম রসিকতা।

দোলা আলগাভাবে বলল,— আজকালকার মেয়েরা সবাই ওরকম স্মার্ট হয় অংশুদা। আমাদের সময়ের মতো কেউ আর বোকাহাবা নেই।

তা যা বলেছ। আবার গলা খেলিয়ে হাসল অংশু,— যুগটা খুব ফাস্ট বদলে গেল...

টেলিফোন ছাড়ার পর দোলা নিঝুম দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। অংশুদার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে, আবার মনটা কেমন খারাপও হয়ে যায়। পাল্লাটা যে কোন দিকে বেশি ঝোঁকে বোঝা কঠিন। একই অতীত কীভাবে যে মনকে দু'ভাবে দুলিয়ে দেয়! কী এমন ক্ষতি হত, অংশুদাদের গ্রুপে সে একটু জড়িয়ে থাকলে? সপ্তাহে তো মাত্র দুটো-তিনটে দিন, তাও বিকেল-সন্ধেগুলো...! সৃষ্টি ছেড়ে দিয়েই বা দোলার সংসার কী এমন শিখরে উঠল? ছেলেমেয়ে দুটো তো যা হওয়ার তাই হল। তাদের বাবা-মা এমন কিছু পণ্ডিত দিগ্‌গজ নয়, তারাই বা সাংঘাতিক মেধাবী হবে কোথ্‌থেকে? দোলা তাদের ঘাড়ে দিনরাত চেপে থাকলেও কি তারা নিউটন, আইনস্টাইন বনত?

তবু তিয়ার ব্যাপারে একটু মন-খচখচ আছে দোলার। বি এ-তে রেজাল্ট খারাপ ছিল না তিয়ার, স্বচ্ছন্দে এম এ-টা পড়তে পারত। ও পথে মেয়ে হাঁটলই না। হাজারে হাজারে পল্‌-সায়েন্সে এম এ নাকি ফ্যা ফ্যা ঘুরছে, সংখ্যা বাড়ানোর তার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। বরং সে একটা কোর্স-টোর্স কিছু করবে, যাতে আখেরে লাভ হয়। এককাঁড়ি টাকা খরচা করে নিজের ইচ্ছেমতো ম্যানেজমেন্টের একটা কোর্স শুরু করল, এখন তো পরীক্ষাটরিক্ষা দিয়ে ডিপ্লোমাও জুটিয়ে ফেলেছে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো, ক্লাস-টাসের বালাই নেই, মেয়ে একই সঙ্গে চাকরিও করে যাচ্ছিল পুরো দমে। নিজেই

জোগাড়যন্ত্র করে ক্রেডিট কার্ড বেচা শুরু করল। সেটা ছেড়ে মাঝে কিছু দিন রইল এক টেলি-সার্ভিসে। মোবাইলের গ্রাহক ধরিয়ে দিয়ে কমিশন। হালফিল ঢুকেছে এক গাড়ি ডিস্ট্রিবিউটারের শো-রুমে। সেল্‌স অফিসার। এই চাকরিরও মেয়াদ ক'দিন কে জানে! বললে উলটে শুনিয়ে দেয়, এ ভাবেই নাকি উঠতে হয় এখন। ধরবে ছাড়বে, ছাড়বে ধরবে, এটাই নাকি এখনকার দস্তুর।

হবেও বা। থিতু না হওয়াটাই হয়তো উন্নতির সোপান। কিন্তু তিয়াকে কেন যেন বড় বেশি অস্থিরমতি মনে হয় দোলার। বড্ড খরখরে কথাবার্তা বলে এক এক সময়ে। আগে আগে ভাবত, এ বুঝি বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য, এখন বুঝেছে এটাই তিয়ার স্বভাব। নিজের খেয়ালখুশিতে চলা, মাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা...

বাবাকেও কি বিশেষ আমল দেয় মেয়ে? তুহিন তো মাঝে মাঝেই গার্জেনি ফলাতে যায়, এঁটে উঠতে পারে কি? তিয়ার ওপর তুহিনের একটা আলগা দুর্বলতাও বুঝি আছে। হাজার হোক, মেয়ে তো। নইলে যে বাবার কথা এ বাড়িতে আইন, অবলীলায় তার গজগজানি এ কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও কান দিয়ে বার করে দিতে পারে তিয়া?

কী যে হবে ওই মেয়ের! বিয়ে-টিয়েও তো এক্ষুনি দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গ তুললে তিয়া মুখের ওপর বলে দেয়, কেন ফাটা রেকর্ড বাজাচ্ছ মা? আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দাও না। বাবানের বিয়ের পর তো হাসতে হাসতে বলে দিল, চেনা নেই, জানা নেই, এমন একটা মেয়ের সঙ্গে কী করে যে বাবানদা দরজা আটকে শুয়ে পড়তে রাজি হয়ে গেল? ছি ছি, আমি তো ভাবতেও পারি না। ওই সব ভাষার পর বিয়ের ব্যাপারে আর এগোনো যায়?

যাক গে, মরুক গে, যার যা প্রাণ চায় করুক। মেয়ে তার মর্জি মতো চলুক, ছেলে ইউনিয়নবাজি করে বেড়াক... দোলা আর সংসার নিয়ে ভাববেই না। কেন ভাববে? সংসার তার কথা কতটুকু ভেবেছে?

কষটে মেজাজে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল দোলা। অংশুদার ওপর হঠাৎ কেমন রাগ হচ্ছে। হয় মাঝে মাঝে। বেশ তো সে চোখকান বুজে ঘরসংসার করে যাচ্ছিল, অংশুদার ফের আবির্ভাবের কী প্রয়োজন ছিল? নিজেকে অসুখী ভাবার বদ রোগটা তো দোলার তা হলে গজাত না।

অবশ্য অংশুকে দোষ দিয়ে কী লাভ, খাল কেটে কুমির তো দোলাই এনেছিল।

দিনটা এখনও স্পষ্ট দেখতে পায় দোলা। উঁহুঁ, দিন নয়, সন্ধে। তারা তখন লেক গার্ডেন্সের ভাড়াবাড়িতে। ছেলের স্কুলের প্রজেক্টের জন্য চার্টপেপার কিনতে বেরিয়েছে দোলা, মোড়ের মাথায় আচমকা অংশুদা! প্রায় দু'যুগ পর। হায়ার সেকেন্ডারির পরে সেই প্রথম।

অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিল অংশু। দোলা ডেকে উঠেছিল,— অংশুদা না?

প্রাক্তন ছাত্রীকে চিনতে দু'-এক সেকেন্ড বুঝি সময় লাগল অংশুর। পরক্ষণে একগাল হাসি,— আরে, দোলনচাঁপা যে? তুমি এখানে কোথথেকে?

কত বছর পর নিজের পুরো নামটা শুনল দোলা। ওই নামে এখন আর কেই বা ডাকে তাকে! ঊনচল্লিশের দোলা পলকে শিহরিত। বুঝি বা পুরনো মুগ্ধতায় আচ্ছন্নও কিছুটা। পুলকিত স্বরে বলেছিল,— আমি তো এ পাড়াতেই থাকি। আপনি এখানে?

আমার গ্রুপের একটা ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দেখতে এসেছিলাম।

গ্রুপ? দোলার মাথায় ঢোকেনি,— কীসের গ্রুপ?

নাটকের। তুমি সৃষ্টির নাম শোনোনি?

সৃষ্টি কেন, দুটো-চারটে বড় নাটকের দল ছাড়া কারও নাম কি জানত দোলা? খবরের কাগজে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনেই বা চোখ বোলাত কই! স্বামী, সংসার, ছেলেমেয়েতেই তো হাবুডুবু তখন। মাঝে ঝড়ঝাপটাও তো কম গেল না। তুহিনদের রবার ইন্ডিয়ার টালমাটাল দশা, সরকারি ছেড়ে বেসরকারি সংস্থায় যোগ দিল তুহিন, শাশুড়ি মারা গেলেন...। তবু তার মধ্যেই ফাঁক বুঝে ক্বচিৎ কখনও সিনেমা, কিংবা এর ওর বাড়ি, ব্যস এইটুকুই তো পৃথিবী। দোলাকে একদা মোহিত করে দেওয়া প্রাইভেট টিউটরটি যে একটা নাটকের দল গড়েছে, এ খবর কি তখন দোলার পক্ষে রাখা সম্ভব? যার কাছ থেকে জানলেও জানা যেত, সেই রন্টুদাও এখন চণ্ডীগড়প্রবাসী। দেখাসাক্ষাৎ নেইই প্রায়।

নিজের অজ্ঞতাটা অবশ্য মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেনি দোলা। ঢোঁক গিলে বলেছিল,— হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার তো এখন খুব নাম।

নামফাম কিছু নেই। লড়ে যাচ্ছি।... যাক, তোমার সমাচার শোনাও।

চলছে। বর এখন ভেনাস রবারে। এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ে ক্লাস এইট, ছেলে ফোর।... চলুন না, কাছেই আমার বাড়ি।

কত ছোট ছোট ঘটনা জীবনের অভিমুখই বদলে দেয়। শুধু অভিমুখ নয়, ভারসাম্যও। সেদিন সন্ধেবেলায় দোলা যদি চার্টপেপার কিনতে না বেরোত, যদি তিয়া বা তিতানকে পাঠাত দোকানে, তা হলে পরের দু'-তিনটে বছর তো অন্য রকম হত না। না হলেই বা কী এসে যেত? হয়তো জীবনটা আর একটু বোদা হত, কিন্তু দোলা আদৌ টের পেত কি?

ধুত্তোর ছাই, দোলা তো সমঝোতা করেই নিয়েছে, কেন মিছিমিছি টোকো ভাবনায় পীড়িত হওয়া! ঘাড় ঘুরিয়ে দোলা দেওয়ালঘড়ি দেখল। তিনটে দশ। চারটে নাগাদ সাবিত্রী আসবে, তার আগে দুধের ডেকচিটায় জল ঢেলে রাখা দরকার। ভেজানো না থাকলে মাজতে অসুবিধে হয় সাবিত্রীর, ট্যাকট্যাক করে।

রান্নাঘর ঘুরে দোলা বসার জায়গায় এল। টিভি চালিয়েছে। এই সময় আগের রাতে প্রচারিত হিন্দি ধারাবাহিকগুলো আবার দেখায়। সন্ধেটা বাংলার জন্য বরাদ্দ, দুপুর বিকেলে এক-আধটা মেগা সিরিয়াল দেখে দোলা। গল্পের মাথামুন্ডু নেই, অনন্তকাল ধরে চলছে কাহিনি, চড়া নাটকে মাঝে মাঝে হাসি পেয়ে যায়। তবু যেন দোলার খানিকটা নেশা ধরে গেছে। তার ঠাকুমা দুপুর সন্ধেয় আফিম খেয়ে ঝিমোত, এ যেন তারই সমগোত্রীয়। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনির পর জীবন আবার থেমে গেছে তো, নেশাটা ভাল কাজ দেয়।

আজ গল্প ক্লাইম্যাক্সে। বাড়ির ছোটবউকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছে প্রাক্তন প্রেমিক, মেয়েটা চিৎকার করছে...। মেয়েটির দ্বিতীয় বর, হবি তো হ', ওই পথেই আসছে গাড়ি নিয়ে... যাহ্, টায়ার পাংচার হয়ে গেল! কোথথেকে এক প্রকাণ্ড ট্রাক ধেয়ে আসছে... পিষে ফেলবে নাকি বরটাকে?

জানার আগেই বিজ্ঞাপনের বিরতি। ঝকঝকে গাড়ি... মন মাতানো রং... তন্বী মোবাইল... চটকদার প্রসাধনী... মিহি গুঁড়োমশলা...

ছোট্ট একটা হাই তুলে রিমোটে এ-চ্যানেল ও-চ্যানেল ঘুরতে লাগল দোলা। হঠাৎই একটা বাংলা সংবাদে এসে থেমে গেছে আঙুল। কী খবর দেখায় ওটা? ছাত্র সংসদের নির্বাচন ঘিরে তিতানদের কলেজে গন্ডগোল? বোমা পড়েছে? মারামারি চলছে?

তিতানদের কলেজের গেটটা দেখাল ঝলক। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে গেছে, তার মধ্যেই এলোপাথাড়ি ছুটছে ছেলেমেয়েরা...!

দোলার মুখ পলকে পাংশু। তিতান কোথায়? সে ঠিক আছে তো? একটু আগেই অংশুদা বলছিল, বয়সটা ভাল নয়... ইমোশনের মাথায় কখন কী ঘটিয়ে বসে...!

ক্ষণপূর্বেও সংসার সম্পর্কে উদাসীন হতে চাওয়া দোলার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ সহসা। কী করবে সে এখন? কী করবে?

দুই

আর কতক্ষণ বসে থাকব স্যার? এবার বাড়ি যাই?

মোবাইলটা অন্তত ফেরত দিন। বাড়িতে খবরটবর দিই।

আপনি কিন্তু অকারণে আটকে রেখেছেন। আসল কালপ্রিটদের পতা করতে পারলেন না, কাজ দেখাতে আমাদের নিয়ে টানাটানি! দেখলেন তো, আমরা টিটি খেলছিলাম।

আপনাদের থানাটা কিন্তু বড্ড স্টাফি। অক্সিজেন সাপ্লাই কম। মাথা ধরে যাচ্ছে।

আমার তো ঘুম পেয়ে গেল। একটা সিগারেট খেতে পারি স্যার?

মধ্যবয়সি সেকেন্ড অফিসারটি মাথা নামিয়ে কী যেন লেখালিখি করছিল। চোখ তুলে ধারালো দৃষ্টি হানল একখানা। হাত পাঁচ-ছয় দূরে, তিন কমরেডের সঙ্গে, টানা লম্বা বেঞ্চিতে বসে থাকা তিতান একটু যেন কেঁপে গেল। থানায় সে কস্মিনকালে ঢোকেনি, পুলিশ সম্পর্কে তার একটা স্বাভাবিক আড়ষ্টতা আছে। ধরে আনার পর থেকে তার বেশ ভয় ভয়ই করছিল। অবশ্য গায়ে হাত দূরে থাক, কেউ এখনও তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। ঠায় বসিয়ে রেখেছে, এই যা। তবে ভ্যানে তোলার আগে জোর দাবড়াচ্ছিল সেকেন্ড অফিসার। এখনও যেন সেই হুংকার তিতানের কানে লেগে। কেন যে তিতান আগেভাগে কেটে পড়েনি!

অশান্তির শুরু বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। আজ ছিল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। সংসদ টানা ষোলো বছর তিতানদের পার্টির দখলে। গত সাত-আট বছর তো ইলেকশনের পাটই নেই, বিপক্ষ দল তো মনোনয়নপত্র দাখিলের সুযোগই পায় না। কলেজের একশো

হাতের মধ্যে মিছিলটিছিল নিয়ে ঘেঁষার চেষ্টা করলেই রে রে করে তেড়ে যায় কমরেডরা, ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায় প্রতিপক্ষ। এবারও সে রকমটাই হবে ধারণা ছিল তিতানদের। অন্তত খবর তো সে রকমই ছিল। কিন্তু এবার অন্য রণকৌশল নিয়েছিল পালটা দল। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে কলেজে এসে হঠাৎই একজোট হয়ে স্লোগান শুরু করে দিল। অফিসে মনোনয়নপত্র জমা নিচ্ছিলেন এক অধ্যাপক, হুড়মুড় করে সেখানেও হাজির। ক্ষণিকের জন্য হকচকিয়ে গেলেও তিতানদের দল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়েছিল প্রতিরোধে। মারপিট, ধস্তাধস্তি করে হঠিয়েও দিল ছেলেগুলোকে। পার্টির স্থানীয় অফিসে খবরও গেল নিয়মমাফিক। ঘন্টাখানেকের মধ্যে যথারীতি জঙ্গি ক্যাডাররা হাজির। বিশুদ্ধ মার্ক্সীয় খিস্তি ছুড়তে ছুড়তে গোটা দুয়েক বামপন্থী বোমা টপকে দিল কলেজ গেটে। তিতানরাও ভাবল, সমস্যার বুঝি ইতি, এবারের মতো ঝঞ্ঝাট চুকেবুকে গেল। কিন্তু গুন্ডাবাজিতে বিপক্ষ দলও তো কম দড় নয়। তাদেরও দাদা দিদি আছে। পেশি আছে। বোমা পিস্তল আছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা, তারা বেশ মরিয়া ছিল এবার। সুতরাং আড়াইটে নাগাদ আবার তারা আসরে। এবার দু'-চারটে দক্ষিণপন্থী বোমা। হল্লা। খিস্তিখেউড়। তবে এবারও পরাজয়। উলটে তিতানরা তাদের একজনকে পাকড়াও করে, চড় থাপ্পড় কষিয়ে, আটকে রাখল ইউনিয়ন রুমে। ব্যস, ওই দলও ওমনি ছুটল থানায়। বন্দে মাতরম ধ্বনিতে কাঁপিয়ে দিল পুলিশচৌকি।

তা ছাত্রদের ঝামেলায় পুলিশ আজকাল সহজে নাক গলাতে চায় না। কোথায় কোন ছাত্রর গায়ে বেকায়দায় হাত পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য জুড়ে ছাত্র ধর্মঘট...। তার ওপর শাসক দলের ছাত্রফ্রন্টকে তারা একটু সমঝে-বুঝেই চলে। এটাই রীতি। অলিখিত আইন। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটু তো নড়াচড়া করতেই হয়। তা ছাড়া এই সেকেন্ড অফিসারটিও কিঞ্চিৎ টেঁটিয়া টাইপ। সম্ভবত এখনও নিজেকে আইনের রক্ষক মনে করে। সটান ইউনিয়ন রুমে এসে ছেলেটিকে উদ্ধার তো করলই, হাতের কাছে যে চার জনকে পেল তুলে আনল থানায়। টেবিল টেনিস খেলার দোহাইকে পাত্তাই দিল না।

কী যে লোকটার মতিগতি, ঠাহর করতে পারছিল না তিতান। সেই চারটে থেকে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছে, কখন যে ছাড়বে? মুচলেকা টুচলেকা লেখাতে চায়? থানা একটু ফাঁকা হলে হাতের সুখ করবে না তো? একটাই যা ভরসা, তিন-চার ঘন্টা বসে থেকে তিতান টের পাচ্ছে, থানা এমনই এক

জায়গা যা কখনওই নির্জন হয় না। চোর গুন্ডা পাতাখোর পকেটমার বাড়িওয়ালা ভাড়াটে, হরেক কিসিমের চিড়িয়া আসছে তো আসছেই। খানিক আগে বরের নামে ডায়েরি লিখিয়ে গেল এক মাঝবয়সি মহিলা। দেখে দেখে প্রাথমিক শঙ্কাটা কেটেছে খানিক, তবু চোরা ধুকপুকুনি একটা রয়েই গেছে। শ্রীমন্ত, বরুণরা অনেক বেশি পোড়খাওয়া, বরুণ তো ইউনিয়ন করার জন্যই গত বছর পার্ট ওয়ান ড্রপ দিল, তিতানের এখনও ততটা হাড় পাকেনি।

তা বলে কমরেডদের সামনে তিতান কি মানসিক দুর্বলতা দেখাতে পারে? সাহস করে সেও তাই ফুট কাটছে মাঝে মাঝে। সে যে ক্রমশ হেক্কড় হয়ে উঠছে, প্রমাণ করার এটাই তো রাস্তা।

তিতান কনুই দিয়ে আস্তে ঠেলল বরুণকে। ঝুঁকে পল্লবকে কী যেন বলছিল বরুণ, ঘুরে তাকিয়েছে,— কিছু বলছিস?

তিতান গ্রাম্ভারি ভাব আনল গলায়,— এবার তো কিছু একটা করতে হয়। তুমি যে বললে পল্টুদা এসে যাবে?

তাই তো ভাবছি রে। মিটিং-টিটিংয়ে আটকে পড়ল নাকি?

পল্লব বলল,— কিন্তু এভাবে তো আটকে রাখার কথা নয়...

শালা দারোগাটা বহুত হারামি। শ্রীমন্ত দাঁত কিড়মিড় করল,— আমাদের খেলাচ্ছে।... প্রতিক্রিয়াশীল গান্ডুটাকে নর্থ বেঙ্গল পাঠানো দরকার। পল্টুদাকে বলব, জোনাল কমিটির মিটিংয়ে কথাটা তুলতে।

সেকেন্ড অফিসারের বুঝি কুত্তার কান। দুম করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে। ভুরু নাচিয়ে শ্রীমন্তকে বলল,— কী বললি রে তুই? আর একবার বল।

শ্রীমন্ত কাঁধ ঝাঁকাল,— কিছু না তো।

কায়দা মারবি না। খপ করে শ্রীমন্তর কাঁধ খামচে ধরেছে অফিসার। কড়া গলায় বলল,— অনেকক্ষণ ধরে তোদের কপচানি হজম করছি। এবার কিন্তু লিমিট পেরিয়ে যাচ্ছিস।

খারাপ কথা কী বললাম?

ভাল খারাপের বোধ তোদের আছে? শ্রীমন্তকে ছেড়ে লোকটার চোখ বাকি তিন জনে ঘুরল একবার। দৃষ্টি তো নয়, যেন ছাগল জবাইয়ের আগে কসাই ছুরি শানাচ্ছে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,— পোশাক-আশাকে তো ভদ্রবাড়ির ছেলে বলেই মনে হয়। ভাষা এমন ইতরের মতো কেন?

আমি তো আপনাকে কিছু বলিনি।

চোপ। নাক টিপলে দুধ বেরোয়, মুখে মুখে তর্ক! বাপ-মা পয়সা খরচ করে কলেজে পাঠিয়েছে কি গুন্ডামি মস্তানি করতে?

আমরা গুন্ডামি করিনি। খেলছিলাম।

খেলা আমি ছুটিয়ে দেব। একটা কথা মাথায় রাখবি... আমি যত দিন এই থানায় আছি... ফের যদি কোনও কমপ্লেন পাই... তোদের পল্টুদা বিল্টুদা কেউ এসে ছাড়াতে পারবে না। এক রাত হাজতে থাকলে বুঝবি কত ধানে কত চাল!

শ্রীমন্তর জোশ খতম। মিনমিনে গলায় বলল,— আপনি শুধু আমাদের দোষ দেখছেন। ওরা যে হামলা করল, অথচ ওদের আপনি...

সে কৈফিয়ত তোকে দেব নাকি? যা ভাগ। আমার মুড আরও খারাপ হওয়ার আগে কেটে পড়।

টেবিলের দেরাজ খুলে চার জনের চারখানা মোবাইল বার করে দিল অফিসার। তিতানকে ফোনটা হাতে দিয়ে চোখ পিটপিট করছে,— অ্যাই, তোর নাম কী রে?

তিতান ঢোঁক গিলে বলল,— কেন?

বলতে আপত্তি আছে?

না, না। আমি সায়র। মিত্র।

কোন ইয়ার?

ফার্স্ট ইয়ার বি-কম। অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স।

হুম। সায়র মানে জানিস?

তিতান ঢক করে ঘাড় নাড়ল,— দিঘি।

তা হলে নালানর্দমায় ঘুরছিস কেন? পার্টিবাজি ছেড়ে মন দিয়ে পড়াশুনা কর গে যা।

বাইরে বেরিয়ে তিতান যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। শ্রীমন্ত পল্লবদেরও রোঁয়া ফুলেছে। পল্লব দাঁত বার করে বলল,— ব্যাটা আমাদের ছেড়ে দিল কেন বল তো?

কেন?

পল্টুদার নাম শুনে কানে জল গেছে। মুখে যতই তড়পাক, চাকরির ভয় আছে তো।

তাই কি? তিতানের তো বেশ দাপুটেই মনে হল লোকটাকে। শ্রীমন্তর মতো ওস্তাদকেও কেমন পেড়ে ফেলেছিল! ভাবতে ভাবতে মোবাইল চালু করল তিতান। কী কাণ্ড, পরের পর মিসড কল অ্যালার্ট! বাড়ি থেকে অগুনতি, বাবার মোবাইল থেকে চার বার। আশ্চর্য, সাড়ে তিনটের সময়ে মা'র সঙ্গে কথা হল, তখন পইপই করে তিতান বলে দিল, কলেজের গন্ডগোল নিয়ে মাকে উতলা হতে হবে না, সব চুকেবুকে গেছে... তার পরেও এত বার ফোন? তিতানের ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে চিন্তা? কীই বা এমন রাত হয়েছে, সবে তো আটটা চল্লিশ...! আজব নার্ভাস পাবলিক বটে মা! বাবাকেও নির্ঘাত ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছে!

চটপট বাড়ির লাইনটা ধরতে গিয়েও তিতান নিরস্ত হল। থাক, ভাবতে চাইছে ভাবুক। ভুগুক আর একটু। অকারণ টেনশন করার জন্যে মা'র একটু শাস্তি পাওয়া প্রয়োজন। তিতান যে আর কচি খোকা নেই, কেন বুঝবে না মা?

বরুণ মোবাইলে কার সঙ্গে যেন কথা সারছে। ফোন অফ করে বলল,— পল্টুদা জ্যামে ফেঁসে আছে। আমরা বেরিয়ে পড়েছি জেনে নিশ্চিন্ত হল।

শ্রীমন্ত উৎসুক স্বরে বলল,— দারোগাটার কথা বললি? কেমন বোর করেছে আমাদের?

বোর নয়, ইনসাল্ট। বরুণ গম্ভীর,— দাঁড়া না, কাল পার্টি অফিসে গিয়ে ডিটেলে জানাব।

শ্রীমন্ত বলল,— আমি শুধু বিশ্বজিৎদের হিম্মতের কথাটা ভাবছি। জানে আমাদের কলেজে লাইফে এনট্রি পাবে না, তবু কেন যে ক্যাচাল পাকাতে এসেছিল!

বটেই তো, কী সাহস! নমিনেশন ফাইল করতে আসে!

নমিনেশন পেপার ওরা পেল কোথথেকে বল তো? কবে তুলে নিয়ে গেল?

সম্ভবত আজকের মতোই ট্যাকটিক্স নিয়েছিল। আলাদা আলাদা এসে...

কিন্তু পায় কী করে?... শালা এ-কে-এসটা জালি করেনি তো? মুখে হয়তো গদগদ ভাব দেখায়, তলে তলে...। শালা মাস্টারগুলোর তো কোনও রঙের ঠিক নেই। কখন লাল, কখন গেরুয়া... তুই বুঝতেও পারবি না। কেমিস্ট্রির পি-এমকে দেখেছিস তো, সারাক্ষণ প্রিন্সিপালের গায়ে মক্ষীর মতো সেঁটে থাকে। পল্টুদাকে দেখলে ঢলে ঢলে পড়ে। অথচ ও মাল নিজের পাড়ায় কিন্তু তেরঙ্গা।

তোকে কে বলল।

জানি, জানি। আমাদের নেটওয়ার্কে সব ধরা পড়ে।

বিশ্বজিৎ শুভেন্দুদের কেসটা এবার ছানবিন করতে হবে। জানা দরকার, ঠিক কে ওদের মদত দিল। ভেতর থেকেই কেউ? নাকি যতীন রায় কলেজটা ক্যাপচার করতে পেরে পুড়কি বেড়েছে শালাদের?... আরে ভাই, ওখানে তোদের অ্যাকশন স্কোয়াড স্ট্রং বলে এখানেও খাপ খুলবি? শালা এমন মাউস টিপে দেব... রক্ত আমাশা হাগবি রে।

তিতান চুপচাপ বন্ধুদের আস্ফালন শুনছিল। দুপুর থেকে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। ফস করে বলে বসল,— আচ্ছা, ওরা নমিনেশন ফাইল করলে আমাদের কী এমন ক্ষতি হত?

ঢ্যাঙা বরুণ লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,— মানে?

মানে... লড়ালড়ি হলে কি আমরা জিততাম না? স্টুডেন্টদের ওপর কি আমাদের যথেষ্ট কনফিডেন্স নেই? হোল্ড নেই?

বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলিস না তো। খামোখা ঝুঁকি আমরা নেব কেন? ওদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে কেউ যদি পালটি খেয়ে গিয়ে থাকে...

কিন্তু এভাবে তো আমরা নিজেদের রিয়েল স্ট্রেংথ বুঝতেও পারব না। স্টুডেন্টরা সত্যি সত্যি আমাদের চায় কিনা...

আবার বাচ্চাদের মতো কথা! বরুণ হো হো হেসে উঠল,— অন্য কাউকে চাওয়ার রাইট ওদের কেন থাকবে? আমরা তো জানি, আমরাই স্টুডেন্টদের ভাল করছি। তারা আমাদের জন্য থাকলে, আমরাও তাদের দেখভাল করব। বেফালতু কারও চাওয়া চাওয়িতে যাওয়ার দরকার কী?

জবাবটা তিতানের ঠিক মনঃপূত হল না যেন। এ কথা সত্যি, বিরোধী পক্ষ দুর্বল হওয়ায় তাদের কলেজে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা বজায় আছে। ক্লাস-টাস যেমনই হোক, যতীন রায় কলেজের মতো রোজ রোজ তুলকালাম হয় না। আবার এটাও তো মানতে হবে, এক-আধ বার অন্তত ভোটাভুটিটা হতে দিয়ে নিজেদের অবস্থা যাচাই করে নেওয়া উচিত। যাক গে যাক, তিতানের এত মাথাব্যথার প্রয়োজনটাই বা কী! ইউনিয়ন করার সুবাদে সে এখন পাদপ্রদীপের আলোয় রয়েছে, এটাই তো তার কাছে অনেকখানি। মাত্র আট মাস কলেজে ঢুকেছে, এখনই কত ছেলেমেয়ে চেনে তাকে। পল্টুদা যে পল্টুদা... পার্টির জোনাল কমিটির মেম্বার, কলেজের গভর্নিং বডিতেও

আছে... সে পর্যন্ত দেখা হলে কত খাতির করে কথা বলে। তোমরাই তো পার্টির ভবিষ্যৎ, তোমরাই পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে...

সামনে তেমাথার মোড়। বরুণ আর শ্রীমন্ত সোজা চলে গেল। এই অঞ্চলেই থাকে তারা, হাঁটাপথের দূরত্বে। পল্লব আর তিতান ঘুরল বাঁয়ে। বাস ধরবে।

বাসস্টপ ফাঁকা ফাঁকা। বাতাসে অল্প শিরশিরে ভাব। ডেনিম জ্যাকেটের বোতাম আটকে তিতান হাতে হাত ঘষল। পল্লব একখানা সিগারেট ধরিয়েছে, দেখে মুচকি হাসল তিতান। কৌতুকের সুরে বলল,— অ্যাই, তুই এতক্ষণ প্যাকেটটা বার করিসনি কেন রে?

পল্লব হেসে ফেলল,— জানিসই তো, শালা বরুণদাটা দেখলেই...। শালা মহা চিপ্পুস! জম্মে কখনও কিনবে না, অন্য কেউ ধরালেই লগা বাড়াবে! এবং দুটো-চারটে যা আছে, দ্যাখ না দ্যাখ ফিনিশ।

বরুণদার ফ্যামিলি কন্ডিশন খুব ভাল নয়, তাই না?

ঠিক জানি না। বাপের বোধহয় দোকান-টোকান আছে। গ্রসারি শপ। লম্বা ধোঁয়া বুকে টানল পল্লব। হঠাৎই খ্যাঁক খ্যাঁক হাসছে,— অ্যাই, তোর কেসটা কী বল তো?

কী কেস?

দারোগা ব্যাটা অচানক তোর ওপর সফ্‌ট হয়ে পড়ল কেন রে?

আমি কী করে জানব?

সিম্পল। পল্লব চোখ টিপল,— ও ব্যাটা নির্ঘাত হোমো। তোর লালটু লালটু চেহারাটা দেখে শালার রুল উসখুস করছিল।

যাহ, কী যে বলিস!

শরমিও না বস। যা একখানা মেয়ে-পটানো ফেস তোমার... বালিকারা তো ফটাফট ফিদা হচ্ছে।

অ্যাই, আওয়াজ মারবি না।

আপঅন গড। এই তো পরশু সাইকোলজির মেয়েটা... কী যেন নাম... শ্রেয়া...। বলছিল, তোকে দেখলেই নাকি ওর হার্টবিট বেড়ে যায়।

তিতান ঈষৎ রোমাঞ্চিত বোধ করল। তবু একটা উদাসীন ভাব ফুটিয়েছে মুখে,— কোন মেয়েটা বল তো? আমি চিনি?

খুব চেনো। স্মরজিতের সঙ্গে প্রায়ই আসে ইউনিয়ন রুমে। ব্যাপক খিল্লি খায়।

নিখুঁত মনে করতে পারল না তিতান। একটা শ্যামলা রং, চোখ বড় বড় মেয়ে মাঝে মাঝে ইউনিয়ন রুমে হাসির তুফান তোলে। তার নামই কি শ্রেয়া? মেয়েটা ইউনিয়নের সঙ্গে সেভাবে যুক্ত নয়। তবে কি তিতানের টানেই আসে?

পল্লব পেটে খোঁচা মারল,— কী বস, ধ্যানে ডুবলে নাকি? তোমার লাইফে এরকম বহুত আসবে, দু'-চার পিস আমাদেরও পাস কোরো।

তিতান ভুরু বেঁকাল,— অ্যাই, তোর তো আছে!

ও হেভি সেয়ানা। গায়ে হাতফাত দিতে দেয় না, শুধু ডায়ালগ মারতে হয়।

তা কলেজের মেয়েদের নিয়ে যা খুশি করা যায় বুঝি?

একটু আধটু কোনও ব্যাপারই নয়। ওরাও চায়, বুঝলি। জাস্ট তক্কে তক্কে থাকতে হয় আর কী। পল্লব আবার চোখ টিপল,— শ্রেয়ার সঙ্গে ট্রাই নিয়ে দ্যাখ না। মনে তো হয় লেগে যাবে। তখন ফার্স্ট কিসটা আমার নামে উৎসর্গ করে দিস।

পল্লবের পিঠে চটাস এক থাপ্পড় কষাল তিতান। ছিটকে সরে গেছে পল্লব। হ্যা হ্যা হাসছে। তাদের দেখে এখন কে বলবে মাত্র মিনিট কুড়ি আগে তারা ছাড়া পেয়েছে থানা থেকে!

মোড় ঘুরে একটা মিনিবাস থামল স্টপেজে। একেবারেই ভিড় নেই, একদম পিছনের সিটে গিয়ে বসল তিতান। পাশে পল্লব।

তিতান জিজ্ঞেস করল,— তুই বাঘা যতীনেই নামবি তো?

আর এখন যাব কোথায়! সন্ধে তো গন।

কিছু একটা ছিল বুঝি সন্ধেবেলা?

রুমির আজ যাদবপুরে পড়তে আসার কথা। ইকো স্যারের খোঁয়াড়ে। ভেবেছিলাম, পড়ে বেরোলে আজ একবার...

তুই কিন্তু রুমির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিসনি!

খেপেছ বস! তুমি স্ক্রিনে এলে ও-পার্টি আর আমার দিকে তাকাবে! বলেই পল্লব দু'সেকেন্ড চুপ। চোখ পিটপিট করছে। কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করল,— হ্যাঁরে, কলেজের অ্যাকশনটা কি সত্যিই নিউজে দেখিয়েছে?

আমার মা তো খবরটা টিভি থেকেই পেয়েছিল।

শালা টিভি চ্যানেলগুলো জিনা হারাম করে দেবে মাইরি! বাড়িতে যদি দেখে থাকে... বহুত বাওয়াল হবে।

চিন্তাটা তিতানের মাথাতেও উঁকি দিচ্ছে বটে। একা মা হলে পট্টি পরানো যেত। মা একটু নাদান টাইপ। কিন্তু বাবা...? ব্যাপক হল্লা জুড়ে কানের পোকা বার করে দেয়। দিদির সঙ্গে সুবিধে করতে পারে না তো, তাই ছেলেকেই পেষো! অবশ্য মা-ও পেষানিটা খায়। তা সে নয় বরের ঝাড় ভালবাসে, কিন্তু তিতান কেন...? ধুস, ভাল্লাগে না।

এসে গেল বাঘা যতীন। পল্লব উঠে পড়েছে। দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, কাল বরুণদার সঙ্গে যাচ্ছিস নাকি? পার্টি অফিসে?

আগে কলেজ তো যাই।

আমি কিন্তু কাল বাঙ্ক। এক পিসি-পিসেমশাই এসেছে কানাডা থেকে। কাল দুপুরে বাড়িতে খাবে।

তুই সেখানে কী করবি?

একটু মাখনটাখন লাগাব। যদি গ্যাস-ট্যাস খেয়ে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে হেলপ করে। এমনিতে তো হবে না...

কনডাক্টর টিকিট চাইছে। বুড়ো আঙুলে বন্ধুকে দেখিয়ে দিয়ে ফের একবার চোখ টিপে নেমে গেল পল্লব। আপন মনে হাসল তিতান। একমাত্র এই বন্ধুটির সঙ্গই তার বেশ লাগে। ওয়েভলেংথে মেলে মোটামুটি। পার্টি করে বটে পল্লব, তবে ছাড়া ছাড়া। আছে, আবার নেইও। তিতানকেও ওরকমই থাকতে হবে। ভেসে ভেসে। পল্লবের মগজ বেশ সাফ, এখন থেকেই বিদেশ যাওয়ার ছক কষছে। বরুণদারা যতই বুলি কপচাক, এই পোড়া দেশে থেকে কী লাভ? এত মানুষের গাদাগাদি, পিলপিল করছে বেকার...। বাবানদা এসেছিল পুজোয়, কত গল্প শুনিয়ে গেল মেলবোর্নের। আহা, সে নাকি এক অতি মনোরম শহর। ধুলোবালি নেই, ভিড়ভাট্টা নেই, আকাশ ঝকঝকে নীল, বাতাসে কিলো কিলো অক্সিজেন...। অলিবউদি তো আহ্লাদে ডগমগ। এমন শান্ত মসৃণ জীবন, দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কেটে যায়। মেলবোর্নের ট্রামও নাকি দেখার মতো। এখানকার মতো লঝঝড়ে রংচটা নয়, ঝকঝক করছে। তরতরিয়ে ছোটে লাইন বেয়ে...

ইস, তিতানের কখনও ওসব ট্রামে চড়া হবে না। তার কেরিয়ারটাই এমন বিচ্ছিরি ভাবে ঘেঁটে গেল। মাধ্যমিকে টেনেটুনে ফার্স্ট ডিভিশনের পরও মরিয়া হয়ে, স্কুল বদলে, সায়েন্স নিয়েছিল। শেষ অবধি সামাল দিতে পারল কই! এমন কঠিন কোর্স, এত প্রকাণ্ড সিলেবাস...! টিউটোরিয়াল

মিউটোরিয়াল ধরেও শেষমেশ দু'দাঁড়ি। রেজাল্ট পদের হলে তাও ফিজিক্স ম্যাথস নিয়ে কোথাও একটা ঢুকে এ বছরটা পুরো জয়েন্টের জন্য জান লড়িয়ে দিত। ধুস, আর সায়েন্স! বাবার ঠেলায় কমার্সে এসে অনার্সও একটা মিলেছে, কিন্তু ভাল লাগছে না তিতানের। ডেবিট ক্রেডিট মার্কেট শেয়ার ডিম্যান্ড সাপ্লাই... ধুস, পোষায় নাকি? বাবার হয়তো আশা, ছেলে সি-এ হবে। পাগল? তিতানের মুরোদ কতটা, তিতান কি জানে না?

নাহ, তিতানের কিস্যু হবে না। এই পার্টি ফাটির সঙ্গেই সেঁটে থাকতে হবে তিতানকে। যদি তাতে অন্তত করেকম্মে খাওয়ার মতো একটা ভবিষ্যৎ তৈরি হয়। কাল চলেই যাবে পার্টি অফিসে? শুধু পল্টুদা কেন, বাকি মুখগুলোকেও তো চেনা দরকার।

ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনা নিয়ে বাস থেকে নামল তিতান। হাঁটছে দুলে দুলে। হঠাৎই টের পেল খিদেয় চনচন করছে পেট। দুপুরে ক্যান্টিনে এক প্লেট ঘুগনি খেয়েছিল, তারপর তো বাওয়াল, পুলিশভ্যান...। মনে হচ্ছে পাকস্থলীতে বহু যুগ দানাপানি পড়েনি। বাড়ি গিয়ে আগে খাবার, না খিস্তি কোনটা জুটবে কে জানে!

বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না তিতানের। কিন্তু বাড়ি ছাড়া আর গতিই বা কী! রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ইটের টুকরোয় সপাটে লাথি কষাল তিতান। ধুস, ভাল্লাগে না।

তিন

তোমার কি খুব একা লাগছে? জীবনে নতুন উত্তেজনা চাও? নীচের নম্বরে ডায়াল করো, মন ঝরঝরে হয়ে যাবে। কলচার্জ প্রতি মিনিটে মাত্র ছ'টাকা।

চুলে ব্রাশ চালাতে চালাতে মোবাইলে সদ্যপ্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইংরিজি বার্তাটি পড়ল তিয়া। সেলফোনে প্রায়ই আসে এরকম আহ্বান। প্রথম প্রথম কৌতূহলের বশে তিয়া টিপেছে নম্বরটা। নাম দাও, বয়স দাও, মেয়ে না ছেলে জানাও, এরকম সাতসতেরো ফ্যাকড়া পার হয়ে শোনা যাবে কোনও সম্ভাব্য পুরুষবন্ধুর কণ্ঠস্বর। দু'-পাঁচ মিনিট কথা বলে দেখেছে তিয়া, কারও সঙ্গেই

পটে না। বেশির ভাগই কেমন মেকি, ফোনালাপের চেয়ে সরাসরি সাক্ষাতেই তারা বেশি আগ্রহী। সোনালি বলে, ওপারের কণ্ঠটি ছাব্বিশের না হয়ে বাষট্টিরও হতে পারে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলে অবশ্য। এবং সোনালির তাতে বয়েই গেল। সাতাশের জায়গায় তিপ্পান্ন এল, কি তিরিশের বদলে পঁয়তাল্লিশ, কারও একটা ঘাড় ভেঙে মস্তি করতে পারলেই সোনালি খুশি। কিন্তু তিয়া কি তা পারবে? নৈতিকতা ফৈতিকতা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না তিয়া, তবু কোথায় যেন বাধে। সংস্কার? উঁহুঁ, তাও নয়। হয়তো বা রুচি। নাম বয়স না ভাঁড়ালেই বা কী, প্রায় অপরিচিত একজনের সঙ্গে ক্লাব হোটেলে গিয়ে উদ্দাম হইহই, নাচাগানা কিংবা গাড়ি মোটরবাইকে চেপে যত্রতত্র খানিক পাড়ি জমানো...! খারাপ কি ভাল, মন্তব্য করবে না তিয়া। তবে এসব তার ধাতে নেই। কেন তা হলে ফালতু মজা চাখতে গিয়ে মোবাইলের ব্যালেন্সটাকে ফক্কা বানানো!

তিয়া টুপুস করে বারতাটিকে মুছে দিল। খুব হালকা করে ঠোঁটে লিপস্টিক বুলিয়ে আয়নার তিয়াকে দেখল ভাল করে। নীল জিনসের সঙ্গে কালো টপটা যাচ্ছে তো? নাকি সাদা এমব্রয়ডারি করাটা পরবে? থাক গে, আর সময় নেই, পৌনে দশটার মধ্যে কসবায় পৌঁছোতে হবে। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে গেলেই কেলো, কাজটা মার খেয়ে যাবে আজ।

নিরাভরণ নিটোল হাতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে তিয়া হাঁক পাড়ল,— মা, তোমার কদ্দূর?

সঙ্গে সঙ্গে দোলার স্বর উড়ে এসেছে,— আয় না, খাবার তো রেখে দিয়েছি।

আর একবার আয়নায় নিজেকে দেখল তিয়া। তারপর কাঁধছোঁয়া স্টেপকাট চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বেরিয়ে এল। ডাইনিং টেবিলে বসেই নাক কুঁচকেছে,— আজও টোস্ট পোচ?

দোলা রান্নাঘরে ফিরছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,— তোর তো সকালে ভাজাভুজি পছন্দ হয় না। নইলে আজ ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানাব ভেবেছিলাম।

স্যান্ডুইচ দিতে পারতে।

পরশুই তো তুই স্যান্ডুইচ নিয়ে হল্লা জুড়েছিলি!

উঁহুঁ, পরশু নয়। তার আগের দিন। তিয়া হালকা হাসল,— মাঝে দুটো দিন কেটে গেছে মা।

কী জানি বাবা, কখন তোমার কী খেতে ভাল লাগে। দোলা হাত উলটোল,— আজ ফলের রসে আপত্তি নেই তো?

মা যে কী না! বড্ড বেশি ছকে বাঁধা। ভাল লাগা, মন্দ লাগাটাও যেন একটা বাঁধা নিয়মের গণ্ডিতে আটকানো। একদিন তিয়া কোনও খাবার অপছন্দ করল, তো ওমনি সেটা ঢুকে পড়ল বাতিলের তালিকায়। আকাশ দিনের মধ্যে চোদ্দো বার রং বদলাতে পারে, তিয়ার ইচ্ছে অনিচ্ছে পালটাতে পারে না? এসব বোঝার মতো মনই নেই মা'র।

তিয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,— কথা না বাড়িয়ে দাও যা প্রাণ চায়। ঝটপট।

আজ তোর এত কীসের তাড়া?

কাজ আছে। এক জায়গায় ঘুরে তার পর অফিস যাব।

কারও সঙ্গে দেখা করবি বুঝি?

ইয়েস।

তোর অফিসের কাজের ব্যাপারে?

টোস্টে কামড় দিয়ে চোখ তুলল তিয়া,— আমি কি এখন খেলাধুলো করতে বেরোচ্ছি মনে হয়?

অমন বাঁকাভাবে বলছিস কেন? দোলা যেন সামান্য আহত।

কারণ সোজা কথা তুমি বোঝো না। তিয়া একবারে গোটা পোচটা মুখে পুরে দিল। একমুখ খাবার নিয়ে বলল,— বাবা কোনওদিন তাড়াতাড়ি বেরোলে তাকে এত প্রশ্ন করো?

প্রশ্ন করার দরকার হয় না। সে নিজেই বলে।

সে তো দায়ে পড়ে। হয় তোমায় জলদি জলদি ব্রেকফাস্ট বানাতে হবে, নয় কাকভোরে উঠে সুটকেস গুছোতে হবে...

দোলা গুম হয়ে গেল। ঢুকে গেছে রান্নাঘরে। মা'র শুকনো মুখখানা দেখে একটু বুঝি খারাপই লাগল তিয়ার। কতবার ভেবেছে, মাকে এসব আর বলবে না। কেন যে মুখ ফসকে অপ্রিয় সত্যগুলো বেরিয়ে যায়! মা তো দিব্যি নিজেকে সংসারের একটা প্রয়োজনীয় আসবাব ভেবেই তৃপ্ত, তিয়া যে কেন মানতে পারে না! মায়ের হয়ে গলার শির ফুলিয়ে ঝগড়াও তো করল না কখনও, উলটে মায়ের ওপরই ঝাল ঝাড়ে। এটা কি এক ধরনের হিপোক্রেসি নয়?

দোলা ফলের রস এনেছে। ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করার আর সময় নেই তিয়ার, এক চুমুকে গ্লাস সাফ। দৌড়েছে ব্যাগ আনতে। একঝলক উঁকি দিল

ভাইয়ের ঘরে। বাবু হাত পা ছড়িয়ে নিদ্রামগ্ন। বাবা অফিস বেরোনোর আগে ভাইয়া উঠে দাঁত মাজছিল না? আবার গিয়ে শুয়েছে? অনেক রাত অবধি জাগছে নাকি? করেটা কী? পড়াশুনো? ছোট সোফায় বসে হাইহিলের স্ট্র্যাপ বাঁধতে বাঁধতে তিয়ার হঠাৎই মনে হল, তিতানের গায়ের চামড়াটা ইদানীং বড্ড পুরু হয়ে গেছে। সে দিন কলেজে গন্ডগোল, রাত করে বাড়ি ফিরে বেদম ঝাড় খেল বাবার। অথচ পর দিন সকালেই বিন্দাস। মোবাইলে টাকা ভরার জন্য মাকে জপাচ্ছে। মা হাত উলটে দিতেই ওমনি দিদি। কোনও লজ্জা নেই, মান অপমান নেই...। তিয়া হলে তো সাতদিন বাড়িতে কারও সঙ্গে কথা বলত না।

দু'দিকে মাথা দোলাতে দোলাতে তিয়া দরজা খুলতে যাচ্ছিল, পিছনে মা।

তুই আজ ফিরছিস কখন?

কেন?

পারলে একটু তাড়াতাড়ি আসিস।

কেন?

কাল ভোরে তোর বাবা জামশেদপুর যাচ্ছে...

তো?

পালটা প্রশ্নটা অর্ধসমাপ্ত রেখে তিয়া স্থাণু কয়েক সেকেন্ড। বাবার তো মাসে দশ বার ট্যুর, তার জন্য আজ হঠাৎ তিয়াকে কেন চটপট ফিরতে হবে? নাহ, তিয়ার মাথায় ঢুকছে না। এক এক সময়ে মা যে কী অর্থহীন কথা বলে! কাল হয়তো আবদার জুড়বে, তোর বাবা নেই, আজ বেশি দেরি করিস না কিন্তু! ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বাবার ছুতো না দেখিয়ে সরাসরি তো বলতে পারে, রোজ সন্ধে সন্ধে ঘরে ঢুকে যাস তিয়া, তুই না ফেরা পর্যন্ত আমার বুক কাঁপে...! তিয়াও তা হলে সাফ সাফ জানিয়ে দিতে পারে, সম্ভব নয় মা। শো-রুমই বন্ধ হয় সাড়ে সাতটায়, তার পরেও অফিসে অজস্র কাজ। মেয়ে বলেই ঝটপট পালিয়ে আসব? বরং মেয়ে বলেই না কর্মক্ষেত্রে তাকে প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ করতে হয় সে অযোগ্য নয়! আর সেই চাপ বইতে গিয়েও তো খাটুনির মাত্রা বাড়ে খানিকটা। অবশ্য এক আধদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প-আড্ডাও চলে বই কী। তাতেও দেরি হয় মাঝেমধ্যে। তা চাকরি করছে বলে তিয়ার জীবন তো মরুভূমি হয়ে যায়নি! শুধু অফিস বাড়ি, বাড়ি অফিসই করে যাবে সে, ব্যস? ভাবেটা কী মা?

আবাসনের গেট পেরোতেই চিন্তাগুলো অবশ্য কর্পূরের মতো উধাও। দ্রুত পা চলছে তিয়ার। বড় রাস্তায় পৌঁছে হাত দেখিয়ে একটা অটো থামাল। পিছনে জায়গা নেই, ড্রাইভারের পাশে বসতে হবে। আইনে যদিও তিন জনের বেশি যাত্রী নেওয়ার কথা নয়, তবু এভাবেই চলছে অটোগুলো। এ শহরে বেআইনই আইন। পুলিশ আছে, পার্টি আছে, ভাবনা কী অটোওয়ালাদের!

অফিসটাইমে পরবর্তী অটোতেও একই হাল থাকবে ধরে নিয়ে ঝটিতি উঠে পড়ল তিয়া। বাঁ হাতে মাথার রডখানা পাকড়েছে।

তখনই মোবাইলে টুং টাং। এস-এম-এস। ডান হাতে কোনওক্রমে তিয়া বার করল যন্ত্রখানা। বার্তা দেখে ঠোঁটে চিলতে হাসি। মোবাইলেই টাইমটা দেখল। কাঁটায় কাঁটায় ন'টা পনেরো। রোজ ঠিক এই সময়ে একটা করে মেসেজ আসে সূর্যর। দিনটা ভাল কাটুক, অথবা আজ মুরগি ফাঁসবেই, কিংবা সকালটা আজ বড্ড সুন্দর...। রোমান হরফে বাংলা শব্দগুলো তিয়ার মেজাজকে বেশ তরতাজা করে দেয়। আজ লিখেছে, বউনিটা ভাল হোক। পারেও। ফাজিল নাম্বার ওয়ান। তিয়া বুঝি কথায় কথায় বলেছিল, সকালে আজ ক্লায়েন্ট মিট করতে যাবে... শোনামাত্র মেমারিতে পুরে নিয়েছে।

মোবাইল মুঠোয় রেখে তিয়া বাইরে তাকাল। ঝকঝকে দিন। কর্মব্যস্ত শহর ছুটছে নিজের গতিতে। হলুদ রোদ আর নরম বাতাস মেখে। বসন্ত কি এসে গেল? সূর্য শুভেচ্ছা জানাল বটে, কিন্তু কাজটা আদৌ হবে তো? খুব চেনাজানা না হলে অফিসের কাজে কারও বাড়িতে যায় না তিয়া। পাঁচ মাসের এই চাকরিতে এটা মাত্র দ্বিতীয় বার। আগের কেসটা ছিল দেবলীনার দিদি-জামাইবাবুর। ডিলটা পাকল না শেষ পর্যন্ত, পিছলে অন্য কোম্পানির গাড়িতে চলে গেল তারা। কে কোথ্থেকে বুঝিয়েছে, তিয়ারা যে মোটর কোম্পানির ডিলার, তাদের গাড়ির এসি নাকি যথেষ্ট আরামদায়ক নয়। ব্যস, ওমনি পাল্টি। কতবার বোঝাল তিয়া, তোমরা অন্য কোনও মডেল দ্যাখো, ডিসকাউন্ট আরও বাড়িয়ে দেব, কিছুতেই রাজি হল না। আজ ঋতব্রতর কাকা-কাকিমাও না ঝোলায়!

গড়িয়াহাটে এসে অটো বদলে মিনি। তিয়া কসবা পৌঁছোল পাক্কা ন'টা চল্লিশে। ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে নেই, বাড়িটা মেন রোডের ওপরেই। জরাজীর্ণ এক ত্রিতল অট্টালিকার লাগোয়া জমিতে উঠেছে ফ্ল্যাট। প্রাচীনের গায়ে নবীন, চমৎকার বৈসাদৃশ্য!

ঋতব্রতর কাকা-কাকিমার ফ্ল্যাট দোতলায়। সূর্যর শুভকামনার প্রথম ধাপটা ফলেছে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বাড়িতে মজুত। কাকিমাই খুলেছে দরজা। তিয়া তাদের একেবারে অপরিচিত নয়, ঋতব্রতর দিদির বিয়েতে দেখেছে তিয়াকে। বেশ আন্তরিক ভাবেই অভ্যর্থনা জানাল মহিলা। জিজ্ঞেস করল, —চা কফি কিছু খাবে?

তিয়া নরম গলায় বলল, —না কাকিমা, এক্ষুনি খেয়ে বেরিয়েছি। ...আপনারা দু'জনেই ব্যস্ত মানুষ, বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করব না...

আরে না, এক্ষুনি কোনও তাড়া নেই। তুমি আসবে বলে আমি আজ কলেজ ছুটি নিয়েছি। আর তোমার কাকুর তো আজ অফ-ডে।

ও। তিয়া মৃদু হাসল বটে, তবে ঋতব্রতর ওপর চটল মনে মনে। সব সময়ে অর্ধেক কথা বলে ছেলেটা। কর্তাগিন্নি কলেজ যাবে না জানলে আর একটু দেরিতে বেরোনো যেত। যাক গে যাক, শুভস্য শীঘ্রম। তিয়া ফটাফট ব্যাগ থেকে কাগজের তাড়া বার করে ফেলল। গাড়ির ছবিওয়ালা পাতলা পুস্তিকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, —আপনারা এই মডেলটাই চাইছিলেন তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কী কী কালার পাওয়া যাবে?

চারটে কালার থাকে, কিন্তু এক্ষুনি দুটো অ্যাভেলেবল। স্টিল-গ্রে, আর হোয়াইট।

আমি সাদা ভালবাসি। তোমাদের কাকুর তো আবার...

আহা, রংটং পরে। লম্বা সোফায় দু'হাত ছড়িয়ে বসেছে ঋতব্রতর কাকা। সম্রাটের ভঙ্গিতে বলল, —আগে মূল্য তো স্থির হোক।

তিয়ার মনে পড়ে গেল, ভদ্রলোক কলেজে ইকনমিক্স পড়ায়। এবং ঋতব্রতর টিপস, যে-কোনও জিনিসের দরদাম করা কাকার নেশা। সে ফ্রিজ-টিভি কিনুক, কি কাঁচালঙ্কা। এই ধরনের খদ্দেরদের খেলিয়েই তো মজা।

সপ্রতিভ মুখে তিয়া বলল, —দাম তো কাকু আপনারা জানেনই। নিউজ পেপারেই থাকে। আর এখন যা স্কিম চলছে, তাতে আপনার ইনশিয়োরেন্সটা ফ্রি। তাতেই ধরুন ষোলো হাজার কমে গেল।

সে তো কোম্পানি দিচ্ছে। তোমরা ডিলাররা কত দেবে?

ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনি ঋতব্রতর কাকা... ম্যাক্সিমাম যতটা সম্ভব, নিশ্চয়ই কমিয়ে দেব।

অ্যামাউন্টটা শুনি?

সর্বোচ্চ ছাড়ের সীমা বাঁধা। সেলস ম্যানেজার বলেও দিয়েছে অঙ্কটা। প্রথম দফায় তিয়া তার চেয়ে হাজার পাঁচেক কমিয়েই বলল, —তা ধরুন... কোম্পানি প্রাইসের টু পারসেন্ট।

বলো কী? পাল মোটরস তো ফাইভ পারসেন্ট অফার করছে।

ঋতব্রতর কাকাটা তো মহা ঢপবাজ! কাস্টমারকে পাঁচ পারসেন্ট ছাড়লে পাল মোটরসে কবে লাল বাতি জ্বলে যেত!

তিয়া হেসে সুতো ছাড়ল, —অত কী করে পারবে কাকু? একটা গাড়ি বেচে ডিলারই তো ফাইভ পারসেন্ট পায় না।

পায় কত?

অম্লান বদনে তিয়া পরবর্তী গুলটা মারল। খেলিয়ে খেলিয়ে। গলা খাদে নামিয়ে বলল, —ফ্র্যাঙ্কলি বলব কাকু? এটা কিন্তু স্ট্রিক্টলি কনফিডেন্সিয়াল। কাস্টমারের জানার কথা নয়। ...তবে আপনি ঋতব্রতর কাকা...। আমরা পাই সওয়া তিন। প্লাস একটা ইনসেনটিভ। বছরে যত গাড়ি বিক্রি হয়, তার ওপর।

হুম। সম্রাটের মাথা দুলছে। বিড়বিড় করে হিসেব করল কী যেন। সযত্ন লালিত কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, —তাও তোমরা আর একটু ছাড়তে পারো। অন্তত হাজার চারেক।

ওরে বাবা, তা হলে আমাদের ঘরে ক'পয়সা যাবে?

একটা গাড়িতে লাভ নয় কমই রইল। কাকাও যথেষ্ট খেলোয়াড়। ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসি ঝুলিয়ে বলল, —তুমি ঋতব্রতর বন্ধু... ঘরের মেয়ে ... এটুকু করতে পারবে না?

যাক, কেসটা বোধহয় লেগে গেল। মালহোত্রা অটোমোবাইলস তো আরও হাজার পাঁচেক ছাড়ার অনুমতি দিয়েই রেখেছে তিয়াকে। ভদ্রলোক চাইছে চার। কিন্তু ঝটাকসে রাজি হওয়াও ঠিক হবে না। পার্টি পেয়ে বসে, হরেক বায়না জোড়ে। একবার সেল্‌স ম্যানেজারকে ফোন করে নেবে? অতনুদা খানিকটা গাইডলাইনও দিতে পারে, পার্টিও বোঝে তিয়া তাদের হয়ে খুব লড়ালড়ি করছে।

তিয়া আঙুল তুলে বলল, —এক মিনিট। আমি তা হলে বসকে একটু কনভিন্স করার চেষ্টা করতে পারি। আপনাদের জন্য যতটা সম্ভব...

উঁহু, যতটা নয়। আমি যা বলছি, ততটাই।

টকাটক মোবাইলের বোতাম টিপল তিয়া। সচেতন ভাবে গলা নামিয়ে বলল, —অতনুদা, পার্টি তো মোট চোদ্দো হাজার ডিসকাউন্ট চাইছেন।

অতনু ইঙ্গিত বুঝে গেছে। বলল, —তুমি কি এখন পার্টির সামনে?

হ্যাঁ।

ও কে। এগোও। যতটা পারো অ্যাক্সেসারিজ ভেড়াও।

এবার তিয়া গলা উঠিয়েছে, —কিন্তু সব মিলিয়ে চোদ্দো হাজার ডিসকাউন্ট দিতেই হবে। এঁরা আমার খুব পরিচিত। প্রায় রিলেটিভ। অত্যন্ত রেসপেক্টেবল কাস্টমার। বলতে বলতে অপাঙ্গে দেখল বন্ধুর কাকাটিকে। বেশ একটা ওজনদার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরিয়েছে ভদ্রলোক। মনে মনে মুচকি হেসে তিয়া বলল, —আমি কিন্তু এঁদের না বলতে পারব না অতনুদা।

হয়েছে, হয়েছে। পারলে এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টিটাও পুশ করো। পেপার্স টেপার্সগুলোও ঠিকঠাক কালেক্ট করে নাও।

থ্যাঙ্ক ইউ অতনুদা। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ।

ফোন সুইচ অফ করে মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়েছে তিয়া। ঋতব্রতর কাকিমা এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ছিল, এবার উজ্জ্বল মুখে জিজ্ঞেস করল, —হয়ে গেছে?

না হইয়ে ছাড়ব নাকি? ঋতব্রত কি তা হলে আমায় আস্ত রাখবে? তিয়ার স্বর আহ্লাদি আহ্লাদি, —তবে কাকিমা, আমার একটা রিকোয়েস্ট কিন্তু রাখতে হবে। এক্সট্রা চার হাজারের হাফ দেব আমরা ক্যাশ ডিসকাউন্ট, বাকি অর্ধেক অ্যাক্সেসরিজ।

সেগুলো কী কী?

ফুল ম্যাটিং, প্লাস ফ্লোর ম্যাট, প্লাস স্টিয়ারিং কভার, তারপর ধরুন মাডগার্ড ফ্ল্যাপ...

আর একটা পারফিউম?

বেশ। একটা এম্বিপিয়োর দিয়ে দেব। আর কাকুর জন্য কার-অ্যাশট্রে।

দূর দূর, অ্যাশট্রে কী হবে?

না না, দরকার। ভদ্রলোক নড়ে বসেছে,— এখনকার মারুতি ভ্যানটায় বারবার বাইরে হাত বাড়িয়ে ছাই ঝাড়তে হয়। ডিসগাস্টিং।

কিনছ তো এসি গাড়ি। কাচ তোলা থাকবে। বদ্ধ গাড়িতে তুমি স্মোক করবে?

কাচ নামিয়ে খাব। গাড়িতে বেশিক্ষণ সিগারেট না খেয়ে আমি থাকতে পারি না।

যত্ত সব বদ অভ্যাস। ভাল লাগে না।

স্বামী-স্ত্রী-র খুনসুটি চলছে। তিয়া উপভোগ করছিল। মোক্ষম হয়েছে ছাইদানির চালটা। ঋতব্রতর হিসেবি কাকা এখন খেয়ালই করবে না, দু'হাজার টাকার ক্যাশ ডিসকাউন্টের বদলে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসপত্র ঠেকালে মালহোত্রা অটোমোবাইলসের লাভ একটু বেশিই। ওর থেকে অন্তত আটশো হাজার ফেরত আসবে কোম্পানির ঘরে। হয়তো তেমন কিছু নয়, তবু কম কী? এভরি ফার্দিং কাউন্টস।

পেশাদারি দক্ষতায় কাগজপত্রের কাজগুলো ঝটাপট সেরে ফেলল তিয়া। ঋতব্রতর কাকা ব্যাঙ্ক লোন নেবে, পুরো টাকা পেতে দিন কয়েক সময় লাগবে, অগ্রিম বাবদ একখানা এক লাখ টাকার চেকও হস্তগত করল দ্রুত। মালহোত্রা অটোমোবাইলস ঋণের বন্দোবস্ত করলে আরও কিছু আসত, তবে তা নিয়ে আর চাপাচাপিতে গেল না। ইদানীং মধ্যবিত্তরা পটাপট গাড়ি কিনছে। ক্রেতা হিসেবে তারা সর্বদাই সন্দিগ্ধ এবং স্পর্শকাতর। কেবলই ভাবে, গাড়ি বেচনেওয়ালারা এই বুঝি তাদের ঠকিয়ে দিল। অতএব জোরাজুরিতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মতি বদলের আগে অগ্রিমটা এখন ক্যাশ করে নিতে পারলেই তিয়া নিশ্চিন্ত।

ব্যাগ গুছিয়ে তিয়া উঠব উঠব করছে, হঠাৎই ভদ্রমহিলা বলল, —অ্যাই মেয়ে, তুমি আমাদের আর একটা কাজ করে দেবে?

বলুন?

আমাদের এখনকার গাড়িটা বেচে দাও না।

ওমা, আগে বলবেন তো! ঋতব্রত তো বলছিল আপনারা ওটাও রেখে দেবেন!

সেরকমই ইচ্ছে ছিল। ভেবেছিলাম, কোনও রেন্টাল এজেন্সিতে দেব। যা আসবে, তাই দিয়ে ব্যাঙ্ক লোনের খানিকটা শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন চার দিকে যা দেখছি, শুনছি... কোথায় কে গাড়ি ভাড়া নিয়ে কোন দুষ্কর্ম করল... আমরাও পড়ব ফ্যাসাদে...। তা ছাড়া রেন্টাল এজেন্সিগুলোও নাকি টাকার ব্যাপারে বড় ঘোরায়।

তিয়ার চোখ চকচক করে উঠল। পুরনো গাড়ি কেনাবেচার এজেন্ট হাতেই আছে। শিশির দস্তিদারকে ফোন লাগালেই এক্ষুনি এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তিয়ার আসবে কত?

মোলায়েম স্বরে তিয়া জিজ্ঞেস করল, —আপনাদের তো মারুতি ভ্যান। কোন সালের মডেল?

একটু পুরনো। এই ধরো ন'-দশ বছর।

কী রকম দাম আশা করছেন?

খেলোয়াড় আবার মাঠে নেমেছে, —ষাট-পঁয়ষট্টি...

এবার তিয়ার দরাদরির পালা। তবে এক্ষুনি সে পথে গেল না তিয়া। ভুরু কুঁচকে দু'-এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে টকাটক শিশিরকে ফোন। লাইন এনগেজড। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা, আবার ফোন। নাহ্, পাওয়া যাচ্ছে না। তৃতীয় চেষ্টাতে বিফল হয়ে তিয়া রীতিমতো বিরক্ত। দরকারের সময়ে কখনওই লোকটাকে ধরা যায় না। অথচ তিয়াদের অফিসে এসে তাগাদার পর তাগাদা, পুরনো গাড়ির খবর আছে নাকি!

তিয়া চুল ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বসল, —চিন্তা করবেন না, লোক আমি পাঠিয়ে দেব। তবে পঞ্চাশের বেশি পাবেন বলে মনে হচ্ছে না।

কেন? খুব ভাল কন্ডিশনে আছে...

সেকেন্ড হ্যান্ডের মার্কেট বড় ডাল যাচ্ছে কাকু। সবাই নতুনই কিনছে কিনা। দেখছেন না, প্রাইস ঝপঝপ পড়ে যাচ্ছে! তবু দেখি, ম্যাক্সিমাম কত আপনাদের পাইয়ে দিতে পারি...

ঋতব্রতর কাকা-কাকিমার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে, আর বাস মিনিবাস নয়, তিয়া সটান ট্যাক্সিতে। আহ্, স্বস্তি। বউনি সত্যিই ভাল হল আজ। কথাটা মনে হতেই হাতে মোবাইল, বার্তা পাঠাচ্ছে সূর্যকে। শুধু একটাই শব্দ, সাকসেস। তারপর সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছে। ফেব্রুয়ারি মাসটা যাচ্ছে ভাল। সবে আজ আঠেরো, এর মধ্যেই দু'-দুটো গাড়ি বেচে ফেলল। অর্থাৎ মাসিক কোটার ডবল, তাদের চার জনের টিমে কেউই এক পেরিয়ে দুয়ে পৌঁছোয়নি। দীপন বেচারার তো এ মাসে খাতাই খুলল না। পুওর সোল। ...এ মাসে বাড়তি কত আসতে পারে তিয়ার? সাত হাজার? আট? উঁহুঁ, আটের বেশি হবে না। বোধহয় আজ যদি সিটকভার, টেপ ফেপ গছানো যেত, অঙ্কটা একটু ভারী হত। যাক গে, চেনা পরিচিতর মধ্যে বেশি লোভ করতে নেই। বরং ওই কাকা-কাকিমাদের জপিয়ে আরও দুটো একটা কাস্টমার ধরতে পারলে তিয়ার আখেরে লাভ। কলেজের মাস্টাররা আজকাল খুব গাড়ি কিনছে। পরশুই তো এক অধ্যাপক তাদের শো-রুমে ঘুরে ঘুরে মডেলগুলো দেখছিল। দেদার

টিউশনির পয়সা, খরচ তো করতে হবে। করো বাবা, করো। শুধু বড়লোকরাই গাড়ি চড়বে কেন, এখন তোমরাও আমাদের লক্ষ্মী। আহা রে, পেট্রোলের দামটা যদি ঝপ করে পড়ে যেত, গাড়ি বিক্রি বেড়ে যেত হুহু করে। এবং তিয়ার ইনসেনটিভ। কুড়ি... পঁচিশ... তিরিশ...! তিয়াই তখন একটা কিনে নিতে পারে। নিজেদেরই শো- রুম থেকে। নিজেই চালিয়ে আসবে, পার্ক করবে শো-রুমের পিছনটায়, কাস্টমার কলে বেরিয়ে যাবে চার চাকা নিয়ে...। খুব আওয়াজ দেবে সূর্য। মোটরবাইকের ধাপ পেরোতে পারেনি তো, হিংসেয় জ্বলবে নির্ঘাত। জ্বলুক, তিয়ার তাতে কাঁচকলা। তিন-চারটে বড় জায়গায় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের অর্ডার পেয়ে ইদানীং একটা কী হনু, কী হনু, ভাব এসেছে সূর্যর। নাকে একটু ঝামা ঘষে দিতে পারলে বেশ হয়।

অলস কল্পনার কাল শেষ। শো-রুম এসে গেছে। ঢুকেই কাজের আবর্তে ঘুরপাক খেতে লাগল তিয়া। অতনু সেনকে রিপোর্ট দিল, কম্পিউটারে ঢোকাল বিক্রি সংক্রান্ত তথ্যাবলি, টিমের বাকি তিন জনের মতোই শো-রুমে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাড়ির মডেল দেখাল সম্ভাব্য খরিদ্দারদের...। ফোনও আসছে মুহুর্মুহু। মিটিং চলছে। টিম মিটিং, জি-এস-এমের চেম্বারে সাপ্তাহিক মিটিং...। মাঝে কোনওক্রমে টিফিন গেলা ছাড়া সন্ধে সাতটার আগে ফুরসত মেলা ভার। অবশ্য আজ আর কোনও এনকোয়ারিতে বাইরে ছুটতে হল না, এই যা রক্ষে।

সন্ধে গাঢ় ক্রমশ। শো-রুমের ব্যস্ততা কমেছে। দোতলায় নিজস্ব চেয়ারটেবিলে তিয়া থিতু এখন। তৈরি করছে সারা দিনের কাজের বিবরণী। বাকি সহকর্মীরা এ দিক ও দিক ছড়িয়ে। চিনোজ আর স্প্যাগেটি-টপ সোনালি হরিণ পায়ে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। তিয়াকে একটা 'হাই' ছুড়ে দিয়ে বসেছে নিজের জায়গায়। খানিক বাদে একটা স্ট্র্যাটেজি মিটিং আছে আজ, তারপর ছুটি।

তিয়ার মনোযোগে বাধা পড়ল। মোবাইলে 'কাল হো না হো' বাজছে। ভুরু কুঁচকে নম্বরটা দেখল তিয়া। অচেনা। শেষবেলায় কোন মক্কেল রে ভাই?

কানে যন্ত্র চাপল তিয়া,— ইয়েস প্লিজ।

ম্যাডাম, আমি ইন্দ্রজিৎ রায় বলছি।

তিয়া স্মরণ করতে পারল না নামটা। তবু বলল,— ইয়েস, বলুন?

লাস্ট উইকে আমি এক বন্ধুর সঙ্গে আপনাদের শো-রুমে গেছিলাম। বন্ধু গাড়ি দেখছিল, তখন আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা হল...

ও, সেই জিন্‌স পাঞ্জাবি? কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা? তিয়া তাড়াতাড়ি বলল,—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। বলুন কী ব্যাপার?

আপনি বলেছিলেন আপনাদের কাছে মাঝে মাঝে পুরনো গাড়ির খবর আসে...। আমাকে একটা কিনতে হবে... বলেছিলেন টাইম টু টাইম খবর নিতে...

একেই বুঝি বলে যোগাযোগ! ইন্দ্রজিৎ রায় আজই গাড়ির জন্য ফোন করছে, আর আজই তিয়ার কাছে...? সামান্য সময় নিয়ে তিয়া বলল,—একটা খবর আছে। মারুতি ভ্যান। গুড কন্ডিশন। চলবে?

দৌড়োবে। খুব পুরনো নয় তো?

ন'-দশ বছরের। পঞ্চাশ-পঞ্চান্নয় হয়তো দিয়ে দেবে।

নাহ, তা হলে হল না। আমি চল্লিশের বেশি উঠতে পারব না। মেরেকেটে... আর দু'-পাঁচ হাজার।

তিয়া ভাবল আবার। ঋতব্রতর কাকা ষাট-পঁয়ষট্টি বলেছে, কিছু কমবে। হাতের ডটপেন ঠুকতে ঠুকতে বলল, —ঠিক আছে, কথা বলে জানাচ্ছি। তবে মনে হয় পঞ্চান্নর নীচে নামবে না।

খুব টাফ হয়ে যাবে।

দেখুন। ভাবুন। আপনি গ্রিন সিগন্যাল দিলে...

না, না, আপনি কথা বলুন। আসলে আমার প্রয়োজনটা খুব জরুরি... দালাল টালাল ধরলে তারা আবার দাম বাড়িয়ে বলবে...

তিয়া ফস করে বলে ফেলল, —কমিশন কিন্তু আমাকেও দিতে হবে। চার পার্সেন্ট।

ইন্দ্রজিতের স্বর আচমকাই চুপ। তারপর ফের ফুটেছে, —ওয়েল... দেব। আপনিও দেখুন, যতটা কমাতে পারেন...। আমার রিসোর্স কিন্তু সত্যিই লিমিটেড ম্যাডাম। প্লিজ, ব্যাপারটা একটু ভাববেন।

স্বরটা যেন করুণ শোনাল। সত্যি? নাকি অভিনয়? এই ধান্দাবাজ শহরে মানুষকে বিশ্বাস করা খুব কঠিন। হয়তো বেচারা পার্টি হাতে রেখে সস্তায় কিনতে চায়! হয়তো শিশির দস্তিদারের লাইনেই নেমেছে সম্প্রতি, জিন্‌স-পাঞ্জাবি-শান্তিনিকেতনি ঝোলা নতুন কায়দার ইউনিফর্ম!

তবু স্বরে যেন কী একটা আছে। দিনভর কম কেজো কণ্ঠ তো শোনে না তিয়া, কিন্তু এ যেন একটু আলাদা। অক্ষমতা ঢাকতে কোনও চালবাজি নেই।

তিয়া নরম করেই বলল, —ও কে। দেখছি। আপনি ঘন্টাখানেক বাদে রিং করুন।

ঋতব্রতর কাকাকে ডায়াল করার আগে তিয়া একটুক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। আস্তে আস্তে মুখে একটা হাসি জেগেছে। পঞ্চাশে যদি রাজি হয়, তিয়ার ভাগে দুই। নট ব্যাড। নট ব্যাড। আমদানিটা আজ মন্দ হচ্ছে না। গত এপ্রিলে কেনা মোবাইলটা কি এবার বদলে ফেলবে?

উঁহুঁ, না, না, না। তিয়া নিজেকে ধমকাল। মার্কেটিংয়ের কোর্স পড়ার সময়ে বাবার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার নিয়েছিল। খুব গাঁইগুঁই করেছিল বাবা। তিয়া বলেছিল, ধার হিসেবে দাও, চাকরি পেলে শোধ করে দেব। ব্যাঙ্কে হাজার পনেরো মতন জমেছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে আরও দশ হাজার টাকা থোক যদি দিয়ে দিতে পারে...

তিয়া বেশি করে বাতাস ভরল ফুসফুসে। হ্যাঁ, কথার দাম রাখাটাই বেশি জরুরি।

চার

তুহিন দূরের পাহাড় দেখছিল। তুহিন ডুবন্ত সূর্য দেখছিল। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে দিনশেষের বর্ণচ্ছটা দেখছিল তুহিন।

তা ওই দেখাই সার। কিছুই যেন গভীরে ঢোকে না সে ভাবে। চোখের লেন্স দুটো যেন অস্বচ্ছ হয়ে এসেছে। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য নেহাতই ম্যাড়মেড়ে। এত ক্লান্তি... এত ক্লান্তি...!

দিনটা আজ গেল বটে। তুহিন বরাবরই দেখেছে, ট্যুরের তৃতীয় দিনটা শরীরের সব শক্তি নিংড়ে নেয়। প্রথম দিন তো ঝামেলা প্রায় থাকেই না। নেমে, হোটেলে চেক-ইন করে, একটু জিরিয়ে টিরিয়ে, যাও বাবুদের প্ল্যান্টের অফিসে, রথী মহারথীদের গিয়ে মুখটা দেখাও, যদি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন থাকে তো সেরে ফেলো বিকেল বিকেল, তারপর সন্ধেবেলা গুটিগুটি অফিসার্স ক্লাবে হাজির হয়ে নিজের আসাটাকে একটু পোক্ত করে নাও...। দ্বিতীয় দিন তো কাটে কোম্পানির হাঁড়ির খবর নিতে নিতে। কবে নাগাদ নতুন টেন্ডার বেরোচ্ছে, কোন কোন ডিপার্টমেন্টে

রদবদলের সম্ভাবনা, আনকোরা কেউ আসছে কিনা, নতুন কী প্রোজেক্ট শুরু হতে পারে...। আরও একটা আছে। খোঁজখবর করে দেখো আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারে এল কিনা, কিংবা পুরনোর ভেনাস রবারের নামে কী কী নতুন চুকলি খেয়ে গেল...। এই কাজগুলো অবশ্য এখন তুহিনের নয়। এসবের জন্য সেলস অফিসাররা আছে, এবং তারা ঘনঘন চরকিও খেয়ে বেড়ায়। তবু তুহিন পুরনো অভ্যেসটা ছাড়তে পারেনি। এতে অবশ্য দু'তরফা লাভ। প্রথমত, সরাসরি ওয়াকিবহাল থাকা। দ্বিতীয়ত, অধস্তনেরা কে কত টুপিটাপা দিচ্ছে যাচাই করে নেওয়া। তা ছাড়া ভেনাস রবারের আঞ্চলিক অধিকর্তা স্বয়ং এসে কোম্পানির মাঝের তলা, নীচের তলায় কথা বলছে, এর একটা আলাদা মূল্যও আছে। ভারী তুষ্ট হয় লোকগুলো, ব্যাকব্যাক করে অনেক গুপ্ত সমাচার শুনিয়ে দেয়। আর ওগুলোই তো তুহিনের তুরুপের তাস। অফিস মিটিংয়ে ছাড়ে মাঝে মাঝে, সেল্‌স অফিসারগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে। এরপর তো সন্ধেবেলা নিয়মমাফিক পার্টি। ভেনাস রবারের পয়সায় কেনারামদের কাঁড়ি কাঁড়ি মদ গেলানো। কাবাব বিরিয়ানির নয়ছয়। কিন্তু তৃতীয় দিনটিতেই আসল কাজ। প্ল্যান্ট ভিজিট। ভেনাসের মাল নিয়ে কোনও নালিশ আছে কিনা দেখতে হয় সরেজমিনে। ফ্যানবেল্ট, ভি-বেল্টে কী কী খুঁত বেরোল, কনভেয়ার বেল্টের পুরনো সমস্যাটা আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে না তো, অথবা কী কী বদল ঘটালে ভাল হয়, নোট নেয় ঘুরে ঘুরে। কী যে ধকল!

ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে তুহিন হোটেলের কোলবারান্দা থেকে সরে এল। বসেছে ফোমে মোড়া দোলচেয়ারে। আর কত দিন যে এভাবে টানতে পারবে সে? এই তো সেদিন চাকরিজীবন শুরু করল, এর মধ্যে কেটে গেল তি-রি-শটা বছর? কোথা দিয়ে যে গেল? কবে যে তার শরীর যৌবন পেরিয়ে পা রাখল এই প্রৌঢ়বেলায়?

আগে এসব ভাবত না তুহিন। একটাই তো মন্ত্র ছিল জীবনে— চরৈবেতি, চরৈবেতি। এখন একা হলেই পিছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে। কেমন ছিল রাস্তাটা? চলতে চলতে, পথেপ্রান্তরে, কোথায় কী ফেলে এল সে? কী-ই বা কুড়িয়ে পেল?

অজস্র ভাঙাচোরা ছবি। অগুনতি ছেঁড়াখোঁড়া দৃশ্য। একটা অক্ষম, বদরাগী বাবা। একটা সিঁটিয়ে থাকা মা। একটা স্বার্থপর ভাই। একটা আধাশীতল বউ।

একটা মাথামোটা ছেলে। একটা জিদ্দি মেয়ে। আর চাকরি? সে তো আজীবন টেনশন টেনশন...। সারাক্ষণ সরু সুতোর ওপর ব্যালেন্স করে করে হাঁটা। এসব নিয়েই তো চুয়ান্ন বছর বয়সে পৌঁছে গেল তুহিন। আর কী, এবার তো মানে মানে কেটে পড়লেই হয়।

এই মৃত্যুচিন্তাটা নতুন। ইদানীং হানা দিচ্ছে মাঝে মাঝে। তুহিন আমল দিতে চায় না, তবু কোন ফাঁকফোকর দিয়ে যে ঢুকে পড়ে মগজে! এখনও কত কাজ বাকি। ছেলেটা দাঁড়ায়নি, মেয়ের বিয়ে দেওয়া হল না, ফ্ল্যাটের লোন চলছে, এমন কিছু সঞ্চয় নেই যাতে দোলার বাকি জীবনটা কেটে যেতে পারে... এখনই কি মরার কথা ভাবতে আছে? বাবাকে দেখে কিছুই কি শেখেনি তুহিন?

তুহিনের বাবা মারা গিয়েছিল মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে। সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। তুহিন তখনও পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় বসেনি। একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাইভেট কোম্পানির, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ করা কেরানি ছিল রথীন মিত্তির। পাঁচ পয়সা সঞ্চয়ও ছিল না সংসারে, অফিস থেকে প্রায় কিছুই জোটেনি, নির্মলা চুড়ি বালা বেচে কোনওক্রমে কলেজের গণ্ডিটুকু পার করিয়ে দিয়েছিল বড় ছেলেকে। তার পর থেকেই তো ঘানি টানা। বলদ ঘুরছে... বলদ ঘুরছে...। আজ তুহিন মরে গেলে হয়তো অতটা অথই জলে পড়বে না দোলারা, তবু ভোগান্তি তো আছেই। তিয়ার ঘাড়েই হয়তো এসে পড়ল চাপ। ওফ্, সেই চাপটা যে কী মারাত্মক, তুহিন হাড়ে হাড়ে জানে। বাপ হয়ে সে কি তা চাইতে পারে?

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল তুহিন। উঠে জগ থেকে জল খেল একটু। গলার শুকনো ভাব কাটল সামান্য। অম্বল হয়ে আছে কি? একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বেল বাজিয়ে ডাকল বেয়ারাকে।

চেনা হোটেল। পরিচিত বেয়ারা। আদিবাসী ছেলেটা এসে ঘাড় ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে। তুহিনের হাবভাবে কোনও অফিসারসুলভ ভারিক্কিপনা নেই। আগেও ছিল না, গজাতেও দেয়নি। সহজ সুরেই বলল,— কী রে সনাতন, সন্ধেবেলা আমায় উপোস করিয়ে রাখবি?

বলুন স্যার, কী খাবেন? ভেজ পকোড়া, এগ পকোড়া, চিকেন পকোড়া, চিকেন কাটলেট, পনির চপ...?

এক সময়ে এই প্রতিটি গুরুপাক খাদ্যই প্রিয় ছিল তুহিনের। এখন আর টানে না। ঠোঁট ছুঁচোল করে বলল,— টোস্ট ফোস্ট হবে না?

এখন টোস্ট? সনাতন মাথা চুলকোচ্ছে।

তা হলে বিস্কুট নিয়ে আয়। ক্রিম ক্র্যাকার। আর এক কাপ লিকার চা।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চা-বিস্কুট হাজির। কাপে সবে প্রথম চুমুকটা দিয়েছে, দরজায় টকটক।

কাম ইন।

রাজেশ ঢুকল। রাজেশ দুবে, ভেনাস রবারের জামশেদপুরের এজেন্ট। রাজেশের মাধ্যমেই এখানকার ব্যাবসা চলে তুহিনদের। কমিশন ভিত্তিতে।

অ্যাথলিট চেহারার, বছর পঁয়তাল্লিশের রাজেশ ঘরে ঢুকে চোখ বড় বড় করল, —এ কী স্যার আপনার কি শরীর খারাপ?

কই, না তো!

তা হলে ইভনিংয়ে রুমে বসে চা বিস্কুট খাচ্ছেন?

মেঘলা মেজাজটা পলকে বদলে ফেলেছে তুহিন। হেসে বলল, —টেস্ট করে দেখছি, এই সময়ে চা কেমন লাগে!

মুখ বদল? হা হা হা। রাজেশ চেয়ার টেনে বসল,— তা স্যার... যাবেন তো ক্লাবে?

যাব?

চলুন। গাড়ি এনেছি।

একটা বিস্কুট রাজেশের হাতে ধরিয়ে দিল তুহিন। আলগা হেসে বলল, — আজ থাক না।

সে কী স্যার? শুক্লা-সাব, চ্যাটার্জি-সাব, মিস্টার জরিওয়ালা, সব্বাই থাকবেন, মৌজটৌজ হবে...

কাল তো হল একচোট। আজ আর ইচ্ছে করছে না।

চলুন না স্যার। আজ দুবে এন্টারপ্রাইসকে একটু আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।

একই সংলাপ শুনে শুনে কান পচে গেছে। সে কী-বা রাউরকেল্লা, কী-বা চন্দ্রপুরা, কিংবা ধানবাদ রাঁচি বোকারো সিন্ধ্রি ঝরিয়া, সর্বত্র এজেন্টদের উদ্দেশ্য একটাই। আপনারা খুশি থাকুন, আমাদেরও খুশিতে থাকার বনেদটাকে শক্ত করে দিন। দু'তরফের মধ্যিখানে আছে তো, সর্বদাই আশঙ্কা এই বুঝি এক পক্ষের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হল। বোঝে না রাজেশরা যতটা চাপে, তুহিনরাও ঠিক ততটাই চাপে। এবং কেনারাম

অফিসারগুলোও। এ এক অভিনব ত্রিভুজ, যার প্রতিটি শীর্ষবিন্দু অবিরাম নিজের ঘাঁটি আগলাচ্ছে।

তুহিন ফের বলল,— নাহ্, আজ বাদই দিন।

রাজেশ ঈষৎ থতমত। তার পরেই চোয়াল বিকশিত করেছে,— সন্ধেটা তা হলে একেবারে শুখা যাবে স্যার? রুমেই কিছু আনাই? ব্ল্যাক ডগ, জনি ওয়াকার, পিটার স্কট...?

সুরার নাম শুনেও কেন যেন তেমন উদ্দীপিত বোধ করল না তুহিন। তবু অভ্যাসবশে বলল, —দিন যা হোক কিছু বলে।

গ্লাস, বোতল, ফিঙ্গার চিপস, শসা, পেঁয়াজ, মাছভাজা এসে গেল পলকে। চা শেষ করেই হুইস্কিতে চুমুক দেবে কিনা তা নিয়ে সামান্য খুঁতখুঁত ছিল তুহিনের। সোনালি পানীয়ের দর্শন মিলতেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব হাপিস। গ্লাস ছুঁইয়েছে ঠোঁটে। কষটে স্বাদটা চারিয়ে দিল রক্তে।

রাজেশেরও হাতে সুরা। শসা দাঁতে কেটে বলল, —আজ কিন্তু ক্লাবে একবার যেতে পারতেন স্যার। মিস্টার জরিওয়ালার সঙ্গে আপনার আগের বার মোলাকাত হয়নি।

কাল তো আর একবার ঢুঁ মারব। তখনই...

আপনি অনেক বদলে গেছেন স্যার।

তাই বুঝি? ...বয়স তো বাড়ছে।

শুধু বয়স কেন স্যার, আপনার ওজনও তো বাড়ছে। রাজেশের চোখে হাসি খেলে গেল,— আপনি তো চিফ সেল্‌স ম্যানেজার বনে যাচ্ছেন, তাই না?

কে দিল খবরটা? আমাদের সান্যাল?

না স্যার। সান্যাল-সাব এসে তো শুধু কাজ নিয়ে থাকেন। ফালতু বাত করেন না। বহুত পাক্কা আদমি।

তা হলে?

আপনাদের হেড অফিসে আমারও তো কিছু জান পহেচান আছে...

সে কি আমি জানি না? আপনার হাত ব্রহ্মদত্যির থেকেও লম্বা।

রাজেশ আবার হা হা হাসল,— তা স্যার, সি-এস-এম হলে তো আপনার আসা অনেক কমে যাবে!

হয়তো।

পাওয়ার ভি তো অনেক বেড়ে যাবে!

ক্ষমতা বাড়বে কিনা জানি না, তবে টেনশন চার গুণ বাড়বে। ফেরিওয়ালাদের সর্দার হওয়ার হ্যাপা নেই? এম-ডি আরও বেশি করে ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলবে। টার্গেটের দিকে তাকিয়ে চুল ছিঁড়তে হবে। মাল বেচার নতুন নতুন কায়দা উদ্ভাবন করতে হবে প্রতিদিন!

আপনার মতো মানুষের স্যার আরও আগেই এই পোস্টে যাওয়া উচিত ছিল।

রাজেশ হালকা চালেই বলেছে কথাটা। কিংবা তেল মারতে। তবু কোথায় যেন বাজল তুহিনের! সত্যি তো, চুয়ান্ন বছর বয়সে এই পদে পৌঁছোনোয় খুব একটা গৌরব কি আছে। কী করা, মাঝপথে কেঁচে গণ্ডূষ করতে হল যে। ভেনাস রবারে সে তো এই সেদিন এসেছে, বড়জোর বছর পনেরো। আসতে বাধ্য হয়েছে। তার আগের কোম্পানি রবার ইন্ডিয়া এখন টিকে থাকলে, তুহিন অ্যাদ্দিনে কোথায় উঠে যেত!

কপাল, সবই কপাল। কী চমৎকার চলছিল রবার ইন্ডিয়া, তুহিনও দিব্যি পা রেখেছিল মইতে। ঘুরতে হত ঠিকই, তবে এতটা টেনশন ছিল না। সরকারি হওয়ার সুবাদেই তুতো-ভাইদের মাল বেচতে অনেক সুযোগসুবিধে তখন। আর পাঁচটা দিশি কোম্পানির চেয়ে দর কম না হলেও কুছ পরোয়া নেই, রবার ইন্ডিয়ার ফ্যানবেল্টই কিনতে হবে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে। তাদের সারা বছরের কেনাকাটার একটা মোটা অংশ রবার ইন্ডিয়ার জন্য তো বাঁধা। কী যে বিশ্বায়নের হুজুগ এল, দিল্লির উদারীকরণ নীতির ঝাপটায় রবার ইন্ডিয়ার জোশ খতম। সরকার সোজা বলে দিল, যাও, খোলা বাজারে লড়ে খাও! সস্তা এবং সেরা দুটো গুণই না থাকলে বসে বসে আঙুল চোষো! এতকাল ভারী আনন্দে, প্রায় ফাঁকা মাঠে, ছড়ি ঘুরিয়েছিল রবার ইন্ডিয়া, বাজারে হঠাৎ জাঁদরেল জাঁদরেল দিশি বিদেশি বেচনেওয়ালা এসে যাওয়ায় তুহিনদের সাড়ে সর্বনাশ। কারখানায় পাহাড়ের মতো মাল জমছে, জমছে...। আগে যেখান থেকে টুসকি বাজিয়ে অর্ডার মিলত, তারা সটান দেখিয়ে দিচ্ছে দরজা।

কী যে দিন গেছে তখন! বুঝতে পারছে তুহিন, মাঝদরিয়ায় একটা ফুটো নৌকোয় বসে আছে, পালানোর রাস্তা পাচ্ছে না...! অহরহ চিন্তা, এই বুঝি কারখানায় তালা ঝুলল! তার পর কী করবে তুহিন? চল্লিশ বছর বয়সে সে কোথায় চাকরি পাবে? কে নেবে তাকে? কেন নেবে? যে দেশে লাখ লাখ টগবগে জোয়ান চাকরির জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে, তার মতো আধবুড়োকে

সেখানে কে পুঁছবে? জমানো টাকা-পয়সা কিছু আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে কদ্দিন...? সংসারের খরচ অসম্ভব বেড়ে গেছে। লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটটার ভাড়াই তো আড়াই হাজার। মেয়ে ক্লাস সিক্স, ছেলে টু... তাদের পড়াশুনো চালানো তো হাতি পোষা! খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে একটা মান তৈরি হয়ে গেছে, তার থেকেই বা আচমকা নামা যায় কী করে?

ভাগ্যিস তখনই ভেনাস রবারে পা রাখার একটা জায়গা মিলেছিল! হোক না দিশি কোম্পানি, না হয় এক ধাপ নিচু থেকে শুরু করছে, মাইনেকড়িও সামান্য কমল... তবু বেঁচে গেল তো!

নাহ্, উন্নতি অবনতি নিয়ে তুহিনের আফশোস নেই। রবার ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সহকর্মীদের এক একজনের যা হাল দেখে এখন। কেউ অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজনেস করছে, কেউ বা ইনশিয়োরেন্সের এজেন্ট...। ঘোষ তো কী এক চিটফান্ড খুলে ফোর টোয়েন্টি কেসে ধরা পড়ল। তুহিন কি তাদের চেয়ে ঢের ঢের ভাল নেই?

তুহিন গ্লাসটাকে দু'হাতের মাঝে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, —আই বিলিভ ইন ডেসটিনি দুবেজি। যেখানে যখন পৌঁছোনোর, তখনই তো পৌঁছোব। সে ওপরেই হোক, কি নীচে।

উয়ো তো সচ্ বাত্। রাজেশ ঢকঢক ঘাড় নাড়ল,—পৌঁছানেওয়ালা তো উপরে বসে আছেন।

ভগবান টগবান বুঝি না ভাই। তুহিন হেসে একটা ফিল্মি ডায়ালগ ছাড়ল, —যব যব যো যো হোনা হ্যায়, তব তব সো সো হোতা হ্যায়।

হা হা হা। বড়িয়া বলেছেন। রাজেশ তুহিনের শূন্য গ্লাসে ফের পানীয় ঢালল। গ্লাস টেবিলে রেখে এক মুঠো ফিঙ্গার চিপস তুলেছে হাতে। চোখ টেরচা করে বলল,— কিন্তু স্যার, আমার কথাও একটু ভাবুন।

আপনার আবার কী হল?

কদ্দিন আর এক জায়গায় আটকে থাকব? হাফ পারসেন্ট অন্তত বাড়ান।

ওরে বাবা, এখন খরচ কমাও অভিযান চলছে। চার জনকে ভি-আর ধরানো হল। এখন আপনার কথা তুললে এম-ডি আমায় বাঁশপেটা করবে।

এই বললে চলে স্যার? সর্ব কিছুর ভাও বাড়ছে। কোম্পানির সাহেবদেরও রেট চড়ে গেছে।

মালকড়িগুলো জায়গা মতন ঠিকঠাক দ্যান তো?

দু'কান চেপে জিভ কাটল রাজেশ, —মা কসম। ভেনাস রবারের সঙ্গে আমি বেইমানি করি না স্যার।

কিন্তু আমার কাছে যে একটু অন্য খবর আছে!

কী স্যার?

আপনি নাকি ইন্ডিয়ান রবার প্রোডাক্টসের হয়েও দরবার শুরু করেছেন?

ঝুট, ঝুট। বিলকুল ঝুট। কোন শালা বলেছে নাম বলুন, আমি তার জিভ ছিঁড়ে নেব।

রাজেশের উত্তেজনা বলছে, সে বেশ নার্ভাস। অর্থাৎ তুহিন যে খবরটা পেয়েছে, ভুল নাও হতে পারে। মনে মনে তুহিন স্থির করে ফেলল, রাজেশের ওপর কড়া নজরদারি রাখতে হবে। সান্যাল ব্যাপারগুলোর গন্ধ পায়, ওকেই লেলিয়ে দেবে এবার। পারচেজ-ডিপার্টমেন্ট শুঁকে শুঁকে ঠিক বের করে ফেলবে, কী করে ইন্ডিয়ান রবার প্রোডাক্টস আগের লটে দু'গুণ অর্ডার পেল।

মুখের হাসি অবশ্য নিবতে দেয়নি তুহিন। হাসিটা আরও বাড়িয়ে বলে উঠল,— আরে, চটেন কেন? পুরনো ইয়ারদোস্তের সঙ্গে মশকরা করতে পারব না?

তাই বলুন। রাজেশ শান্ত হয়েছে। তবু একটু ভার মুখে বলল,— জানেন তো স্যার, বিসওয়াসটাই দুনিয়ায় সবচেয়ে দামি চিজ।

হুম।...কিন্তু মেলে কোথায়?

এও আপনি সহি বাত বলেছেন। ...দেখুন না, ভাইটাকে পড়িয়ে লিখিয়ে মানুষ করলাম... আমার বিজনেসেও লাগিয়েছিলাম... বহুত রুপিয়া চোট দিয়ে ভেগে গেল।

কে? দীপেশ? সে আর আপনার সঙ্গে নেই?

আর বোলেন কেন! রাঁচিতে অলগ্ ধান্দা শুরু করেছে। ট্রান্সপোর্টের। চার চারখানা ট্রাক কিনে ফেলল। শুনছি এবার হোটেল বানাবে।

ভাই যে কী চিড়িয়া হয়, তা কি তুহিন জানে না! প্রায় দোরে দোরে ফেরিওয়ালার চাকরি করে তুষারকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছিল তুহিন। ভাইয়ের অবশ্য মাথাও ছিল। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বনে মহেশতলার এক কারখানায় চাকরি করল কিছুদিন। সেখান থেকে ঢুকে পড়ল ব্যাঙ্কে। টেকনিক্যাল অফিসার। উন্নতির সুবিধে হবে বলে প্রথম সুযোগেই বদলি নিয়ে

চলে গেল দিল্লি। বিয়ে-থা করল, মেয়ে এখন ক্লাস টেন, কালকাজিতে সুন্দর সাজানো গোছানো সংসার। কিন্তু তুহিনের কাছে একান্তই অর্থহীন।

কথাটা মনে পড়লেই তুহিনের বুকটা চিনচিন করে। মা'র অসুখের সময়ে তুষার এসেছিল কলকাতায়। তখনই তুহিনের অফিস ডুবছে। দোলাকে পুরোটা না জানাক, ভাইকে তুহিন খুলে বলেছিল প্রকৃত অবস্থাটা। ঠাট্টার সুরে বলেছিল, এরপর বোধহয় তোর ঘাড়ে গিয়েই চাপতে হবে রে! সদলবলে দিল্লি পাড়ি দিলে কেমন হয়! তোর ওখানেই নয় ডেরা বেঁধে নতুন কাজের ধান্দা করব!

শুনেই তুষারের মুখ শুকিয়ে আমসি।

না, আর কোনও ছবি মনে পড়ে না তুহিনের। ছোটবেলার কোনও স্মৃতিও না। শুধু ভাইয়ের ওই মুখটা...! ক্ষণিকের ওই পাংশু মুখটি তুহিনকে বুঝিয়ে দিয়েছে, বিপদের দিনে তুষার তার পাশে নেই। যতই সে নিখুঁত সময়ে বিজয়ার প্রণাম জানাক, মাসে দু'-চার বার ফোন করুক, কিংবা বছরে দু'বছরে ঘুরে যাক কলকাতা...। সবই তো ওপর ওপর, নয় কি? হাজার মাইল দূরে থাকে ভাই, এটা বড় কথা নয়। মন থেকে সে লক্ষ মাইল সরে গেছে।

তুহিন এক ঢোকে গ্লাস শেষ করল। ঈষৎ জড়ানো গলায় বলল,— দুঃখ করবেন না, দুবেজি। প্রার্থনা করুন, সে যেন সুখে থাকে।

তাই তো করি স্যার। দুনিয়ার সব্বাই হ্যাপি থাকুক, রাজেশের স্বরেও সামান্য দুলুনি,— আপনারাও দেখুন আমি যেন ভাল থাকি। বেশি নয়, ওই হাফ পারসেন্ট।

ভবি তো ভোলবার নয়! তুহিন নিজেই অনেকটা সুরা ঢালল গ্লাসে। অল্প জল মেশাল। গ্লাস হাতে হেলান দিয়েছে দোলচেয়ারে। জিজ্ঞেস করল,— আপনার ছেলের কী খবর?

ঠিকঠাক। কলেজে পড়ছে। দিল্লাগি করছে। মোটরবাইক নিয়ে টাউনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

ওকে আপনার বিজনেসে আনবেন না?

দেখি। আগে শাদিবিয়াটা দিই।

এখনই?

টোয়েন্টি ওয়ান হয়ে গেছে স্যার। অনেক সম্বন্ধ আসছে। তবে আমি ঠিক করেছি এমন ঘরে দেব, যেখানে একটাই মেয়ে, বাপের ভি বিজনেস আছে। দুটো বেওসা জুড়ে যাবে, ছেলের ফিউচার ভি ফার্স্ট ক্লাস।

এমন সরল পদ্ধতি যদি তিতানের জন্য ভাবা যেত! কী যে করল ছেলেটা! স্কুল মাস্টারিতে আজকাল পার্টির লোক নাকি নিচ্ছে খুব, ওই লাইনটাই বোধহয় ওর কপালে নাচছে। কমার্সে না দিয়ে ওকে বাংলা, ইতিহাস পড়ালে কি ভাল হত? তিয়ার মতো ড্যাশি পুশি নয় তিতান, পার্টির ফেস্টুন ধরে থেকে হয়তো বুদ্ধিমানের কাজই করছে। তবে ও যা ছেলে, ভরসা হয় না। হয়তো সাঙ্গোপাঙ্গরাই এগিয়ে গেল, ও লাঠি হাতে পড়ে রইল! কত ভাল একটা টিউটোরিয়ালে দেওয়া হয়েছিল, ওখানকার বন্ধুরা তো সব স্টার লেটার নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা জায়গায় পড়ছে, আর তিতান...!

আসলে ওর ভিতটাই কাঁচা রয়ে গেছে। তুহিন নিজে যদি ছেলেকে নিয়ে একটু বসতে পারত! এত চাপ, এত কাজ, এত ঘোরা তখন। দোলা তো বোধহয় প্রতিজ্ঞাই করে ফেলেছিল, ছেলেমেয়ের পড়াশুনো নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না। নাটক নিয়ে তুহিন ধেইধেই নাচতে দেয়নি তো, তার প্রতিশোধ। নাটকের টানে ছুটত? না অংশুদার? এত কীসের উচ্ছ্বাস ওই লোকটাকে নিয়ে? বিছানায় বরের কাছে এলে তুমি কাঠের মতো পড়ে থাকো, অথচ অংশু রায়ের নামে তোমার চোখ জ্বলজ্বল কেন?

রাজেশ ঘড়ি দেখছে। বলল,— আজ উঠি স্যার। একটা অন্য জায়গায় যেতে হবে।

তুহিন হাত ওঠাল,— যাবেন? যান।

কাল বিকেলে আমার গাড়ি আপনাকে স্টেশনে ছেড়ে আসবে।

ঠিক হ্যায়। থ্যাঙ্কস।

আমার ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবেন স্যার। রাজেশ দরজায় গিয়েও দাঁড়িয়েছে,— ওই হাফ পারসেন্ট।

হাহ্, ওই হাফ পারসেন্ট নিয়েই তো দুনিয়ায় যত গোলমাল। দোলার কাছে ওই বাড়তি আধ পারসেন্ট যদি পেত তুহিন!

গ্লাসে তরল টলটল করছে। তুহিন চুমুক দিল। স্খলিত হাতে। শিথিল ঠোঁটে। অসাড় জিহ্বায়। আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল, আমি সব বুঝি দোলা, সব বুঝি। একটা ইশ্‌ক-মহব্বত তোমাদের ছিল। এখনও হয়তো আছে। তুহিন তো বাড়িতে পাহারা বসায়নি! হয়তো এখনও দুপুরবেলায়...

তুহিনের ঢুলুঢুলু চোখ স্পষ্ট দেখতে পেল তাদের ফ্ল্যাটে বেল বেজেছে, দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল দোলা। ওপারে অংশু। দোলা তাকে টেনে নিল

অন্দরে, বন্ধ করল দরজা। অংশু জড়িয়ে ধরেছে দোলাকে। ঝুঁকল। মিশে যাচ্ছে ঠোঁটে ঠোঁট। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অদ্ভুত চপল বিভঙ্গে ভেঙে পড়েছে দোলা। এখনকার দোলা নয়, দশ বছর আগের দোলা। অংশু রায়কে যে ধরে এনেছিল বাড়িতে। উচ্ছল সেই দোলা অংশুর সঙ্গে শোওয়ার ঘরে এল। বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে দু'জনে। অংশু দু'হাতে খুলছে দোলার আবরণ...

তুহিনের নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। শ্বাস তো নয়, হলকা। দু'কান দিয়ে আগুন ছুটছে। তুহিন টের পেল, শরীর জেগে উঠছে সহসা। ঘোর ঘোর নেশা ছিঁড়ে খানখান। এক্ষুনি একটা মেয়েমানুষ চাই। এক্ষুনি।

দোলচেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল তুহিন। ঈষৎ বেপথু পা চলেছে সুইচবোর্ডের দিকে। কলিংবেল টিপল। টিপেই আছে।

সনাতন দৌড়ে এসেছে,— খানা আনব স্যার?

চোপ। তর্জনী ওঠাল তুহিন,— যা, মেয়েটাকে ডেকে আন।

কোন মেয়েটা স্যার?

ওই যে, কী যেন নাম? আগের বার যেটা এসেছিল। দুগ্‌গা...লক্ষ্মী...সরস্বতী...! যা যা, জলদি যা।

পাঁচ

কলেজ ক্যান্টিনে গজল্লা চলছিল জোর। গত কালই ভারতীয় ক্রিকেট দলের নাম ঘোষণা হয়েছে। দেশের মাটিতেই খেলা, এবং যথারীতি সৌরভ গাঙ্গুলি বাদ। অনেকেই খেপে লাল, চোখা চোখা বাক্যবাণ ছাড়ছে। বিরুদ্ধ মতও পোষণ করে কেউ কেউ, তারাও নীরব নেই।

অনিরুদ্ধ টেবিল ঠুকে বলল,— শুড্‌ডাটাকে ফুটিয়ে দিয়ে ভালই করেছে। যা ব্যাটা, এবার খেলা ছেড়ে মেয়েটাকে নিয়ে বোস। ইংরিজি বাংলা পড়া।

সচিন শুড্‌ডা না? পল্লব গরগর করে উঠল,— দু'-দুটো বাচ্চার বাপ!

তীর্থঙ্কর ভেংচে উঠল,— রাহুল কি কচি খোকা? দুদু খায়?

আবীর বিজ্ঞের সুরে বলল,— বয়স-টয়স কোনও ফ্যাক্টর নয়। বেঙ্গলের বিরুদ্ধে চিরকাল ষড়যন্ত্র চলছে। একা সৌরভ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, চান্স পেয়ে কচাং কেটে দিল।

রাজ্যশ্রী চশমা ঠিক করতে করতে বলল,— কিরণ মোরে আর গ্রেগ চ্যাপেল, দুটোকেই সামনে পেলে আমি কান মুলে দিতাম।

গ্রেগ চ্যাপেলের কান অবধি তোর হাত পৌঁছোবে না রে। ওই বাঁটকুলটাতেই থেমে যা।

আমার মনে হয় স্পনসরারদেরও একটা খেলা আছে। রাহুল যাদের অ্যাড করে, তাদের বোধহয় এখন জোর বেশি। সৌরভকে তারাই নির্ঘাত চেপে দিল।

ওসব বললে তো হবে না। লাস্ট দু'বছরে কী করেছেন মহারাজ? মাল্লু কামানো ছাড়া?

সৌরভের দশ হাজার রানটা কিরণ মোরের দাদু করে গেছে নাকি? বাইশটা ওয়ান ডে সেঞ্চুরি করে এখন বসে বসে মাঠের ঘাস ছিঁড়বে?

হচ্ছে, সব হচ্ছে। বস যে-দিন মাঠে ফিরবে, সুদে আসলে সব শোধ করে দেবে।

তিতানও বসে আছে দঙ্গলে। সৌরভ টিমে না থাকায় সেও ব্যথিত। তবে মন্তব্য করছিল না কোনও। সে ব্যস্ত অন্য কাজে। টেবিলের উলটো কোণে বসে আছে শ্রেয়া, তার সঙ্গে চোখে চোখে খেলা চলছিল তিতানের। শ্রেয়ার ইশারা, তিতান উঠে পড়ুক। তিতান বলছে, আর একটু বসতে। শ্রেয়ার চোখে অসহিষ্ণু ভাব, তিতানের চোখে অনুনয়...।

গুলতানির মাঝে হঠাৎই শ্রেয়া বলে উঠল,— এই সায়র, তুই টিউটোরিয়ালে যাবি না?

তিতান চমকে ঘড়ি দেখল। আশ্বস্তও হয়েছে পরক্ষণে। সবে সওয়া তিনটে, টিউটোরিয়াল ক্লাস সাড়ে চারটেয়। তবু কী ভেবে সে উঠেই পড়ল।

ওমনি দশ-বারো জোড়া চোখ একসঙ্গে ঘুরেছে।

পল্লব বলল,— কী রে, যুগলে কাটছিস?

শ্রেয়া ভ্রূভঙ্গি করল,— সায়র আমায় একটু এগিয়ে দেবে।

দীপাবলি বলল,— কেন, তুই একা একা বাস্টস্টপ অবধি যেতে পারিস না বুঝি?

আমার খুব ভয় রে। শ্রেয়ার অঙ্গে হাসির হিল্লোল বয়ে গেল,— মোড়ের পানওয়ালা ছেলেটা আমার দিকে এমন ভাবে তাকায়!

নেকু। অনিরুদ্ধ হাত তুলল,— মারব এক ঝাপড়।

খিলখিল হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শ্রেয়া। তিতানও। শ্রেয়ার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের আড় কেটেছে অনেকটা। টের পেয়েছে, শ্রেয়া তার সঙ্গ সত্যিই ভালবাসে। তিতানেরও মন্দ লাগে না। করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্বচ্ছন্দ গলায় শ্রেয়াকে জিজ্ঞেস করল,— তুই কি এখন বাড়ি?

জেনে কী করবি! তুই তো ওখানে ফেবিকল হয়ে সেঁটে ছিলি।

গ্রুপ থেকে দুমদাম ওঠা যায় নাকি?

তুই একটা কেবলুশ। আমি কেমন তোকে বার করে আনলাম! ...যাক গে, হাতে সময় আছে?

ওই যে... টিউটোরিয়াল। তাও ধর, আরও ঘণ্টাখানেক তো...

তুত্, এক ঘণ্টায় কী হয়? ভাবছিলাম...। শ্রেয়া ভাবনাটা অবশ্য প্রকাশ করল না। ঘাড় হেলিয়ে তিতানের মুখটা দেখতে দেখতে বলল,— তুই কিন্তু অল্প দাড়ি রাখতে পারিস।

কেন?

তা হলে তোকে বেশ ম্যাচো লাগত। ঝক্কাস।

এরকম একটা ধারণা তিতানেরও আছে। দাড়ি রাখলে গালফোলা ভাবটা চাপা পড়ে। টুয়েলভে পড়ার সময়ে টিউটোরিয়ালের গৈরিকাও বলেছিল কথাটা। সেই মতো বেশ কিছু দিন গালে রেজার ঘষা বন্ধ করেছিল। ওফ্ কী কুটকুট করে, বাপ্স! দিদিটাও এমন আওয়াজ মারল...! আবার কি শুরু করবে?

তিতান কায়দা করে বলল,— আমাকে ম্যাচো লেগে তোর লাভ?

তুই বুঝি সব কিছুতে লাভলোকসান হিসেব করিস?

না করলে চলে? দুনিয়াটাই তো এখন হিসেবের।

তাই বুঝি? শ্রেয়া ফের ঘাড় হেলাল,— এখন কী হিসেব করে আমার সঙ্গে বেরোলি?

প্রশ্নটা সরলও বটে। জটিলও বটে। কোন জবাবটা লাগসই হবে ঠাহর করতে পারল না তিতান। কয়েক মিনিটের ভাললাগাকে কি হিসেবের খাতায় ফেলা যায়? ক্রেডিটটা নয় বোঝা গেল, ডেবিটটা কী?

শ্রেয়া উত্তরের অপেক্ষায় নেই। কলকল করছে,— এই জানিস, নম্রতা খুব জেলাস হয়ে পড়েছে।

কিউ?

কচি খোকা! বোঝো না? তুই আমার সঙ্গে ঘুরছিস, তাই।

নম্রতা? তোদের সাইকোলজির মেয়ে?

জেনে কী করবি? ওর পেছনেও লাইন লাগাবি?

আমি কি তোর সঙ্গে লাইন করছি নাকি?

তা ছাড়া কী? শ্রেয়া কটাক্ষ হানল,— এন-ডির ক্লাসের সময়ে জানলা দিয়ে ঝাড়ি মারছিলি কেন?

জাস্ট করিডর দিয়ে যাচ্ছিলাম...

টুপি মেরো না। ছেলেদের চোখ আমি খুব চিনি। তবে একটা কথা কিন্তু বলে দিচ্ছি সায়র, আর কোনও মেয়ের দিকে তাকালে ড্যাবাড্যাবা চোখ দুটো আমি গেলে দেব।

যাহ্ বাবা, কলেজে এসে অন্ধ হয়ে থাকব নাকি? তিতান কবিত্ব করার চেষ্টা করল, —এত ফুল ফুটেছে চার দিকে, তাকিয়ে দেখব না?

না। একদম না। তিতানের কোমরে একটা চিমটি কাটল শ্রেয়া,— খুব ফুলে ফুলে মধু খাওয়ার শখ, অ্যাঁ?

ফুলের তো জন্মই হয়েছে মধু বিতরণের জন্য।

আমায় রাগাস না বলছি। ভাল হবে না কিন্তু। কখন যে কলেজের গেট পেরিয়ে মোড়ে চলে এসেছে, খেয়ালই নেই দু'জনের। আচমকা শ্রেয়া বলে উঠল,— ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ, তাকাচ্ছে!

হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরে যাওয়ায় তিতান সেকেন্ডের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা। পরক্ষণে দৃষ্টি গেছে পানের দোকানে। বছর পঁচিশের লুঙ্গি-গেঞ্জি ছেলেটা মাথা নিচু করে একমনে পান সাজছে।

তিতান অবাক হয়ে বলল,— দেখছে কোথায়? ও তো কাজ করছে!

চোখ উঠছে নামছে। তুই বুঝতে পারবি না। গিয়ে সিগারেট কেন, তা হলে প্রমাণ হয়ে যাবে।

ফালতু সিগারেট কিনব কেন? আমি তো খাই না।

একদম না?

একদম না।

জীবনে খাসনি?

নেভার। তিতান গর্বের সুরে বলল,— আই হেট স্মোকিং।

হঠাৎই হাসিতে ভেঙে পড়ল শ্রেয়া। প্রথমে দোপাট্টা চেপে, তারপর শরীর কাঁপিয়ে, রীতিমতো শব্দ করে।

তিতান গোমড়া হল,— হাসির কী আছে?

হিহি। তুই জীবনে একটাও সিগারেট খাসনি? হিহি। আমি ভাবতেই পারি না।

তুই যেন অনেক খেয়েছিস?

কঅঅত। এখনও তো খাই। জানিস, আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে ছিল ... ধৃতি...। উঁহুঁ, চোখ বড় বড় করে কৌতূহল দেখাস না। তুই ধৃতির নাগাল পাবি না। এখন কানপুর আই-আই-টিতে ফিজিক্স নিয়ে পড়ছে। আমরা দু'জনে ছাদে গিয়ে...। এখন তো ধৃতি প্রায় চেন স্মোকার। হস্টেলে থাকে তো, বিন্দাস লাইফ...।

তুই বাড়িতে সিগারেট খাস?

কম। লুকিয়ে-চুরিয়ে। মা বাড়ি থাকলে টের পায়। বাথরুম থেকে বেরোলে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে। আর নাক কুঁচকোয়। বাপি জিন্দেগিতে বুঝবে না, হেভি স্মোক করে তো। বাথরুমে তো বিড়ি নিয়ে ঢোকে। বলে, ছোটবেলার অভ্যেস, বিড়ি না টানলে নাকি পটি হয় না। হিহি। হিহি।

তুই কিনিস কী করে? দোকানে গিয়ে স্ট্রেট চাস?

নয় তো কী! তবে পাড়ায় না, বেপাড়ায়। পাশের লোকজন একটু চোখ বেঁকিয়ে তাকায়... কিন্তু তাতে আমার কলা! তোরা খেলে দোষ নেই, আমরা টানলে পাপ? মা-ও কোয়েশ্চেন করলে সোজা বলে দেব, আগে তোমার বরের ফোঁকাটা ছাড়াও। বললেই চুপসে যাবে। হিহি হিহি।

হরেক রকম বকবকানি চলছে তো চলছেই। অর্থহীন আবোল তাবোল কুজন, যা শুধু এই উনিশ-কুড়ি বছরেই সম্ভব। এই কুজন হয়তো কোথাও গিয়ে পৌঁছোবে না শেষ পর্যন্ত, তবু এইটুকুতেই বড় সুখ।

আধ ঘণ্টাটাক পরে বাসে উঠে গেল শ্রেয়া। যাওয়ার আগে একটুখানি হাতের ছোঁয়া দিয়ে গেল তিতানকে। জানলায় বসে আঙুল নাড়ছে।

তিতানের বিকেলটা ঝপ করে ফাঁকা। শ্রেয়ার স্পর্শটুকু নিয়ে হাঁটছে ধীর পায়ে। খিদে পাচ্ছিল অল্প অল্প, একটা স্টেশনারি দোকানে দাঁড়িয়ে টিফিনকেক কিনল একটা। দোকানে দাঁড়িয়েই প্যাকেটখানা ছিঁড়ল। খাচ্ছে।

সহসা ঘাড়ে হাত। চমকে তাকাল তিতান। শ্রীমন্ত আর অমিত। শ্রীমন্ত ভুরু কুঁচকে বলল,— এখানে দাঁড়িয়ে কেক সাঁটাচ্ছিস? এদিকে আমরা তোকে কলেজে খুঁজে খুঁজে হাল্লাক হয়ে গেলাম!

কেকের শেষ অংশটুকু মুখে পুরে তিতান জিজ্ঞেস করল,— কেন শ্রীমন্তদা?

পরশু আমাদের শিল্পায়ন নিয়ে জাঠা বেরোবে, খেয়াল আছে?

হ্যাঁ, জানি তো। পরশু আসব তো।

তার আগে প্রস্তুতি নেই? সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যারে ছাত্রদের রাজ্য স্তরে সমাবেশ, সেখানে আমাদের কলেজ থেকে শুধু দশ-বারো জন মুখ দেখালেই চলবে?

না। স্টুডেন্টদেরও নিয়ে যেতে হবে।

সে তো একটা পার্ট। হেড-কাউন্ট বাড়ানোর জন্যে কলেজ গেট সাড়ে বারোটায় ক্লোজ করে দেব। কেউ যেন কাট না মারতে পারে।

তাতেও গুনতি খুব বাড়বে কি? সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস ডিসলভ্ হয়ে গেছে, থার্ড ইয়ার তো প্রায় আসেই না...

অতএব ফার্স্ট ইয়ারকে ছাড়া নেই। অ্যাট লিস্ট হানড্রেড হেড না হলে আমাদের কিন্তু প্রেস্টিজ পাংচার।

ফটক আটকে ছেলেমেয়েদের গোরু ছাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াটা কেমন যেন লাগে তিতানের। তবু বলল,— ঘাবড়াচ্ছ কেন? আশি-একশো জন কোনও ব্যাপার নয়।

হলেই ভাল। অমিত ঘাড় নাড়ল,— এ ছাড়াও তো কাজ আছে। ফেস্টুন রেডি করা, প্ল্যাকার্ড লেখা, ট্যাবলো বানানো...

আমার হাতের লেখাটা কিন্তু ভাল নয় অমিতদা।

জানি, জানি। তোর অন্য কাজ। চল চল, পার্টি অফিসে চল।

এখন? তিতান কবজি উলটে ঘড়ি দেখল,— আমার যে টিউটোরিয়াল ক্লাস আছে... এক্ষুনি...

একদিন টিউটোরিয়ালে না গেলে কিচ্ছু লস হয় না। তিতানের কাঁধ ধরে টানল শ্রীমন্ত, টিউটোরিয়ালের চেয়ে শিল্পায়ন অনেক বেশি জরুরি। তোর আমার ফিউচারের জন্যই তো শিল্পায়ন।

এটুকু বোঝার জন্য শ্রীমন্ত-অমিতের জ্ঞান না খেলেও চলবে তিতানের। কিন্তু পড়াশুনো না করলে, রেজাল্ট একটু ওপর দিকে না থাকলে, নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি জুটবে কোথথেকে?

তিতান গলা ঝেড়ে বলল,— আজ আমায় ছেড়ে দাও প্লিজ। কাল হোল-ডে জান লড়িয়ে দেব। ওয়াদা। নিজের হাতে ফেস্টুন-টেস্টুনগুলো...

কাল হচ্ছে কাল। আজকের দিনটা, আজকের দিন। আজ পল্টুদা থাকবে ওখানে, আমাদের স্টুডেন্ট ফ্রন্টের ডিস্ট্রিক্ট কমিটির দু'জন ওয়েট করছে...। মিছিলের ব্যাপারে থরো গাইড লাইন দেবে। বরুণদা তোকে অতি অবশ্য নিয়ে যেতে বলেছে।

অত এক্সপ্লেন করার কী আছে? অমিত হঠাৎ অসহিষ্ণু,— যেতে হবে, মানে যেতে হবে, ব্যস। কেউ কি জানে না, একটা র‍্যালি অর্গানাইজ করা কত বড় দায়িত্বের কাজ!

প্রতিবাদের আর কোনও সুযোগই নেই। দুই কমরেডের বগলদাবা হয়ে চলল তিতান। কিন্তু মন থেকে যেন সায় পাচ্ছে না তেমন। এবার ট্যুর থেকে ফিরে বাবা হঠাৎ তিতানের লেখাপড়ার হালহকিকত জানতে চাইছিল। দু-চার মিনিটের বাতচিতে কী বুঝল কে জানে, টিউটোরিয়ালে ভরতি হওয়ার হুকুম জারি হল তৎক্ষণাৎ। সেই টিউটোরিয়ালে আজ সবে তৃতীয় দিন, এর মধ্যেই কামাই! প্রচুর টাকা নিচ্ছে নেভিগেটার। সপ্তাহে দু'দিন, চারটে সাবজেক্ট, মাসে দু'হাজার। একদিন ডুব মানে নিট আড়াইশো টাকা জলে। বাবা জানলে তুলকালাম করবে। তা ছাড়া সত্যিই আজ যাওয়াটা বিশেষ দরকার ছিল। বিজনেস ইকনমিক্সের ক্লাস ছিল আজ, ট্রায়াল ব্যালেন্সও শুরু করার কথা...। পরীক্ষার আর তিন মাসও নেই, কী যে হবে!

হঠাৎ পল্লবকে মনে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে তিতান জিজ্ঞেস করল,— পল্লব এল না?

পল্লব এখন ইউনিয়ন রুমে। বরুণদাকে হেলপ করছে।

যাক, ও ব্যাটাও তা হলে পালাতে পারেনি! মনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেল তিতান। তবে পল্লব যা ঘুঘু, সিগারেট কেনার নাম করে বেরিয়ে হাওয়া মারবে হয়তো! এবং কাল এসে এমন একটা ঢপ ঝাড়বে...!

পার্টি অফিস মিনিট দশেকের রাস্তা। মেন রোড থেকে একটা গলি ঢুকেছে ডাইনে, খানিক গিয়ে গলি চওড়া হয়েছে অনেকটা, সেখানে। দোতলা বাড়িটার সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছ। সম্ভবত লাল ফুল ফুটবে বলেই লাগানো হয়েছিল। তবে গাছটা বড় হয়ে সামান্য বেইমানি করেছে। ফুল ফুটছে বটে, কিন্তু রং কেমন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে, কমলা কমলা।

অফিসটায় মাত্র একদিন এসেছে তিতান। বরুণের সঙ্গে। সে-দিনের মতোই দোতলায় গেল তিতানরা। মাঝারি ঘরটায় পল্টু বসে, সঙ্গে আরও

সাত-আটজন। তিতান অবাক হয়ে দেখল, শ্রীমন্ত অমিতকে নয়, তাকেই হাত তুলে অভ্যর্থনা জানাল পল্টু বিশ্বাস।

এসো, এসো সায়র। এত দেরি করলে কেন তোমরা?

তিতানের মরচে পড়া ভাবটা কেটে গেল। সে কলেজের জি-এস নয়, নতুন ইউনিয়নে অমিতই এবার সাধারণ সম্পাদক। অথচ তাকে গুরুত্ব না দিয়ে, প্রশ্নটা সায়রকেই...!

তিতান জবাব দেওয়ার আগে অমিত বলল,— ওকে খুঁজতে গিয়েই তো...। টিউটোরিয়ালে চলে যাচ্ছিল...

তাই নাকি? কোথায় পড়ছ?

নেভিগেটার। গাঙ্গুলিবাগানে।

ও, দেবাশিসের কারখানায়? মধ্যবয়সি পল্টু বিশ্বাসের ঠোঁটে স্মিত হাসি,— ওরা নাকি ভাল নোটফোট দেয়?

আমি সদ্য অ্যাডমিশন নিয়েছি। ঠিক জানি না। তবে শুনেছি...

ভাল। খুব ভাল। তবে আমার অ্যাডভাইস যদি শোনো... শুধু টিউটোরিয়ালের ভরসায় থেকো না, নিজেও বাড়িতে পড়াশুনো কোরো। চোখ থেকে হাই-মাইনাস পাওয়ার চশমা খুলল পল্টু বিশ্বাস। পাঞ্জাবির খুঁটে কাচ মুছতে মুছতে বলল,— তোমাকে আরও কয়েকটা কথা বলি। মন দিয়ে শোনো। এক্ষুনি রুটিন ডিসকাশন স্টার্ট হয়ে যাবে, তখন হয়তো আর খেয়াল থাকবে না...। শ্রীমন্ত অমিত সবাই আছে, তাদের সামনেই বলছি, তোমার মধ্যে কিন্তু একটা স্পার্ক আছে। আলাদা একটা চার্ম আছে। আমি খবর পেয়েছি, স্টুডেন্টদের মধ্যে তোমার একটা পজেটিভ ইমেজ আছে। ছেলেমেয়েরা তোমায় পছন্দ করে। তোমার এই কোয়ালিটিটা কাজে লাগাতে চাই বলেই তোমাকে এবার জি-এস করা হয়নি। করলে তুমি একটা কলেজেই আটকে যেতে। তোমাকে আমরা আরও বড় ফিল্ডে আনতে চাই।

তিতানের কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। ফ্যালফ্যাল মুখে বলল,— বড় ফিল্ড মানে?

তোমাকে ওভার অল স্টুডেন্ট ফ্রন্টে চলে আসতে হবে। মানে সামগ্রিক ছাত্র সংগঠনের কাজ করতে হবে তোমাকে। কী হে, পারবে না?

তিতান ঢোক গিলে বলল,— কী কাজ?

সে আছে অনেক। জানতে পারবে আস্তে আস্তে। ... আরও একটা ব্যাপার তোমায় বলি। দিনকাল তো বদলেছে, এখন নিঃস্বার্থ ভাবে কাউকে কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলাটা বোধহয় আর শোভা পায় না। এটা বাজার-অর্থনীতির যুগ। ফরচুনেটলি অর আনফরচুনেটলি আমরাও তার বাইরে থাকতে পারছি না এখন। নীতি আদর্শ নিশ্চয়ই থাকবে, নিজের নিজের জায়গায়। এবং আমাদেরও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। ঠিক কি না?

তিতান ঢক করে ঘাড় নেড়ে দিল,— হ্যাঁ, সে তো বটেই।

তাই বলছিলাম... পড়াশুনো করো, পড়াশুনোটা মাস্ট। তবে একই সঙ্গে পার্টির কাজ করাটাও মাস্ট। পড়াশুনোর পিছনে সময় দিলে পড়াশুনো যেমন ফল দেয়, পার্টির জন্য টাইম দিলে পার্টিও তোমায় রিটার্ন দেবে। বলতে পারো, এটা এক ধরনের গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। ... পরীক্ষা টরিক্ষা নিয়ে ভেবো না, দরকার হলে সে দায়িত্ব আমরা নেব। ইউ গিভ ইয়োর বেস্ট টু দা পার্টি। অ্যান্ড পার্টি উইল সি, কীসে তোমার ভাল হয়। কী বললাম, বুঝতে পারলে?

দুর্বোধ্য কিছু বলেনি পল্টু বিশ্বাস। তিতানের মনোবাসনা আর পল্টু বিশ্বাসের আশ্বাসবাণী কি খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে না? তবু তিতানের কেন যে গলা শুকিয়ে আসে?

জিভ বুলিয়ে তিতান ভিজোল তালুটা। মৃদু স্বরে বলল,— আমি আমার আপ্রাণ করব পল্টুদা।

গুড। পার্টির ক্লাসটাস হলে খবর পাঠাব, চলে এসো। বলেই পল্টু বাকিদের দিকে ফিরেছে,— আর কী, এবার তা হলে শুরু করা যাক।

পরশুর মিছিল আর সমাবেশ নিয়ে চলছে আলোচনা। ঠিক করা হচ্ছে কলেজ থেকে রওনা দেওয়ার সময়, পথ, স্লোগান, ব্যানারের ভাষা...। শ্রীমন্ত, অমিত আর জেলা ছাত্রনেতারাই বলছে বেশি। তবে পল্টুদা কোনও পরামর্শ দিলে তা নির্দেশের মতো ঢুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে কর্মসূচিতে।

এই ধরনের নীরস কচকচিতে তিতানের হাই ওঠার কথা। কিন্তু আজ সে হঠাৎ আগ্রহভরে শুনছিল। বুঝি বা একটু উদ্দীপিতই বোধ করছে যেন। খুচরো-খাচরা দু'-একটা মতামতও দিয়ে ফেলল। কী আশ্চর্য, সেগুলো গৃহীতও হল সাদরে। তবে কি সে সত্যিই পার্টির কাছে মূল্যবান?

ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরল তিতান। প্রায় হাওয়ায় উড়তে উড়তে। গুনগুন গান ভাঁজতে ভাঁজতে বসেছে টিভির সামনে।

দোলা জামাকাপড় ইস্ত্রি করছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল,— আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরলি যে? টিউটোরিয়াল হল না?

মিথ্যে বলতে চোখের পাতা কাঁপল না তিতানের। পরিষ্কার স্বরে বলল,— সেখান থেকেই তো আসছি।

কেমন পড়াচ্ছে রে ওরা?

চলতা হ্যায়।

বুঝছিস তো ঠিকঠাক? না বুঝলে জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করছিস তো?

হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। কথা ঘোরাতে তিতান উঠে মা'র নাকটা টিপে দিল,— ভাল করে দুধকফি বানাও তো দেখি। সঙ্গে তোমার হাতের সেই গরম গরম আলুর চপ।

খেতে খেতে খানিকক্ষণ টিভিতে টুকটাক প্রোগ্রাম দেখল তিতান। মা'র সঙ্গে বসে। তারপর চলে গেছে নিজের গলতায়। শার্টপ্যান্ট বদলে বইপত্র নিয়ে বসেছে। ধুস, মন লাগছে না। পল্টুদা যা বলল, তাই যদি হয়...! পার্টির জন্য খাটতে হবে তিতানকে। জোশ লাগিয়ে। জীবনের অভিমুখ বদলে ফেলার দারুণ সুযোগ এসেছে, হেলায় হারানো ঠিক হবে না বোধহয়। পল্লবকে কাল বলবে পল্টুদার গল্পটা? নিশ্চয়ই জোর চমকাবে পল্লব। নাকি জেলাস হয়ে পড়বে? তবু বলতে তো হবেই। অমিতদা শ্রীমন্তদাদের মুখ থেকে শুনলে বরং আহত হতে পারে পল্লব। হয়তো ভাববে, সায়র তাকে চেপে যাচ্ছে...!

আর শ্রেয়াকে জানালে? হিহি হাসবে? আওয়াজ মারবে? ওফ, মেয়েটা কিচিরমিচির করতে পারেও বটে। ঠিক যেন চড়ুইপাখি। উঁহুঁ, মুনিয়া। ডানায় কত রং মেয়েটার, চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। শ্রেয়া কি সত্যিই তার প্রেমে পড়েছে? নাকি খেলছে তাকে নিয়ে? আহা রে, খেলাটা যেন না থামে!

বুকের ওপর অর্থনীতির বই। তিতানের চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে।

ছয়

কফি-বার অফিস থেকে বড়জোর একশো মিটার। তবু ওইটুকু পথ হনহনিয়ে পেরোতে তিয়া হাঁপিয়ে টাপিয়ে একসা। হুড়মুড়িয়ে কাচের পাল্লা ঠেলে দেখতে পেল, সূর্য বসে আছে পরিচিত কোণটায়। সামনে, কাচের টেবিলে, প্লেট-ভরতি কাবাব। পাশের চেয়ারে হেলমেট।

রট আয়রনের চেয়ার টানতে টানতে তিয়া অপ্রস্তুত মুখে বলল,— সরি, সরি। অনেকক্ষণ ওয়েট করিয়ে রেখেছি, না?

জবাব দেওয়ার উপায় নেই সূর্যর। কানে মোবাইল, স্বরে কেজো ব্যস্ততা। ফোনে কথা চালাতে চালাতেই আঙুল দেখাল প্লেটে। ইশারায় তুলতে বলছে।

কাবাবের দিকে হাত বাড়াল না তিয়া। টেবিলে এক গ্লাস জল, ঢকঢক খেল আগে। আহ্, তেষ্টা জুড়োল যেন। রুমালে মুছছে ঠোঁট। মোবাইলে এস-এম-এস এল একটা, দেখল বোতাম টিপে। তুত্, ফালতু। কী এক স্কিম দিচ্ছে মোবাইল কোম্পানি, এত টাকার রিচার্জ করালে এত টাকা বাড়তি টকটাইম...। এই নিয়ে বোধহয় বার আষ্টেক পাঠাল বার্তাটি। জ্বালা, না জ্বালা!

সূর্য এক দফা কথা শেষ করে আবার যেন কাকে ফোনে ধরছে। ফের ডায়ালগ শুরু। কাকে যেন বলছে, ও এখন বারাসতে! বাহা রে টেকনোলজি, গুল মারার কত সুবিধে! মুচকি হেসে তিয়া ব্যাগ থেকে আয়না বার করে দেখল নিজেকে। এহ্, মুখটার কী দশা! এমন এস-এম-এসের বন্যা ছোটাচ্ছিল সূর্য, টয়লেটে যাওয়ার আর সময় পায়নি। আবার ব্যাগে হাত চালিয়ে সুগন্ধী টিস্যু পেপার তুলেছে তিয়া। ঘষে ঘষে সাফ করল মুখখানা। ইস, কী নোংরাই না বেরোল। উঠে ওয়েস্ট-বিনে ফেলে এল টিস্যুটা। এবার ওষ্ঠরঞ্জনের পালা। ঠোঁটে ন্যাচারাল শাইন বোলাতে বোলাতে দেখছে চার দিক।

শনিবারের সন্ধে। কফি-বার টইটুম্বুর। অল্পবয়সিদেরই ভিড় বেশি। দু'-চার জন অফিস ফেরতা মধ্যবয়সিও আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, ছিমছাম সাজানো, সুরাহীন পানশালায় দুলছে একটা গুনগুন ধ্বনি। হট কফি, কোল্ড কফি, আর টুকটাক মুখরোচক খাদ্যের সুবাস বাতাসে। উজ্জ্বল আলোয় যেন ঝলমল করছে জায়গাটা।

সূর্যর আলাপচারিতা শেষ। মোবাইল পকেটে পুরে হাতে হাত ঘষল। একমাথা ঝাঁকড়া চুলে আঙুল বুলিয়ে বলল,— খুব ভোগালে যা হোক।

তিয়া বলল,— বিশ্বাস করো, আমি সেই কখন থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছি... এমন কাস্টমার আসছে...

বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারল না তিয়া। এবার তার মোবাইল সুর ধরেছে। তুলে নাম্বারটা দেখেই ভুরুতে মোটা ভাঁজ। সেলস্ ম্যানেজার।

এখন সূর্যর অপেক্ষার পালা। তিয়ার ঠোঁট নড়ছে,— হ্যাঁ অতনুদা, বলুন?

কখন বেরিয়ে গেলে?

এই তো, মিনিট আট-দশ।

বলে গেলে না তো? গেছিলে এলিংটন ইন্ডিয়ায়?

হ্যাঁ। মিট করেছি মিস্টার ঠক্করকে। তবে কাজ হয়নি। আবার মঙ্গলবার যেতে হবে।

তোমার ডেলি রিপোর্টে নেই তো! বলেছি না, প্রত্যেকটি কোয়্যারি সম্পর্কে নোট রাখতে। মিস্টার লাখোটিয়ার ইনশিয়োরেন্সের খোঁজটা নিয়েছ?

এই প্রশ্ন থেকে সেই প্রশ্ন, এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গ। শেষ পর্যন্ত মোদ্দা কথা একটাই দাঁড়াল, মার্চ মাসে ছুটিফুটি ভুলে যাও, কাল অবশ্যই এসো।

তেতো মুখে মোবাইল অফ করল তিয়া। এই রোববারটাও ভোগে। আর পারা যায় না! রবিবার শো-রুম বন্ধ থাকার দিন। কিন্তু সপ্তাহভর সময় পায় না বলে অনেক ক্রেতা এখন রবিবারেই আসতে চায়। মালহোত্রা অটোমোবাইলসও মওকা বুঝে রবিবারটা খোলা রাখা শুরু করেছে। আসছেও বটে লোকজন। সপরিবারে। সদলবলে। এক একটা পার্টি যেন টাকার কুমির। ঝনাত ঝন ক্যাশ চেক ছুড়ে দিয়ে কিনে ফেলছে গাড়ি। মালিকদের কাছে এইসব সানডে-কাস্টমাররা বেজায় মূল্যবান। কিন্তু তিয়াদের যে প্রাণ যায়। ওভারটাইম মেলে বটে, নতুন নতুন উৎসাহ ভাতার খুড়োর কলও ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাকের সামনে। কিন্তু একটা দিন হাত পা ছড়িয়ে সুখ না করতে পারলে ভাল লাগে?

সূর্য ঘাড় গুঁজে কাবাব পুরছে মুখে। চোখ না তুলে বলল,— শেষ হয়েছে? এবার কি একটু শান্তিতে কথা বলতে পারি?

যাহ্, বাবা। তিয়া ভুরু কুঁচকোল,— আমার তো ফোনটা এল। এদিকে বাবু যে লোক ডেকে ডেকে...

আমারটা বিজনেস, বেবি। সারাক্ষণ কনট্যাক্টগুলোকে ঝালিয়ে যেতে হয়। বাট ইউ আর ইন জব। অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছ, ব্যস খতম। জাস্ট দেখে নেবে কলটা কার, তারপর টুকুস কেটে দেবে।

কী অবলীলায় কথাটা বলল সূর্য! অথচ নিজে যত দিন ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করেছে, দিব্যি উলটো গাইত। বোঝোই তো, প্রাইভেট কোম্পানি মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ারস জব! ব্যাবসা করছে বলে কি সূর্য বদলে গেল? নাকি মানুষ নিজের অবস্থান মতো যুক্তি সাজায়?

তিয়া হেসেই বলল,— যাহ্, তা হয় নাকি? কত রকম দরকার থাকে...। শোরুমে এখন বহুত রাশ, টারগেট নিয়ে টপ টু বটম সবার মাথা খারাপ...

কন্ট্রাডিক্টরি কথা বোলো না। এক দিকে বলছ হেভি রাশ, ও দিকে টারগেট...!

সিম্পল্ ম্যাথ্স ইয়ার। বিক্রি বাড়ছে বলে কর্তারাও টারগেটের মিটার চড়াচ্ছে। এখন তো বলছে, তুমি একা কী সেল করলে সেটা বড় কথা নয়। তোমার টিমের পারফরমেন্সটাই আসল। অতএব দীপন ফেল করলে তার গুঁতোটাও...। ভাবো কী রকম টেনশন?

ছাড়ো তো। ভারী একটা গাড়ি বিক্রির চাকরি, তার আবার টেনশন!

মাঝে মাঝেই তিয়ার চাকরি সম্পর্কে এরকম তাচ্ছিল্যের সুর ঠিকরে ওঠে সূর্যর গলায়। সূর্য তার বন্ধু, কিংবা তার চেয়েও বেশি, তবু শুনতে তিয়ার ভাল লাগে না। ওই চাকরিটাকেই অবজ্ঞা? নাকি চাকরিটা তিয়া করছে বলে?

সূর্য ফিকফিক হাসছে,— যাহ্ বাবা, ফিউজ মেরে গেলে কেন? খাও, কাবাব তো রবার হয়ে গেল!

হ্যাঁ, নিই। তিয়া এক টুকরো কাবাবে কাঠি গাঁথল। সহজ স্বরেই জিজ্ঞেস করল,— কতক্ষণ এসেছ?

শুনে আর কী হবে ডার্লিং! শুধু বলতে পারি, তখনও আকাশ থেকে আমি অস্ত যাইনি। মরিয়া হয়ে তোমার শো-রুমের সামনেও একবার ঢুঁ মেরে এলাম।

তাই? কখন? ভেতরে যাওনি কেন?

ভাবলাম, ম্যাডামের ব্যস্ততায় ব্যাঘাত ঘটবে...। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তোমাদের সোনালি খুটখুট করে বেরিয়ে গেল...। সূর্য আর একটা কাবাব তুলেছে,— মেয়েটার চেহারা কেমন রাফ হয়ে গেছে!

হতে বাধ্য। যা ফাস্ট লাইফ লিড করে। রুমাল পালটানোর মতো বয়ফ্রেন্ড চেঞ্জ করছে। হোটেলবাজি, রিসর্টবাজি, যেখানে সেখানে নাইট স্পেন্ড...

বাড়িতে কিছু বলে না?

জানি না। বুঝি না। মিডল ক্লাস ফ্যামিলিরই তো মেয়ে, বাবার ছোটখাটো বিজনেস, মা-ও যেন কী একটা করে... মেয়ের চালচলন দেখে কিছুই কি তারা বোঝে না? তিয়া ঠোঁট উলটোল,— কেরিয়ারের ব্যাপারেও তো কোনও স্ক্রুপল্‌স দেখি না। গাড়ি বেচার জন্য শি ক্যান গো টু এনি এক্সটেন্ট। ক্লায়েন্ট কফি খেতে ডাকল, চলে গেল। একসঙ্গে ড্রিঙ্ক? নো আপত্তি। ডিসকো যেতে চাইছ? আই অ্যাম রেডি।

হুম্‌। খুবই কম্প্রোমাইজিং লেডি।

সে আর বলতে। রিসেন্টলি তো দিল্লি-বেসড্‌ এক কোম্পানির কলকাতার চাঁইকে পাকড়েছে। ওকে নাকি আমাদের ব্যালেরিনা না গছিয়ে ও ছাড়বে না। এগারো লাখের গাড়ি, সোনালির পার্সে হাজার দশেক তো ঢুকবেই।

তুমিও ওরকম দু'-একটা ট্রাই নিতে পারো। ... আমি কিছু মাইন্ড করব না।

হয়তো কৌতুকের ছলে বলা, তবু কথাগুলো কোথায় যেন বিঁধল তিয়াকে। কী ভাবে তাকে সূর্য? কেরিয়ারের জন্য তিয়া কি কখনও ওই স্তরে নামতে পারে? তিয়াকে কি সে চেনে না? জানে না তিয়ার স্বভাব? তা ছাড়া সে কী ভাবে কাজ করবে, না করবে, তা নিয়ে সূর্য মাইন্ড করার কে? সূর্য সম্মতি দিলে সে স্বেচ্ছাচারী হতে পারে? নয়তো নয়?

তিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলল,— থ্যাঙ্কস্‌ ফর দা পারমিশন। যার তার সঙ্গে শুয়ে পড়তে পারি তা হলে?—

যাহ্‌, ফাজলামি কোরো না। সূর্য যেন সামান্য বিব্রত। পরক্ষণেই স্বর স্বাভাবিক,— আজ লান্‌চ করেছিলে?

হুঁ। ধোসা।

ব্যস? ... নিশ্চয়ই ভুখ লেগেছে? আর একটা কিছু বলি?

নাহ্‌। শুধু কোল্ড কফি।

উঠে অর্ডার দিতে গিয়েও সূর্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। কাচের ওপারে চলমান শহরটাকে দেখল দু'-এক পল। মুখ ঝুঁকিয়ে বলল,— শনিবার সন্ধেটা একেবারে নিরামিষ যাবে? কফি খেয়েই কাটাব?

আর কী বাসনা?

চলো না, আজ একটু পাবে যাই। পর পর দুটো শনিবার তো কোথাও যাওয়াই হয়নি।

সে তোমার ফল্ট। তুমি বিজি ছিলে।

কাজ এসে গেলে কী করব বলো? পেটের ধান্দা তো আগে। ... চলো না, ব্লু ভেলভেটে। লাইভ গানা শুনে মাথাটা ফ্রেশ হয়ে যাবে।

আমার টাইম লিমিট কিন্তু ন'টা।

হাফ অ্যান আওয়ার বাড়াও। মেরে খাতির।

অনুনয়ের ভঙ্গি দেখে তিয়া হেসে ফেলল। আঙুল নেড়ে বলল,— পাক্কা সাড়ে ন'টা। তার বেশি নয়।

খুশি খুশি মুখে, মাথা দোলাতে দোলাতে, কাউন্টারের দিকে যাচ্ছে সূর্য। দীর্ঘ সুঠাম চেহারা, দেখতে বেশ লাগে তিয়ার। কাউন্টারে পৌঁছে ফের মোবাইল তুলেছে কানে। কথা বলতে বলতেই পার্স থেকে টাকা বের করছে, কুপন নিচ্ছে, চাকতিটা ধরিয়েও দিল ফুড কাউন্টারে। সত্যিই কি সূর্যর এত ব্যস্ততা থাকে সর্বদা? খানিকটা দিখাওয়া নেই তো? কেন যে তিয়ার হঠাৎ হঠাৎ এরকম মনে হয়?

সূর্য টেবিলে ফেরামাত্র তিয়ার মোবাইল ডাকছে আবার। নম্বরটা দেখে তিয়া অবাক সামান্য, তবে চমকাল না। ভাবলেশহীন গলায় বলল,— হ্যাঁ, বলুন!

থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। ওপারে ইন্দ্রজিতের স্বর কৃতজ্ঞতা ঝরাচ্ছে,— আজ পেমেন্ট করে এলাম। নাম ট্রান্সফারের কাগজপত্র সোমবার মোটর ভেহিকলসে জমা করে দেব।

হ্যাঁ, দেরি করবেন না। ব্লু-বুকটা নিজের নামে করিয়ে নিন। ... এনিওয়ে, আপনার গাড়ি কেনার পর্ব তা হলে চুকল?

আপনারই অনুগ্রহে। আপনি মাঝে না থাকলে মিস্টার মজুমদার কিছুতেই বাহান্ন হাজারে রাজি হতেন না।

হুঁ। ওঁরা আমায় খুব স্নেহ করেন। ... যাক গে, আমার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খেয়াল আছে?

এমা, ছি ছি, আপনি কেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন? উইদাউট ফেল সামনের সপ্তাহে দিয়ে আসব।

ফাইন। নাউ এনজয় দা কার।

আমি কিন্তু এনজয়মেন্টের জন্য গাড়িটা কিনিনি ম্যাডাম। বলেছিলাম না, ওটা আমার ভীষণ দরকার...

তাই না হয় হল। ভীষণ দরকারেই ব্যবহার করুন।

প্রয়োজনটা কী ধরনের জানতে ইচ্ছে করছে না?

ওহ্, ব্যাপক বকে তো! বিরক্তি গোপন করে তিয়া ভদ্রভাবে বলল,— নিশ্চয়ই ইম্পর্ট্যান্ট কিছু।

অবশ্যই। তবে আজ ব্যাপারটা ভাঙছি না। একদিন আপনাকে নিয়ে এসে দেখাব। আপনি কিন্তু আমাকে না বলতে পারবেন না ম্যাডাম।

আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবেখ'ন। এখন ছাড়ি, হ্যাঁ?

মোবাইলের বোতাম টিপে তিয়া বিচিত্র মুখভঙ্গি করল। সূর্য চুপচাপ শুনছিল, ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল,— এবার কোন মক্কেল?

এক আধ-পাগল। ইন্দ্রজিৎ রায়। একটা পুরনো গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছি, তাতেই আহ্লাদে থইথই। গাড়িটা কোন কম্মে ইউজ করবে, সেটা আমায় দেখাতে চায়। আরে তুই মারুতি ভ্যান ভেজে খাবি, না মাথায় নিয়ে ঘুরবি, জেনে আমার কি দুটো এক্সট্রা হাত গজাবে? কমিশনটা ঝেঁপে দিস না, তা হলেই হল।

কত দেবে?

বলব কেন? ট্রেড সিক্রেট। তিয়া টেবিলে আলতো তবলা বাজাল। ভুরু বেঁকিয়ে বলল,— তুমি আমায় বলো? জিজ্ঞেস করলে তো শুনতে হয়, হিসেব কষে দেখতে হবে।

অল রাইট। বোলো না।

বাবুর রাগ হল নাকি?

নাহ্।

এটাও গুস্‌সেওয়ালি বাত্। তিয়া সাবিত্রীর বাচনভঙ্গি নকল করে বলল,— আগ্ করুনি দাদাবাবু। দুঃখু-দুঃখু মুখ নিয়ে ব্লু ভেলভেটে গেলে কি মজা জমবে?

বাইরে এক মোহময়ী সন্ধ্যা। সারাদিন বেশ গরম ছিল আজ, দিব্যি হাওয়া ছেড়েছে এখন। ফাল্গুনী বাতাস, একটু বুঝি এলোমেলো। নাগরিক কোলাহল আছে বটে, তবে এমন সন্ধ্যায় তা আর অসহ লাগে না। পাশে সিগারেটের দোকানে এফ-এমে গান বাজছে। তারা-রম্-পম্-পম্।

সূর্যর গাবদা মোটরবাইক ফুটপাথে দণ্ডায়মান। শিরস্ত্রাণ এঁটে সিটে বসেছে সূর্য। পিছনে তিয়া, দোপাট্টা সামলে। স্টার্ট দিতেই মৃদু ঝাঁকুনি, তিয়া খামচে ধরল সূর্যর কাঁধ। গতি বাড়ছে দ্বিচক্রযানের। তিয়ার হাত নেমে এল সূর্যর

কোমরে। মেদহীন কটিদেশ বেড় দিয়ে ধরেছে। বড্ড জোরে চালায় সূর্য, ধরে না থাকলে গা শিরশির করে।

সূর্য আরও স্পিড তুলেছে। চেঁচিয়ে বলল,— একবার ভিক্টোরিয়া রেড রোডটা চক্কর মেরে আসব?

তিয়াও চিৎকার করল,— কেনওওও?

এমনিই। মস্তি।

দেরি হয়ে যাবে যে!

কতক্ষণই বা আর? দশ মিনিট, পনেরো মিনিট...

এরপর আর হাল না ছেড়ে উপায় কী! ইচ্ছে যখন চেপেছে, সূর্য যাবেই। ছেলেটার মধ্যে কিছু কিছু খেপামি আছে।

ভাগ্যিস আছে খেপামোটা। নইলে তিয়ার সঙ্গে তো আলাপই হত না। প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিটা মনে পড়তেই তিয়া হেসে ফেলল। পার্ট টু পরীক্ষার পর তারা চার বান্ধবী গেছে দিঘায়। হঠাৎ হুজুগ চাপল, শংকরপুরটাও দেখে আসা যাক। গিয়ে তো মুগ্ধ। আহা, কী চমৎকার সমুদ্রসৈকত। বিকেলভর বিস্তর হুটোপুটি, ছবিও তোলা হল পটাপট। তারপর দিঘা ফিরে হোটেলে ঢুকতে গিয়ে মাথায় হাত। মাসতুতো দাদার বহুমূল্য ক্যামেরাটি তিয়া ফেলে এসেছে শংকরপুরে। চায়ের দোকানে। কী হবে? কী করবে? সন্ধে গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তক্ষুনি তক্ষুনি শংকরপুর ছোটা তো সহজ কাজ নয়। সকালে গিয়ে কি আর মিলবে?

তখনই ত্রাণকর্তা রূপে সূর্যর আবির্ভাব। হোটেলের লবিতে হাউমাউ করছিল তিয়ারা, হঠাৎই এসে বলল,— ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমার একটা দু'চাকা আছে। ক্যামেরাটা নিয়ে আসতে পারি।

আশ্চর্য, তিয়ারা তখন সূর্যকে চেনেও না, আগে দেখেওনি। অবাক হয়ে বলল,— আপনি...?

এখানেই উঠেছি। আপনাদের প্রবলেমটা ওভারহিয়ার করলাম। ..। একাই গিয়ে আনতে পারি, কিন্তু দুটো অসুবিধে আছে। প্রথমত, কোন দোকানে ফেলে এসেছেন, আমি চিনব-কী করে? সেকেন্ডলি, দোকান ট্রেস করতে পারলেও দোকানদার আমায় দেবে কেন?

ঠিকই তো...। তা হলে...?

উপায় আছে। আপনারা কেউ সঙ্গে চলুন।

তিয়ারই ক্যামেরা। গেলে তো তিয়াকেই যেতে হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা একটা ছেলের সঙ্গে... মোটরবাইকে...! তিয়ারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। লক্ষ করে সূর্য বলল,— দেখুন, সাফ সাফ একটা কথা বলি। দিঘা বেড়াতে আমি একাই এসেছি। হোটেলে নামঠিকানা আছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো ডাহা মিথ্যে হতে পারে। আমি কেমন, বোঝারও আপনাদের কোনও সুযোগ নেই। আর আপনারা তো শংকরপুর গেছেন, দেখেছেন নিশ্চয়ই রাস্তাটা কীরকম নির্জন। বলেই কান এঁটো করা হাসি,— এতগুলো নেগেটিভ ফ্যাক্টর মাথায় রেখে যদি যেতে পারেন, তবেই চলুন।

সে যে কী কাঁপতে কাঁপতে যাওয়া! বাবানদার পনেরো হাজার টাকার ক্যামেরা বলে কথা! এমন বজ্জাত ছেলে, ফেরার পর পকেট থেকে অফিসের আইডেন্টিটি কার্ড বার করে দেখাচ্ছে!

ভিক্টোরিয়াকে পাক খেয়ে, রেসকোর্সের পাশ দিয়ে, ছুটছে সূর্যর মোটরসাইকেল। উদ্দাম বাতাসে হুহু উড়ে যাচ্ছে দিনের ক্লান্তি। তিয়া মাথা রাখল সূর্যর পিঠে। সে-দিন কি খুব বেশি সাহস দেখিয়ে ফেলেছিল তিয়া? হয়তো। তবে তাতে ক্ষতি তো হয়নি। অন্তত একটা বিশ্বাসের ভিত তো তৈরি হয়েছিল সে-দিন। পরে যা পোক্ত হয়েছে ক্রমে ক্রমে। গত দু'বছরে। উঁহুঁ, দু'বছর কোথায়, বড়জোর একুশ-বাইশ মাস। এখন তিয়া এটুকু বুঝে গেছে, আর পাঁচটা ছেলের মতো সূর্য হ্যাংলা নয়। বান্ধবীদের এক একজনের মুখে যা গল্প শোনে! আলাপ জমতে না জমতেই বিছানা! সূর্যও মাঝে মাঝে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে হয়তো, তবে তিয়ার সম্মতি অসম্মতিকে তো মেনেও নেয়। পুজোর সময়ে ডায়মন্ডহারবারের হোটেলে যা ঘটে গেল, তাতে তো তিয়ারও সায় ছিল। আদিম রোমাঞ্চ চাখার বাসনা তারও কি জাগেনি? কিন্তু তারপর? আবার একদিন চেয়েছিল সূর্য। গড়িয়াহাটে ফাঁকা ফ্ল্যাট, সূর্যর কাছে চাবি রেখে মাসি-মেসো গেছে মেয়ের বাড়ি, মুম্বইতে। তিয়াকে নিয়ে সূর্য সটান সেখানে। তিয়া সেদিন কেন যেন বেঁকে বসেছিল। চোরাগোপ্তা অন্যের ফ্ল্যাটে, তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে...। হয়তো সূর্য বেশি জোরাজুরি করলে তিয়ার অনিচ্ছা উবে যেত। তবে সূর্য কিন্তু সে-দিন আর এগোয়নি। সূর্যর এই সংযমের প্রশংসা তো করতেই হয়।

সূর্যকে কি তিয়া বিয়ে করবে? জানে না তিয়া। বিয়ে নিয়ে ভাবতে গেলেই তিয়ার শরীর কেমন ঠান্ডা হয়ে আসে। কেন যে! বাবা মাকে দেখে দেখেই কি

এমনটা হল? অবশ্য সূর্যও সেভাবে প্রস্তাব রাখেনি এখনও। ব্যাবসাটা সবে শুরু করেছে, আগে দাঁড়াক তো। এখনই তাড়াহুড়োর দরকারটাই বা কীসের?

ময়দানে পাক খেয়ে ব্লু ভেলভেটে থামল মোটরবাইক। সাধারণত রাত বাড়লে এখানে ভিড় জমে বেশি। তবে আজ শনিবার, সন্ধে সাড়ে সাতটাতেই মধুশালা আজ রীতিমতো সরগরম। কাউন্টারের সামনে উঁচু উঁচু টুলগুলো প্রায় ভরতি, ছড়ানো ছেটানো টেবিলও ফাঁকা নেই খুব একটা। লম্বাটে হলের এক পাশে, মাইক্রোফোন হাতে, পুরনো দিনের হিন্দি গান গাইছে এক তরুণ, সঙ্গে জনা তিনেক বাজনদার। সংগীত আর চাপা কলরোল মিলেমিশে একাকার।

সূর্য দারুণ চনমন করছে। বসেই বলল,— কী নেবে বলো?

তিয়াও দিব্যি ফুরফুরে। পালটা প্রশ্ন করল,— তুমি?

ইউজুয়াল। হুইস্কি। তোমার একটা ভদকা বলে দিই?

অল্পস্বল্প পানে তিয়ার অনীহা নেই। বলল,— না, ভদকায় আমার চরকি আসে। জিন বলো।

উইথ লাইম?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই ভাল।

সূর্যর তর সইছে না। নিজেই গিয়ে পানীয় দুটো নিয়ে এল। বার-টেন্ডার সামনে আসতেই তাকে খাবারেরও অর্ডার দিল কিছু। চিকেন টিক্কা, মাশরুম হট অ্যান্ড পেপার...।

হুইস্কি ঠোঁটে ছুঁইয়ে সূর্য বলল,— কয়েক দিন ধরে তোমায় একটা কথা বলব ভাবছিলাম, জানো।

কী?

ফ্র্যাঙ্কলি জিজ্ঞেস করছি... কিছু মনে কোরো না... এখন মাসে তোমার ইনকাম কত? আই মিন, অ্যাভারেজ?

তিয়া বেশ অবাক। আগে কখনও সরাসরি এ-প্রশ্ন করেনি সূর্য। হয়তো ঠাট্টার ছলে কিছু একটা জানতে চেয়েছে, ব্যস ওই পর্যন্ত।

সামান্য দ্বিধা নিয়ে তিয়া বলল,— কী হবে জেনে?

নিশ্চয়ই কারণ আছে।

স্যালারি আর কত, সাড়ে সাত। প্লাস, মাসে একটা গাড়ি তো বেচতে হয়ই। কমিশন, ইনসেনটিভ, সব মিলিয়ে হাজার এগারো-বারো। কোনও কোনও মাসে হয়তো আর একটু জাম্প করল...

হুম্‌ম্‌। সূর্য মাথা দোলাচ্ছে,— আমি কি তোমায় একটা অফার দিতে পারি?

তুমি?

ইয়েস। হোয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন মাই বিজনেস? চলে এসো কানেক্টিভিটিতে।

আআআমি কী করব?

আমায় হেলপ করবে। উই উইল ওয়ার্ক টুগেদার। যা আসবে, মোটামুটি আমরা শেয়ার করে নেব।

এমন একটা মতলব যে মাথায় ঘুরছে, ঘুণাক্ষরেও তো টের পেতে দেয়নি সূর্য। তিয়া খানিকটা মজাই পেল। গালে হাত রেখে ছদ্ম গাম্ভীর্য ফোটাল গলায়,— নাউ আনসার মাই কোয়েশ্চেন। তোমার মাস গেলে কত হয়?

ডিপেন্ডস্‌। যেমন অর্ডার আসে। এখনও তো খুব বেশি বড় কিছু নেই ... ছোটখাটো কাজে পাঁচ-দশ-পনেরো ... বড় হলে চল্লিশ পঞ্চাশ...

হুম্‌ম্‌। তিয়া সূর্যকে নকল করল,— তুমি তা হলে এক সম্ভাবনাময় তরুণ। প্রস্তাবটা নিয়ে তো তা হলে ভাবতে হয়।

সূর্য হেসে ফেলল,— যত খুশি ভাবো। তবে রেজাল্টটা যেন হ্যাঁ হয়। রিয়েলি একজন রিলায়েবল কেউ সঙ্গে না থাকলে...। বিশ্বরূপ তো পার্টনার হতে রাজি। টাকাও ঢালবে। কিন্তু আমি ঠিক ওরকম চাইছি না। দিস উইল বি মাই বিজনেস। আই মিন, আওয়ার বিজনেস।

বলছ?

অফ কোর্স। ওসব গাড়িটাড়ি ফোটাও। চলো সাথ সাথ, রাখো...

কথা শেষ হল না, সূর্যর চঞ্চল চোখ হঠাৎই স্থির। পাবের দরজায়। এক সেকেন্ড... বলেই টেবিল থেকে ধাঁ। দ্রুত পায়ে এক বছর পঁয়তাল্লিশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, করমর্দন সেরে তার সঙ্গে কথা বলছে। সাফারি-সুট লোকটাকে নিয়েই ফিরেছে টেবিলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আলাপ করিয়ে দিল,— মিট মিস্টার কিশোর তানেজা। ... অ্যান্ড দিস ইজ তিয়াসা মিত্র। শি ইজ অলসো উইথ মি।

তিয়া হাত বাড়িয়ে দিল। কিশোর তানেজার ঝকঝকে মুখে একগাল হাসি,— গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

আই অ্যাম অনার্ড। প্লিজ, বসুন।

মিনিট কয়েকের মধ্যে তানেজার জন্য হুইস্কি এসে গেল। সূর্য তার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই খুব সম্ভ্রান্ত ক্লায়েন্ট, নইলে এত তেল মেরে মেরে কথা বলে! তানেজাদের অফিসে বোধহয় কোনও প্রোগ্রাম আছে, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বটা পেতে চাইছে। তানেজাও শুনছে মন দিয়ে, মতামতও জানাচ্ছে, কিন্তু বারবারই চোখ ঘুরেফিরে তিয়ায়।

এসব দৃষ্টি তিয়া গায়ে মাখে না। কর্মসূত্রে অভ্যেস হয়ে গেছে। অন্যমনস্কতার ভান করে সে চার দিকটা দেখছিল। গাইয়ে ছেলেটা বিটকেল পোশাক পরেছে তো! চকমকে প্রিন্টেড শর্ট-শার্ট, সঙ্গে জ্যাকেট। লম্বা লম্বা চুল পিছনে ঝুঁটি করে বাঁধা। যন্ত্রসঙ্গীরাও জিনস-টিশার্ট। এক টাকলু কংগো বাজাচ্ছে। টাক? না মাথা কামানো? গায়ক ছেলেটির গলা মন্দ নয়। বেশ একটা প্যাথোজ আছে। মুকেশ মুকেশ। গানও বেছেছে সেরকম। নরম নরম। ... কোনও টেবিলে চেনা কাউকে চোখে পড়ে কি? আগের দিন নন্দিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আজ তেমন কেউ নেই। এক টলটলায়মান আধবুড়ো অন্দরে ঢুকছিল, তাগড়াই বাউন্সার আটকেছে তাকে। আগে নির্ঘাত বাওয়াল করেছে কোনওদিন। বেশ বিনয়ের সঙ্গে, পিঠে হাত রেখে, তাকে দরজা পার করে দিল বাউন্সার। গায়ক গান ধরেছে, দুনিয়া বনানেওয়ালে কেয়া তেরে মন্‌মে সমাআআইই...

ওফ্, সূর্যর বকবকানি আর থামে না। জিনটুকু গলায় ঢেলে তিয়া নড়েচড়ে বসল। বার-টেন্ডার খাবার রেখে গেছে। দ্বিতীয় দফার হুইস্কিও। সূর্য তানেজাকে এগিয়ে দিল প্লেট। তিয়াকেও। নিজের খাওয়ার উৎসাহ নেই, তৈলমর্দন করেই চলেছে। দু'-তিনবার মোবাইল বাজল, কেটে দিল টক করে।

তিয়ার এবার একটু একটু রাগ হচ্ছিল। আগেও একদিন এমন ঘটেছে। এক মক্কেল এসে বসল তো বসলই।... গোটা সন্ধেটাই মাটি। নিজেরা যদি একটু নিভৃত-রচনা না করতে পারে, তা হলে এই আসার কোনও মানে হয়? আচমকাই লোকটাকে নিয়ে কাউন্টারে চলে গেল সূর্য, টুলে বসে হুইস্কি টানছে দু'জনে। যাহ্ বাবা, তিয়া এখন বোকার মতো বসে থাকবে?

নতুন গান শুরু হল, জোশে জওয়ানি হায় রে হায়...। বেশ তালের গান। পাশের ছোট্ট ডান্সফ্লোরে নাচতে উঠে গেল কেউ কেউ।

ঘাড় হেলিয়ে নাচ দেখছিল তিয়া, সামনে হঠাৎ তানেজা,— এক্সকিউজ মি ম্যাম। ক্যান উই জয়েন দা ফ্লোর?

তিয়া ঈষৎ থতমত। সূর্যর দিকে তাকাল একবার। চোখাচোখি হল না, কাউন্টারে বসে সূর্য মাথা দোলাচ্ছে গানের তালে তালে।

অস্বস্তির সঙ্গে তিয়া বলল,— না মানে... আমি তো ঠিক...

প্লিজ...

তিয়া আর না বলতে পারল না। সূর্য কী মনে করবে...! লোকটার সঙ্গে গিয়ে দুলল একটু। গান শেষ হতেই তালি বাজছে। ফিরে এসে বসল টেবিলে।

সূর্যও এল। তানেজা আর তাদের সঙ্গে যোগ দিল না। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কৌতুকের সুরে সূর্য বলল,— বেশ নাচছিলে কিন্তু।

তিয়া জবাব দিল না। কেন যেন তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় একটা বার্তা পাঠাচ্ছে। টেবিলে আঙুল ঘষতে ঘষতে আচম্বিতে বলে ফেলল,— ওই লোকটা যে এখানে আসবে তুমি জানতে, তাই না?

না মানে... হ্যাঁ মানে ... জানোই তো এটা কনট্যাক্ট প্লেস, অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

তুমি ইনভাইট করেছিলে বুঝি?

সূর্যর মুখ যেন একটু সাদা দেখাল। ভার গলায় বলল,— এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করার অর্থ?

তিয়া ছোট্ট শ্বাস ফেলল। ইস, কেন যে উলটোপালটা চিন্তাটা মনে এল!

সাত

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে বাস থেকে নেমেছিল দোলা। গির্জার পাশের ফুটপাথ ধরে হাঁটছিল। এই রাস্তাটায় হাঁটতে দোলার বড় ভাল লাগে। যেন খানিকটা মায়া ছড়িয়ে আছে এ-পথে। বুঝি কিছু অতীতও। এক সময়ে নিত্য আসা-যাওয়া ছিল কিনা। শোয়ের পর দল বেঁধে মানমন্দিরের মুখে এসে ছিটকে যেত যে যার মতো। কেউ উত্তরে, কেউ দক্ষিণে, কেউ বা গঙ্গার ও পারে।

দোলা রাস্তার উলটো পারে তাকাল। মেলার মাঠে ভারী ঝকমকে একটা পার্ক তো! নতুন হয়েছে। আগের বারও যখন সৃষ্টির নাটক দেখতে এসেছিল,

জায়গাটা ছিল ন্যাড়া ন্যাড়া। এখন আলোয় আলোয় সাজানো। সূর্য এখনও ডোবেনি পুরোপুরি, বাহারি বাতিগুলো কেমন ফ্যাটফ্যাট করছে। তবে পরিবেশটা বেশ। এই অজর অমর শহর কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

শুধু দোলারই কোনও বদল ঘটল না। একটা দম দেওয়া ঘড়ির মধ্যে জীবনটা আটকে রইল। বাঁয়ে প্রাচীন গির্জার দিকে খানিকটা বাতাস ভাসিয়ে দিল দোলা। গির্জা টের পেল কি? পায়ের তলায় চৈত্রের শুকনো পাতা ভাঙছে মড়মড়। তারাও কি বুঝল কিছু? দূর, সে নিজেই তো একটা শুকনো পাতা। গাছ থেকে খসে পড়েনি, এই যা। গাছই যার দীর্ঘশ্বাসের খবর রাখে না, ওই বুড়ো গির্জা বা এই মরা পাতারা তার সমব্যথী হবে কেন!

শহরের ত্বকে শেষ বিকেলের নরম আলো। এ আলোয় যত না আবেশ, বুঝি বা ততটাই বিষাদ। আলোটুকু মুখে মেখে দোলা অ্যাকাডেমির গেটে এল। চোখ চালিয়ে দেখছে নানান নাটকের পোস্টার, ব্যানার। তারপর পায়ে পায়ে সৃষ্টির কাউন্টারে। ফোকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

টিকিট বেচছিল সোদপুরের পরেশ। দোলাকে দেখেই তার একমুখ হাসি,— অনেক দিন বাঁচবেন দোলনদি। এইমাত্র নীলুর সঙ্গে আপনাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল।

দোলার মুখ ওমনি উদ্ভাসিত,— তাই নাকি?

হ্যাঁ। বলছিল, আপনার সঙ্গে আজ দেখা হতে পারে। সৃষ্টির ফার্স্ট শো-র তারিখটা আপনি ভুলতে পারবেনই না।

বটেই তো। নাড়ির টান বলে কথা। ... নীলু কোথায়?

এই তো ছিল এতক্ষণ। বোধহয় গ্রিনরুমে গেল। ... আসুন না, ঘুরে ভেতরে আসুন।

বড় গেটটা পেরিয়ে পরেশের কাছে গেল দোলা। জিজ্ঞেস করল,— আছ কেমন?

এই তো, কেটেকুটে যাচ্ছে। রক্ত পড়ছে না।

এখনও ইয়ার্কির অভ্যেস যায়নি? দোলা মিটিমিটি হাসছে,— বউয়ের কী খবর? ঋতার স্কুল চলছে?

মাইনে পাচ্ছে, ছুটি খাচ্ছে, মাঝে মাঝে যাচ্ছে। যেদিন তালা ঝুলবে, আমার কপাল পুড়বে।

আর তুমি? কোনও পার্মানেন্ট কাজ পেলে?

দিচ্ছে কে, মিলছে কই, জুটলে কিছু বর্তে যাই।

তার মানে এখনও সেই টিউশনি?

আর কী। ছাত্র পেটাই সুখ করে, গিন্নি বেজায় মুখ করে।

দোলার ঠোঁটে অনাবিল হাসি। পারেও বটে পরেশ ছন্দ মিলিয়ে বাক্য রচনা করতে। সৃষ্টিতে কখনওই খুব একটা বড়সড় রোল পায়নি, তবু দলের ওপর কী প্রচণ্ড টান। সদানন্দ ভাব পরেশের মুখ থেকে কখনই মোছে না।

কাউন্টারে এক ক্রেতা। তাকে টিকিট দিয়ে পরেশ ফের ঘুরল,— আপনি কি একা?

দোকা আর কবে আসি ভাই?

একবার এসেছিলেন কিন্তু। দাদাকে আমার মনে আছে।

সে ভুল করে...। হাতে টিকিটখানা নিয়ে বেরোতে গিয়েও দোলা দাঁড়াল,— বক্সের কী হাল?

সৃষ্টির ফার্স্ট শোয়ে যেমন থাকে। পঁচিশ থেকে তিরিশ পারসেন্ট ফুল হবে।

উঠবে। পরে নিশ্চয়ই উঠবে।

আপনার মুখে মাটন রোল পড়ুক।

হাসতে হাসতেই দোলা হাঁটা শুরু করল। ডাইনে তাকিয়ে ফের থেমেছে পা। অ্যাকাডেমিতে এলে মাঝে মাঝে আর্ট গ্যালারিতে ঢুকত আগে। ছবির ব্যাকরণ সে বোঝে না আদৌ, তবু ঘুরে ঘুরে দেখতে মন্দ লাগত না। কত রঙের খেলা! মানুষ, জীবজন্তু, আর নিসর্গের মাধ্যমে জীবনকে কত অজস্র ভাবে কাটাছেঁড়া! সবে পৌনে ছ'টা বাজে, হাতে খানিকটা সময় আছে, যাবে একবার?

যেতে গিয়েও কী ভেবে মত বদলাল দোলা। থাক, আজ বিকেলটা তো শুধুই সৃষ্টির। দিনটার জন্য দোলা কবে থেকে যে দিন গুনছে। সকলের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই আজ আগে।

স্নায়ুর চাপে ভোগা সাজঘরে দোলা সমাদর পেল যথারীতি। চলল টুকটাক কুশল বিনিময়। অংশু নেই, সে প্রথমেই মেক-আপ নিয়ে চলে গেছে স্টেজে, দেখভাল করছে প্রস্তুতির। রানি শর্মিষ্ঠাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে দোলা গুটিগুটি পায়ে সেখানে গেল। জোর কদমে চলছে মঞ্চসজ্জা, মাপ বুঝে বুঝে বসানো হচ্ছে চেয়ার-টেবিল, নকল দরজা-জানলা। ঠকাঠক হাতুড়ির ঘা পড়ছে এখানে সেখানে। অংশু মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে, পরনে লুঙ্গি আর আধছেঁড়া

পাঞ্জাবি। পাশে স্টেজ ম্যানেজার সুদেব। দু'জনেরই চোখ ওপরে, যেখান থেকে আলো ফেলবে, সেখানে।

সুদেবেরই প্রথম নজর পড়ল দোলাতে। হাত তুলে বলল,— ওয়েলকাম দোলন।

সঙ্গে সঙ্গে অংশুও তাকিয়েছে,— বাহ্, তুমি এসে গেছ?

আগাম শুভেচ্ছা জানাতে ঢুকে পড়লাম।

বেশ করেছ। বলেই অংশু ফের কাজে মনোযোগী। চতুর্থ পরদায় গলা তুলে বলল,— রবি, অ্যাই রবি, মালটা এসেছে?

হ্যাঁ অংশুদা। ব্যাকস্টেজ থেকে তুরন্ত জবাব,— জায়গা মতো রেখে দিয়েছি।

আবার লিস্ট ধরে মেলাও। ... টেলিফোন?

আছে।

হাত-তোয়ালেটা পেয়েছ?

ওগুলো নিয়ে আর ভাববেন না।

হুঁহ্। অংশু চেটোর উলটো পিঠে কপাল মুছল। আচমকাই দোলার দিকে আঙুল তুলেছে,— এই তুমি ... তুমিই ডুবিয়েছ।

দোলা তো হাঁ। অস্ফুটে বলল,— আআআমি?

তুমি যখন ছিলে, প্রপ্‌স নিয়ে ভাবতে হত না। নিখুঁত সাজানো থাকত সব কিছু। রবি প্রত্যেকটা শোয়ে একটা না একটা গন্ডগোল করছে। আজ প্রিমিয়ার, এমনিই টেনশনের অন্ত নেই... উনি বিড়ির বান্ডিলটাই আনতে ভুলে গেলেন।

ঘাবড়াও কেন? সুদেব ফিচেল হাসছে,— আমার প্যাকেটটা দিয়ে দিতাম, তুমি নয় সিগারেটই ধরাতে।

বটেই তো। ক্যারেক্টারটারই বারোটা! ছেলেও বিদেশি সিগারেট খাচ্ছে, বাপও লুঙ্গি পরে ফরেন ব্র্যান্ড ফুঁকছে ... সিন একেবারে মাখো মাখো! ওদিকে ক্রিটিকরাও কলম শানিয়ে বসে আছে...!

সুদেবদা? একটা স্বর উড়ে এল,— গোলটেবিল ব্যাক স্টেজের কোন সাইডে রাখব? রাইট? না লেফট?

আমার মাথায়।

বলতে বলতে দৌড়েছে সুদেব। তার উদ্‌ভ্রান্ত ছুট দেখে হেসে ফেলল দোলা। অংশু টেরিয়ে তাকাল,— খুব মজা পাচ্ছ, না?

একটু একটু। দোলা হাসিটুকু ঠোঁটে রেখেই বলল,— কটা দিনই বা ছিলাম ... এখনও তা হলে আপনারা আমাকে মিস্ করেন?

একটু একটু। অংশু শব্দ দুটো ফেরত দিয়ে বলল,— জীবন তার নিজের পথেই চলে, দোলনচাঁপা। শূন্যতা আপনাআপনি ভরাট হয়ে যায়। তবে চিহ্নটুকু তো মোছে না।

শুধু কি দল ছাড়ার কথাই বলল অংশুদা? নাকি কোনও গভীর ইঙ্গিত আছে কথাটায়? দোলা বলতে যাচ্ছিল, আমার মতো নগণ্য মানুষের চিহ্ন থাকাও তো বিস্ময়কর ... সুযোগ পেল না বলার। তার আগেই হুড়মুড়িয়ে মঞ্চে আরও চার-পাঁচ জন। চকের দাগ কাটা জায়গায় টুকিটাকি আসবাব বসাচ্ছে। অংশুও ব্যস্ত আবার, আলো ফেলার ইশারা করছে লাইটম্যানকে। সেই অনুযায়ী পা মেপে মেপে দু'-একটা জিনিস সরল অল্প অল্প। লম্বা লম্বা স্টেপ ফেলে অংশু এবার ও-পারে। সুদেব আর অলককে ডেকে হাতমুখ নেড়ে সেট নিয়ে কী বোঝাচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলে কেটলি আর ভাঁড় নিয়ে ঘুরছিল, হাতে হাতে চা ধরিয়ে উইংসের পিছনে ছুটল। কথা আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলছে পুরুক পুরুক চুমুক। সৌমাল্য একটা উইং দিয়ে ঢুকল হনহন, বেরিয়ে গেল ধীর পায়ে। আবার ঢুকল, বেরোল। শেষ মুহূর্তের প্র্যাক্টিস। চতুর্থ বারের পর বুঝি মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়েছে, নিষ্ক্রান্ত হল পাকাপাকি। এবার মঞ্চে রানি রায়। দোলার দিকে দৃকপাত না করে মঞ্চের একদম সামনেটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পরদা ঘেঁষে। চুল খোলা, পরনে নাইটি হাউসকোট। ফার্স্ট বেল পড়ল।

এই যে সামগ্রিক ছবিটা, এর রূপ-রস-গন্ধের আহ্বানেই কি প্রাণ কাঁদে দোলার? নাকি যে এর প্রাণকেন্দ্র, তার জন্যে...? এখানে এলে, দলের মাঝে, দোলা যেন দুটোকে ঠিক পৃথক করতে পারে না। শুধু টের পায়, বুকটা কেমন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। মঞ্চের আলো নয়, সে তো চেয়েছিল পিছনেই থাকতে। আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিশে একটা কর্মকাণ্ডের শরিক হতে। সৃষ্টির কাজে পেরেক বা নাটবল্টু হয়ে থাকতে পারার আনন্দও কি কম?

প্রিল্যুড চলছে। মেঠো বাঁশির সুর ক্রমশ বদলে গেল চড়া অর্কেস্ট্রায়। দোলা অন্ধকার হলে এসে বসল। নাটকটা সত্যিই অন্য ধরনের, সৃষ্টির আর পাঁচটা প্রযোজনার মতো প্রতীকধর্মী প্লট নয়। সমসময়ের প্রতিচ্ছবি বলা যায় বরং। পুরনো মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা এক বাবা কী ভাবে ক্রমশ বাতিলের তালিকায় চলে যাচ্ছে...!

শো ভাঙল পৌনে ন'টায়। ফিরতে দেরি হবে জেনেও দোলা গেছে ব্যাকস্টেজে। খানিক আগে ছিল গড়ার আয়োজন, এখন সেখানে বিনির্মাণের পালা। ছোটখাটো ভিড়ও জমেছে, চেনা পরিচিত দর্শকদের। প্রশংসা আর কাটাছেঁড়া চলছে।

একটা ক্ষুদ্র জটলা থেকে বেরিয়ে এল অংশু। উদগ্রীব মুখে জিজ্ঞেস করল,— কেমন লাগল? অনেস্টলি বলবে কিন্তু।

দোলা মুগ্ধতা উগরে দিল,— ভাল। ভীষণ ভাল।

একটু লেংদি লাগেনি? ইন্টারভ্যালের আগে একটা দুটো সিনে কাঁচি চালালে ভাল হয় না?

আমি অতশত বুঝি না। আমার তো টানটানই লাগল।

তাই কি?

হ্যাঁ। আমি তো মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিলাম।

সেটা অবশ্য তোমার দৃষ্টি দেখেই বুঝেছি। ফার্স্ট রোয়ে বসে এমন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ছিলে। অংশু মৃদু হাসল,— ইনফ্যাক্ট, তোমার ওই তাকিয়ে থাকাটাই আজ আমায় খুব ইন্সপায়ার করেছে।

দোলা ঈষৎ লজ্জা পেল,— যাহ্। বাড়িয়ে বলছেন। আপনি এমনিতেই ... ছন্নছাড়া তো আপনি একাই জমিয়ে দিয়েছেন।

জমলেই ভাল। আগের প্রোডাকশনটা তো ফেল করল। অংশু ঘাড় ঘুরিয়ে সেট ভাঙাভাঙি দেখল একবার। তারপর সামান্য গলা নামিয়ে বলল,— একটা কথা ভাবছিলাম, জানো?

কী?

তোমার অপারগতাটা আমি বুঝি দোলনচাঁপা। তবে এখন তো ছেলেমেয়েরা অনেক বড় হয়েছে, তোমার কাছ থেকে সংসারের ডিম্যান্ডও কমেছে নিশ্চয়ই... দ্যাখো না, আবার মাঝে মাঝে আসতে পারো কিনা।

সংসারের দাবিই বড় ছিল কিনা দোলা নিশ্চিত নয়। একটা মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছেই তো ছিল প্রধান। তার কি বদল ঘটেছে কোনও? আজ সকালেই যখন সে নাটক দেখতে যাওয়ার কথা জানাল, পলকে চোয়ালটা শক্ত হয়ে গেল না? বয়স তো অনেক হল, আর সন্দেহ-টন্দেহ বরদাস্ত হয়?

দোলা মলিন মুখে বলল,— দেখি। যদি পারি...

প্লিজ চেষ্টা কোরো। তুমি এলে আমার খুব ভাল লাগবে। বলেই অংশুর ঠোঁটে কেমন এক অপ্রস্তুত হাসি,— শুধু আমি কেন, আমাদের সকলেরই ভাল লাগবে। তোমারও। ঠিক বলছি কি, দোলনচাঁপা?

দোলার স্বর ফুটল না। বুকটা যেন চলকে উঠেছে সহসা। অংশুদার ওই অপ্রতিভ হাসি কি অন্য কোনও সংকেত পাঠাল? যে সংকেতের প্রতীক্ষায় একদা আকুল থাকত এক সপ্তদশী কন্যা। পরে, সৃষ্টিতে থাকার সময়েও কি এমনই কিছু শুনতে চেয়েছিল তনুমন? অথবা এ নেহাতই কল্পনা মাত্র? মানুষ যা শুনতে চায়, সে ভাবেই তো গড়ে নেয় কথাগুলোকে। সহজ সাধারণ হলেও? হয়তো বা স্নেহের বশেই উচ্চারিত হল বাক্যগুলো, আর পাঁচ জনকে যেমন বলা হয় আর কী। তবু, অংশুদার মুখ দিয়ে বেরোল বলেই, যেন অন্য মাত্রা পেয়ে গেল আমন্ত্রণটা।

আঁজলা ভরা সুখটুকু নিয়ে দোলা বাসস্টপে এল। ন'টা বেজে গেছে, তবু এখনও বেশ লোকজন রবীন্দ্র সদনের সামনে। নন্দন চত্বরে কোনও একটা মেলা চলছে, বেরিয়ে আসছে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে কেউ কেউ, অথবা একটু বেশিই ঘনিষ্ঠ। চোখ পড়লে দোলার সামান্য অস্বস্তি হয়। কিন্তু আজ যেন তেমনটা লাগছিল না। অন্তত এই মুহূর্তে। অন্য এক আবেশে ছেয়ে গেছে মন। আগের নাটকটা দেখতে আসার দিনও অংশুদা এভাবে ডাকেনি। আবার এলে হয়। অশান্তি বাড়বে? নীরব উপেক্ষা দিয়ে প্রতিহত করতে পারবে না দোলা?

ঘ্যাঁচ করে এক ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল সামনে, ফুটপাথ ঘেঁষে। জানলা থেকে ডাক,— কাকিমা? ও কাকিমা?

দোলা চমকে তাকাল। গার্গী।

বাড়ি যাবেন তো? চলে আসুন।

সামান্য ইতস্তত করছিল দোলা। গার্গী দরজা খুলে দিয়েছে। মুখ ফুটে না বলার কারণ খুঁজে না পেয়ে শেষে দোলা উঠেই পড়ল।

ঠিকঠাক গুছিয়ে বসতে না বসতে গার্গীর প্রশ্ন,— কোনও ফাংশন দেখতে এসেছিলেন বুঝি?

নাটক।

আপনার বুঝি নাটক দেখার শখ?

এবারও দোলার সংক্ষিপ্ত উত্তর,— হুঁ।

জানেন তো, আমারও এক সময়ে নাটক-সিনেমার নেশা ছিল। এখন আর হয়েই ওঠে না। সময় পাই না।

দোলা ঝলক দেখল মেয়েটাকে। বছর পঁয়ত্রিশের গার্গীর পরনে আজ চাপা লং স্কার্ট, ঢোলা-হাত থ্রি-কোয়ার্টার টপ্। চোখমুখ রীতিমত ধ্বস্ত। কৌতূহল দেখাতে না চেয়েও দোলা জিজ্ঞেস করে ফেলল,— তুমি কোথ্থেকে আসছ?

হিমালয়া হাউসে একটা মিটিং ছিল। আমরা যারা সাউথ ক্যালকাটা আর সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় অল্টিয়াসের এজেন্সি নিয়েছি, তাদের সবাইকে নিয়ে। সেই কোন চারটেয় স্টার্ট করেছিল, এতক্ষণে ছাড়া পেলাম।

ও হ্যাঁ... তুমি তো যেন কী একটা করছ!

আমাদের কোম্পানি তো রিটেলে মাল দেয় না, কানেকশন বাড়িয়ে বাড়িয়ে ক্লায়েন্ট ধরতে হয়। অবশ্য তাদেরও ক্লায়েন্ট বলে না, তারাও এজেন্ট। একটা পার্টিকিউলার অ্যামাউন্টের প্রোডাক্ট তুলে তারাও সেল শুরু করতে পারে। বলতে পারেন, কোম্পানিকে নতুন নতুন এজেন্ট দেওয়াটাই আমাদের কাজ।

ও। দোলা মোটামুটি বুঝতে পারল,— তার মানে তোমরা চেন তৈরি করো।

একদম ঠিক।... আমি তো ভাবছি, আপনার কাছেও যাব একদিন।

ওমা, কেন?

আপনি আমার টারগেট লিস্টে আছেন। গার্গীর শ্রান্ত মুখে এক ফালি হাসি,— নেহাত আমাদের হাউজিংয়ে এখনও কাজ শুরু করিনি, নইলে কবেই আপনাকে অ্যাপ্রোচ করতাম। আপনি কিন্তু সাংঘাতিক পোটেনশিয়াল এজেন্ট হতে পারেন। কাকু অত বড় চাকরি করে, সেই সূত্রে নিশ্চয়ই আপনাদের অনেক চেনাজানা... এ ছাড়া তিয়াসাও সেল্স লাইনে, সেও আপনাকে কনট্যাক্টস দিতে পারে... প্লাস, আপনাদের রিলেটিভ্স, ফ্রেন্ডস... আপনার জামাইবাবুও তো হাইলি প্লেস্ড...

মহা ধুরন্ধর মেয়ে তো! কোথ্থেকে এত হাঁড়ির খবর পেল? তিয়ার সঙ্গে মৌখিক আলাপ থাকতে পারে, তবে এত গল্প করার বান্দা তো তিয়া নয়! তার ফুরসতই বা কই, এখন তো রবিবারেও অফিস চলছে! তা হলে কে? মন্দিরা? যে উৎসাহে সে গার্গী-সমাচার দোলাকে শোনায়, হয়তো সেই উৎসাহেই দোলাদের খবরও...!

দোলা হেসে বলল,— দূর, আমায় দিয়ে ওসব হবে না। আমি কথাই বলতে পারি না।

বলতে তো হবেও না। কথা বলবে অল্‌টিয়াসের প্রোডাক্ট। আপনি নিজে ব্যবহার করে সন্তুষ্ট হলে তবেই না অন্যের কাছে যাবেন। গুণাগুণ তখন আপনাআপনি ব্যাখ্যা হতে থাকবে। বলেই কোলের বড় ব্যাগখানা খুলেছে গার্গী। একটা টুথপেস্ট বার করে দোলার হাতে ধরিয়ে দিল,— এটা দিয়েই স্টার্ট করুন। সাত দিন ইউজ করলে বুঝতে পারবেন বাজারচলতি প্রোডাক্টগুলোর সঙ্গে কত তফাত। রাখুন না, রেখে দিন।

ফাঁপরে পড়ল দোলা। অস্বস্তি মাখা গলায় বলল,— কত দাম এটার?

এক পয়সাও না। এটা আমার গিফ্‌ট। এর পর যা দেব, দাম নেব। ...আপনি এখন মুখে কোন ম্যাসাজ ক্রিম ব্যবহার করেন, কাকিমা?

কিছু তো করি না।

কেন করেন না? বলেই গার্গী আলগা হাত বোলাল দোলার হাতে,— আপনার স্কিন অবশ্য এমনিই খুব ভাল। সফ্‌ট, টেন্ডার...। আপনার বয়সে এক একজনের তো কুমিরের মতো চামড়া হয়ে যায়। ...তবু বলব, এখন থেকেই আপনার কেয়ার নেওয়া উচিত। এরপর কিন্তু আস্তে আস্তে স্কিন খসখসে হতে আরম্ভ করবে।

দোলা হেসে ফেলল,— সে তখন দেখা যাবে।

উঁহু, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিয়োর। আমি আপনাকে একটা অ্যান্টি রিঙ্কল ক্রিম দিয়ে আসব, আর একটা আন্ডার আই। এমনিতেই তো আপনার বয়স বোঝা যায় না, দেখে মনে হয় তিয়াসার দিদি। ক্রিমগুলো রেগুলার লাগান, দেখবেন আরও দশটা বছর আপনার বয়স থেমে থাকবে।

তুত্‌, কী যে বলো! ...ওসব আমার পোষাবে না। বলল বটে দোলা, তবে মনে মনে একটু খুশিও হয়েছে। সে যে মাঝে মাঝে ভাবে এখনও বুড়িয়ে যায়নি, ধারণাটা তা হলে মিথ্যে নয়! তবু গলা ঝেড়ে বলল,— তুমি বরং তিয়ার জন্যে কিছু দিয়ে যেয়ো।

তিয়াসা তো আছেই। তা বলে আপনি নিজেকে সুন্দর রাখবেন না কেন? আমাদের একটা দারুণ ফেস-মাস্ক আছে। একদম আপনাদের জন্যই। দুপুরে মুখ ডিপ ক্লিন করে প্যাকটা লাগিয়ে রাখুন... ধুয়ে ফেলুন... দেখবেন ফেস কী গ্লো করছে!

মহা নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়ল তো! দোলা কি কোনও অছিলায় ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে যাবে? একেই তো বাড়িতে সে সকলের উপহাসের খোরাক।

ছেলে, মেয়ে, বর, যে যখন যে ভাবে পারছে, বিদ্রূপ ছুড়ে যাচ্ছে। এর পর সৌন্দর্যচর্চা শুরু করলে তো আর দেখতে হবে না। অবশ্য জীবনে কখনও দোলা পারলার-টারলারে যায়নি, এমন নয়। তবু সব সময়ে কেমন কাঁটা হয়ে থাকতে হয়েছে, এই বুঝি খরচের অঙ্ক শুনে তুহিন কিছু বলল! মুখে না বললেও হয়তো গাল পেড়েছে মনে মনে! এমনিই তো কথায় কথায় শোনায়, রোজগার তো করলে না, রক্ত জল করা পয়সার মর্ম কী বুঝবে!

সাড়াশব্দ না করে দোলা রাস্তাঘাট দেখছিল। আবার গার্গীর গলা,— বাইরেটা ঝকঝকে রাখলে ভেতরটাও খুব তরতাজা লাগে কাকিমা।

দোলা আলতোভাবে বলল,— তাই কী?

আমার তো তাই মনে হয়।

দোলা অপাঙ্গে গার্গীকে দেখল। এখন না হয় ক্লান্ত, তবে মেয়েটার চেহারায় চাকচিক্য আছে। মেয়েটার ভেতরটাও কি অতটা চনমনে? বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরেও? কথার খই ছোটায় মেয়েটা, কথা দিয়েই কি ব্যাবসা চালায়? নাকি আরও কিছু দিতে হয়? শুধু ক'টা প্রসাধনী বেচে এত ঠাটবাট বজায় রাখা সম্ভব? অন্তত হাজার ছয়েক টাকা ভাড়া গোনে ফ্ল্যাটের, ছেলে দামি স্কুলে পড়ছে, কথায় কথায় ট্যাক্সি...! মন্দিরা যা বলে, তাই হয়তো সত্যি। কে জানে, নাও হতে পারে। কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতে দোলার বড় কষ্ট হয়। তুহিনের মতো একটা মানুষের সঙ্গে প্রায় ছাব্বিশ বছর ঘর করার পরেও।

মাথা থেকে ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল দোলা। গলায় সহজ ভাব এনে বলল,— তোমার ছেলেটাকে নীচে খেলা করতে দেখি... ভারী মিষ্টি হয়েছে।

ভয়ানক দুরন্ত। গার্গী ঘড়ি দেখল,— বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ। নির্ঘাত দিদাকে জ্বালাচ্ছে।

কোন ক্লাসে পড়ছে যেন?

এই তো, থ্রি-তে উঠল। ...প্রত্যেক বছর যা খরচ বাড়ছে...

দোলার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,— বাবা ছেলের খরচ দেয় না?

ঝট করে ঘুরে তাকাল গার্গী। দু'-এক সেকেন্ড দোলাকে দেখে নিয়ে নিস্পৃহ সুরে বলল,— দেয়। দেয় না। বিয়ে করেছে তো, আমিও আর বলি না। তার নতুন সংসার...

গার্গী থেমে গেল। বেশি কৌতূহল দেখিয়ে ফেলল কি দোলা? আর টুঁ শব্দটি না করে দোলা ফের চোখ মেলেছে রাস্তায়। দেখছে বন্ধ দোকানপাট,

ধেয়ে আসা গাড়ি, আলো। অন্ধকারও। মোবাইলে একটা ফোন এল গার্গীর। অতি অনুচ্চ স্বরে কথা বলছে মেয়েটা। দোলা প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, একটি শব্দও যেন কানে না যায়। অংশুদার কথাগুলোই ভাবছে আবার। মানে খুঁজছে।

ফোনালাপ শেষ। গার্গীও চুপচাপ। একটু বা উন্মনা। বাড়ি এসে গেল।

ফ্ল্যাটে ঢুকতেই ছিঁড়ে গেল সন্ধেটা। বাতাসে সুরার ঘ্রাণ। শোওয়ার ঘরে বোতল গ্লাস সাজিয়ে বসেছে তুহিন। যেমন প্রায়শই বসে আজকাল। সে দিকে না তাকিয়েই দোলা ব্যাগ পুরল আলমারিতে, ঘড়ি খুলল, কপাল থেকে ছোট্ট টিপটা নিয়ে সাঁটল আয়নায়। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকছিল, পিছনে হঠাৎ তুহিনের গলা,— যাক, ফিরেছ তা হলে?

শ্লেষ গায়ে না মাখাই সংগত ছিল। তবু দোলা দাঁড়িয়ে গেছে। খর দৃষ্টি হেনে বলল,— তুমি কী আশা করেছিলে? জন্মের শোধ বিদেয় হলাম?

তুহিনের যেন কানেই গেল না, চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। জবাব না দেওয়ার অবজ্ঞাটা হজম করে দোলা দ্রুত পোশাক বদলে এল। তিয়া তিতান দু'জনেই ফিরেছে, কম্পিউটার নিয়ে কী যেন খুনসুটি চলছে ভাইবোনের। বড় আত্মসুখী মেয়ে, রাতের খাবারগুলো পর্যন্ত ফ্রিজ থেকে বের করেনি, মা এসে করবে।

ঝটপট মুরগির মাংস আর পাঁচমেশালি তরকারিটা গরম করে ফেলল দোলা। ক্যাসারোলের রুটি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করল। রুটি তুলতুলে আর গরম না হলে বাবুবিবিদের গোঁসা হয়। এরপর ডাকাডাকি, সাধ্যসাধনার পালা, খেয়ে উদ্ধার করল সকলে। আহারের মাঝে তিতান নাটক নিয়ে প্রশ্ন করল টুকটাক, তিয়ার মুখের সামনে থ্রিলার, টেরচা চোখে শুনল মা-ছেলের কথা। বাপেরও কান খাড়া, তবে ভাব এমন, যেন শুনেও শুনছে না। নতুন কোনও বিদ্রূপ ছুড়ল না ছেলেমেয়ের সামনে, এই যা দোলার ভাগ্য।

টেবিল, রান্নাঘর সাফসুরত করে দোলা টিভি খুলে বসল। তুহিন আগে ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপর শুতে যাবে।

একটা গানের অনুষ্ঠান দেখছিল দোলা, তিয়া এসেছে পাশে। দেখছে টিভি। দোলা একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল,— কী রে, আজ কম্পিউটার ছেড়ে বোকা বাক্সে?

এমনি। স্বাদ বদল।

কাল ক'টায় বেরোবি?

দেখি। তিয়া আড়মোড়া ভাঙল। ছোট্ট হাই তুলে বলল,— ভাবছি এ-চাকরিটাও ছেড়ে দেব।

দোলা চোখ ঘুরিয়ে দেখল মেয়েকে। প্রশ্ন করা বৃথা, তবু জিজ্ঞেস করে ফেলল,— কেন?

পোষাচ্ছে না। এরা বড্ড এক্সপ্লয়েট করছে। ভাবছি নতুন কিছু করব।

কী?

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। একজন খুব ডাকাডাকি করছে।

সেটা কী কাজ?

ও আছে। দায়িত্ব নিয়ে নানান ধরনের কাজকর্ম তুলে দেওয়া। তুমি বুঝবে না।

বটেই তো, দোলা তো হাবাস্য হাবা! কিছুই তার মগজে ঢোকে না!

বিরস গলায় দোলা বলল,— তা কবে ছাড়ছ?

ঠিক নেই। আগে মাসটা তো যাক।

আবার একটা হাই তুলে তিয়া উঠে গেল। তার অলস গমনভঙ্গি দোলা দেখল একটু। ফের চাকরি বদলের বাসনা জেগেছে মেয়ের, মাকে সেই কথাই শোনাতে এসেছিল নাকি? জানানোর কি প্রয়োজন ছিল কোনও? নাহ্, মেয়ের মতিগতি বোঝা ভার।

দোলা আরও খানিক্ষণ বসে রইল টিভির সামনে। তিতানের ঘরে আলো নেবার পর পায়ে পায়ে নিজেদের কক্ষে। বিস্মিত চোখে দেখল, তুহিন এখনও ঘুমোয়নি, খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। নিঃশব্দে কানের দুল জোড়া খুলে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারে রাখল দোলা। চুলের গোড়া শক্ত করে বাঁধছে।

তুহিন উঠল। বাথরুম ঘুরে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দোলা জিজ্ঞেস করল,— কিছু বলবে?

তুহিন হাত রেখেছে দোলার কাঁধে। অল্প ঝুঁকে বলল,— তোমাকে কিন্তু আজ বেশ দেখাচ্ছিল।

দোলার কাঁধ পলকে শক্ত, ভুরুতে ভাঁজ।

হাত সরিয়ে নিল তুহিন। মুখটা আস্তে আস্তে একটা হাসিতে ভরে গেছে। স্বাভাবিকও নয়, জোর করে টানাও নয়, এ এক অন্য হাসি।

ফ্যাসফেসে গলায় তুহিন বলল,— সরি, ভুল হয়ে গেছে। আজ তো তোমার অংশুদার দিন।

আট

হন্তদন্ত পায়ে কলেজ থেকে বেরোচ্ছিল তিতান। আচমকা পল্লবের মুখোমুখি। তীর্থঙ্কর, রাজ্যশ্রীদের জটলায় ছিল, তিতানকে দেখে এগিয়ে এসেছে। প্রায় পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বলল,— দাঁড়া দাঁড়া, খ্যাপা পাগলের মতো ছুটছিস কোথায়?

তিতান মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,— কাজ আছে। দেরি হয়ে যাবে।

আজ তুই ক্লাস-টেস্টে বসলি না যে বড়?

ছিল নাকি আজ? তিতানের চোখ পিটপিট,— ও হ্যাঁ, এন-পির আজ নেওয়ার কথা ছিল বটে।

ওরকম ডোন্ট কেয়ার ভাবে বলছিস কেন? বসলে তো তোরই লাভ, প্রিপারেশনটা ঝালিয়ে নিতিস। পল্লবের গলায় গার্জেনি সুর,— তোর অ্যাটিচিউডটা আমি বুঝছি না সায়র। ক্লাসটাস করা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিস। এরপর তো নন-কলেজিয়েট, ডিস-কলেজিয়েট হয়ে যাবি।

ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় বসায় ব্যাগড়া দেবে? কে? প্রিন্সিপাল?

কেন, পারে না?

তিতান হাসল মনে মনে। অত সোজা? দেখুক না প্রিন্সিপাল চেষ্টা করে, খাবে ওপর থেকে কড়কানি...। ওপর বলতে অবশ্য ঠিক কী বোঝায়, সে সম্পর্কে তিতানের এখনও সম্যক ধারণা নেই। তবে সেটা যে সাংঘাতিক শক্তিশালী কিছু, প্রায় ভগবানেরই সমগোত্রীয়, এটুকু তিতান আন্দাজ করে নিয়েছে। সুতরাং তুচ্ছ এক প্রিন্সিপাল, যে কিনা পার্টির দাক্ষিণ্যে একটা বড়সড় ঘর আর একখানা পুরু গদি-আঁটা চেয়ারে বসার সুযোগ পেয়েছে, এবং প্রতি মুহূর্তে পার্টির ভয়ে থরহরি কম্পমান, তাকে নিয়ে ভাবিত হওয়া তিতানের সাজে না।

মুখে অবশ্য অতটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করল না তিতান। এটাও পল্টুদার শিক্ষা। বিনয় দেখিয়েই নাকি নিজের ওজনটা বোঝাতে হয়।

পল্লবের কাঁধে হাত রেখে তিতান বলল,— ও নিয়ে ভাবিস না। ম্যানেজ হয়ে যাবে।

সরি, সরি। তুই তো এখন অনেক বড় জায়গায় নাড়া বেঁধেছিস। পল্টুদা তোকে চোখে হারায়...!

শ্লেষটা পছন্দ হল না তিতানের। আবার একটু একটু উপভোগও করল যেন। সায়র মিত্র যে এখন নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়, তার ওপর পার্টির বিশেষ নেকনজর আছে, এটা পল্লব জানে। শুধু পল্লব কেন, ইউনিয়নের সব কর্তাই...।

পল্লবকে পালটা ঠোক্কর দেওয়ার জন্য তিতান স্বরে গাম্ভীর্য আনল,— তুই কাকে টিজ করছিস? আমাকে? না পল্টুদাকে?

কাউকেই নয় রে। পল্লবের স্বর সহসা নরম। তিতানের হাতটা ধরে বলল,— রাগ করিস না সায়র, তোকে কয়েকটা কথা বলি। পল্টুদা যত বড় নেতাই হন, যত শক্তিশালীই হন, তিনি আমার বন্ধু নন। কিন্তু তুই আমার বন্ধু। এটা মানিস তো?

মানি।

বন্ধু হিসেবেই তা হলে জিজ্ঞেস করি, তুই কি ঠিক করছিস?

কী? কোনটা?

দ্যাখ সায়র, পার্টির কাজ আমিও করি। আই মিন, ইউনিয়ন থেকে তো আমি দূরে নেই। টুকটাক খাটি, মিটিং-মিছিলে যাই, অমিতদা বরুণদা ক্লাসে কিংবা গেটে লেকচার দিলে পাশেই থাকি...। তা বলে সব কিছু ছেড়ে পার্টি পার্টি করে মাথা খারাপ তো আমি করছি না। কারণ, এদের ছুঁয়ে থাকা ভাল। ফিউচারে কাজে লাগতে পারে। কিন্তু..সারাক্ষণ এই পার্টি, ইউনিয়ন... দিস ইজ নট মাই কাপ অব টি।

হতেই পারে। এটা তোর আউটলুক। ...তো?

তোর আউটলুকও এমন কিছু আলাদা নয়। তোকে তো একটু একটু চিনেছি...। বুকে হাত দিয়ে বল তো, তুই আমি কেউ নীতি-আদর্শের টানে এসেছি? ইনফ্যাক্ট, এদের কোনও নীতি-ফিতি আছে কিনা, তাও কি আমরা জানি ঠিকঠাক?

আমি জানি। আমি তো পড়াশুনো করছি। পার্টির ক্লাস অ্যাটেন্ড করব।

তাতেই সব বুঝে যাবি? ...ওরে গাড়োল, পার্টি একটা খাঁচা। ঢুকে পড়লেই ব্যস, আটকে গেলি। লিডার ক'টা হয়? সবাই ক্যাডার থাকে, এবং ক্যাডারই থাকে। ওপরে উঠতে গেলে এক্সট্রা এলেম লাগে। হয় পড়াশুনো, নয় জবান চালানোর কায়দা, নয় তো প্যাঁচোয়া বুদ্ধি। কোনওটাই তোর নেই। চেষ্টা করলে একমাত্র লেখাপড়াটার কিছু উন্নতি করতে পারবি, বাকিগুলো তোর হবে না রে। ...বরুণদাকেই দ্যাখ না। পরীক্ষায় গাড্ডু, সর্বক্ষণ গাঁকগাঁক চেঁচায়,

মাথাটাও নিরেট। তুই লিখে রেখে দে, দশ বছর পরেও বরুণদা ক্যাডার হয়েই পড়ে থাকবে, আর কোনও একটা লিডারের পায়ে পায়ে চামচা হয়ে ঘুরবে। তখন স্রেফ ওকে কোনও উঞ্ছবৃত্তি বা খাবলে-খুবলে খাওয়ার লাইন ধরিয়ে দেবে, নয়তো ওকে দিয়ে বোমা বাঁধাবে।

গাড়োল শব্দটা কানে আসার পর থেকে তিতান চিড়বিড়িয়ে জ্বলছিল। বিনয়ী থাকার উপদেশ ভুলে রুক্ষ স্বরে বলে উঠল,— তুই দেখি খুব বেশি বুঝে গেছিস?

না রে সায়র। বুঝি না বলেই তো সাবধান থাকতে চাই। তোকে বন্ধু ভাবি, তাই তোকেও সতর্ক করতে চাইছি।

লম্বা লম্বা জ্ঞান মারিস না। আমারটা আমাকেই ভাবতে দে। তিতান তাচ্ছিল্যের সুরে বলল,— যত্ত সব পেটি বুর্জোয়া মেন্টালিটি।

ওয়ার্ডটা তা হলে শিখে গেছিস? পল্লবের ঠোঁটে ছেঁড়া হাসি,— ওই শব্দটা কিন্তু আমি বাড়িতে জন্ম থেকেই শুনছি। পার্টি এক সময়ে আমার বাবাও করত রে। বাহাত্তরের ইলেকশনে পোলিং এজেন্ট ছিল। ভোটের পর দিনই ডান্ডা খেয়ে বাড়িছাড়া হতে হয়েছিল বাবাকে। তিন মাস পাড়ায় ঢুকতে পারেনি। সেই লোক এখন পার্টির নাম শুনলে থুতু ছেটায়। ভোটটা এখনও ওই বাক্সেই দেয়, কিন্তু গালাগাল দেয় সারাক্ষণ। বলে, শালা ঠিকাদার প্রোমোটারগুলো পার্টিটাকে কিনে নিল! ...পল্টুদার ভাইয়েরও কনস্ট্রাকশন বিজনেস আছে না?

তুই কী মিন করছিস? পল্টুদা ডিজঅনেস্ট? চোর?

যাহ্, আমি কি তাই বললাম? পল্লব যেন খানিকটা গুটিয়ে গেল। ফের হাত রেখেছে তিতানের কাঁধে,— এটা জাস্ট বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। তুই আবার গিয়ে সবাইকে গল্প করিস না। জাস্ট তোর ভাল চাই বলেই...

থ্যাঙ্ক ইউ। পল্লবের হাত আস্তে করে নামিয়ে দিল তিতান। বিকারহীন মুখে বলল,— তোর ডায়ালগগুলো আমার মাথায় থাকবে। ...এবার যাই?

কোথায় যাবি এখন?

সেটা তোর না জানলেও চলবে।

শ্রেয়াকে আজ কলেজে দেখলাম না...। পল্লব বুঝি লঘু করতে চাইছে বাতাবরণ। ইয়ার্কির সুরে বলল,— আজকাল তোরা বাইরেও অ্যাপো করছিস নাকি?

করতেই পারি।

খেলি চুমুটুমু?

তিতান জবাব দিল না। চোয়াল শক্ত সামান্য।

পল্লব চোখ টিপল,— মনে আছে তো...ফার্স্ট কিসটা... আমার নামে...?

এক কুচি অবজ্ঞা ছুড়ে দিয়ে পল্লবকে পেরিয়ে এল তিতান। বাসস্টপে এসে ঘুরে তাকাল। পল্লব পানের দোকানে, সিগারেট কিনছে। একটা সাদা কাঠি ঠোঁটে চেপে দড়ির আগুন তুলে ধরাল। ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে তিতানকেই দেখছে আড়ে আড়ে।

তিতান দৃষ্টি সরিয়ে নিল। খুব বাড় বেড়েছে পল্লবটার। আগেও একদিন বাণী ঝাড়ছিল, তিতান পাত্তা দেয়নি। আজ পল্টুদার নামে আজেবাজে বলল...! পল্টুদার ছেলে বেঙ্গালুরুতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তো, তাই অনেকেরই চোখ টাটায়। আশ্চর্য, পল্টুদা পার্টির হোলটাইমার বলে তার ছেলের ইঞ্জিনিয়ার বনার রাইট নেই? আর ভাই যদি দাদার ছেলের পড়ার খরচ জোগায়, সেটা কী এমন দোষের? দুনিয়ার সব ভাই তো তিতানের কাকামণির মতো সেলফিস নয়! তা ছাড়া সব্বাই জানে, পল্টুদার ভাই সিভিলে ডিপ্লোমা। সে বাড়িঘর রাস্তাঘাট বানাবে না তো কি হরিসংকীর্তনের দল খুলবে? বোঝাই যাচ্ছে, পল্লবের মতো মালরাই এইসব অপপ্রচারের শরিক। দেবে নাকি একটা বাঁশ? বরুণদার সম্পর্কে যা কপচাল, জানতে পারলে বরুণদা পুরো সেঁকে দেবে পল্লবকে। ...কী হারামি ছেলে, মুখে বলছে বন্ধু, ওদিকে গ্যাস খাইয়ে তাকে পার্টি থেকে বার করে আনতে চায়! আসলে দেখছে তো, তিতান কেমন চড়চড়িয়ে উঠছে... কথায় কথায় এখন জেলা নয়, ছাত্রফ্রন্টের রাজ্য কমিটি থেকে ডাক পড়ে তিতানের...ব্যাটা তাই জ্বলছে, লুচির মতো ফুলছে! ফোল শালা, তিতান এক্ষুনি এক্ষুনি খার খাবে না। পল্লব যতই প্রতিক্রিয়াশীল হোক, বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবে তিতান। যতক্ষণ সম্ভব। তবে নজর রাখতে হবে ছেলেটার ওপর। এতই যদি পার্টিকে অশ্রদ্ধা, ইউনিয়নে আসা কেন? ফুস করে বাপের একটা গপ্পো ছেড়ে দিলি! নির্ঘাত বাপটাও পল্লবের মতোই ধান্দাবাজ ছিল। ক্যালি নেই, কলকে পায়নি, এখন গাল পেড়েই তার সুখ। হাহ্!

বাসে উঠে শ্রেয়ার কথা মনে পড়ল তিতানের। কাল রাত্রে ফোনে বলেছিল, আজ আসছে না। কারণ জিজ্ঞেস করতেই খিলখিল হাসি,

মোবাইলে যেন জলতরঙ্গ বাজছে। কোথথেকে যে এত হাসি আসে মেয়েদের কে জানে! পল্লবের কী আস্পর্ধা, বলে প্রথম চুমুটা ওর নাম করে খেতে! তুই যখন রুমির ইয়েতে হাত বোলাবি, তখন কি সেটা তিতানের নামে...? হুঁহ্, যত্ত সব! শ্রেয়াটাকে অবশ্য এখনও সেভাবে বাগে পাওয়া যায়নি। তবে চুমুর অভিজ্ঞতায় শ্রেয়াই তার জীবনে প্রথম হবে না। গৈরিকা তাকে একটা চুমু খেয়েছিল। এক বারই। টিউটোরিয়াল থেকে বেরোনোর পথে, ঘুপচি বাড়ির গলিটায় দাঁড়িয়ে। এত তাড়াতাড়ি ঘটেছিল, স্বাদটা বুঝতেই পারেনি তিতান। ধুস, ওভাবে হয় নাকি? বাইরে বন্ধুরা ওয়েট করছে, এক দল নামছে সিঁড়ি বেয়ে, তার মাঝে ওরকম আচমকা...! কী মনে করে খেয়েছিল কে জানে, শৌভিকের সঙ্গে সেঁটে যাওয়ার পর তিতানকে তো আর আমল দিল না! শ্রেয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এমনটা ঘটবে না!

উঁহু, তিতান আর সেই তিতান নেই। টিকিট কেটে চেঞ্জ পার্সে রাখতে রাখতে একবার বাইরেটা দেখল তিতান। এখন তাকে পাত্তা না দেওয়া অত সহজ নয়। তা সে শ্রেয়া কেয়া খেয়া, যেই হোক না কেন। তিতান এখন বিশেষ কেউ। এই যে সে এখন ছাত্রফ্রন্টের রাজ্য কমিটির অফিসে চলেছে, স্বয়ং সহ-সভাপতির ডাক পেয়ে, খুব সাধারণ ছাত্র হলে কি এটা সম্ভব ছিল?

বছর চার-পাঁচ আগে জোন অর আর্কের গল্প পড়েছিল তিতান। জোন নিজেকে মনে করত 'চোজেন ওয়ান', ঈশ্বরই নাকি কিছু কাজ করার জন্যে তাকে নির্বাচিত করেছে। বিপদ, আপদ, শত্রুর শক্তি, পরিণামের আশঙ্কা, কিছুই মাথায় না রেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধে। তিতানও যেন নিজেকে সে রকমই কিছু একটা ভাবে ইদানীং। পার্টি ঈশ্বর না হোক, ঈশ্বরের সমতুল্য তো বটে। সর্বশক্তিমান, জল-স্থল-আকাশ সর্বত্র বিরাজমান এক অপ্রাকৃত শক্তির প্রায় সমকক্ষ। সেখানে যদি তিতানকে বিশেষ চোখে নাই দেখা হয়, কেন বারবার সমীরণদা জিজ্ঞেস করবে, তুমি কথাগুলো সব বুঝতে পারছ তো সায়র? ...লক্ষ্য আমাদের স্থির আছে, বিপ্লব একদিন আসবেই। তবে সেখানে পৌঁছোতে এখন নানান পন্থা অবলম্বন করতে হতে পারে। কখনও কখনও মনে হবে, পথগুলো যেন আমাদের নীতি আদর্শের সঙ্গে মিলছে না। তবে তাতে ঘাবড়িও না। এগুলো স্রেফ রণকৌশল। যাদের জন্য লড়াই, প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও হয়তো প্রয়োজন হল। অথবা আপস করতে হল বুর্জোয়া বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে। পার্টির একনিষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে তখন

দুর্বল হয়ে পোড়ো না যেন। আরও কয়েক জন থাকে পাশে, তবু তিতান ভাবে শুধু বুঝি তার উদ্দেশেই বলা হল কথাগুলো। যেন তিতানকেই খানিকটা ক্ষমতা দিয়ে দিল ক্ষমতাবানরা। অতএব আশপাশের প্রত্যেকের কাছেই তিতানের একটা বাড়তি মূল্য প্রাপ্য হয়েছে, নয় কি?

ছাত্রফ্রন্টের রাজ্য অফিস তালতলায়। তিতান পৌঁছে দেখল, শঙ্খদা গল্প করছে বসে। তাকে পেয়েই যুতে দিল কাজে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রফ্রন্টের চাঁদা এসেছে, অঞ্চল ধরে ধরে হিসেব লিখতে হবে খাতায়। সঙ্গে স্কুলের নাম, কলেজের নাম...। এই সব নীরস কাজও এখন নেশাগ্রস্তের মতো করে তিতান। এ তো শিক্ষানবিশি, উত্তরণের প্রথম ধাপ। আজ কাজের মাঝে হঠাৎ পার্টির এক বড় নেতা হাজির। বহুকাল আগে তিনি ছিলেন ছাত্রফ্রন্টের পয়লা নম্বর নেতা, এখন দলীয় সংগঠনের এক স্তম্ভ। চাইলেই নাকি মন্ত্রী হতে পারেন যখন তখন, হন না। রাজ্যের প্রতিটি কোণে দলকে ছড়িয়ে দেওয়াই নাকি তাঁর ব্রত। বেঁটেখাটো বক্সার টাইপের চেহারার নেতা অফিসে পা দেওয়ামাত্র তাঁকে ঘিরে ভিড় আর উচ্ছ্বাস। সহ-সভাপতি শঙ্খশুভ্র চৌধুরী তো বটেই, সম্পাদক আর সভাপতিও হাত কচলাচ্ছে। তিতান উঠে সামনে যাওয়ার সাহস পাচ্ছিল না, তিনিই এলেন তিতানদের টেবিলে। তিতানেরই পিঠ চাপড়ে বললেন, বাহ্, বাহ্, ভারী নিষ্ঠাবান কমরেড পেয়েছ তো তোমরা!

তিতান গদগদ। আরও বেশি ডুবেছে কাজে। কানে আসে টুকরো টাকরা অমৃতভাষণ, কিংবা দরাজ হাসি, অথবা চোরা ফিসফাস, সঙ্গে টেবিলে মুড়ি-শিঙাড়া, মুহুর্মুহু চা...! আগে যে-ক'দিন এসেছে এখানে, অফিসটা ফাঁকা ফাঁকাই ছিল, কিন্তু আজ যেন স্বপ্নের পরিবেশ। আড্ডা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না তিতানের। অবশেষে যখন বেরোল, বেশ রাত হয়েছে।

তিতান বাড়ি ফিরল প্রায় দিব্যোন্মাদ দশায়। বাবা রাউরকেল্লায়, কোনও জবাবদিহির দায় নেই, মেজাজ তাই আরও ফুরফুরে।

কিন্তু কী কপাল, মা আজ বাবার ভূমিকায়!

দোলা গোমড়া গলায় জিজ্ঞেস করল,— তোর ব্যাপারখানা কী, অ্যাঁ? ফের আজ সাড়ে দশটা?

তিতান কাঁধ ঝাঁকাল,— ফোনে তো বলে দিলাম, দেরি হবে!

ব্যস, জানিয়ে দিলেই বুঝি চুকে গেল? পরীক্ষার দেড় মাসও বাকি নেই, পড়াশুনো শিকেয়, সারাক্ষণ কী সব হাবিজাবি কাগজ ঘাঁটছ...!

হাবিজাবি বলবে না। ওগুলো পার্টির লিটারেচার। পড়তে হয়।

নিকুচি করেছে তোমার পার্টির লিটারেচার। ওসব এবার বন্ধ করো। টিউটোরিয়ালেও তো বোধহয় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ! বাবা এতগুলো টাকা খরচ করে ভরতি করে দিল...

টাকার খোঁটা দেবে না। তিতানের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। নাকমুখ নেড়ে বলল, —আমি কি বলেছিলাম ভরতি করতে?

কেন করেছিল তার তুমি কী বুঝবে? তোমার যেটুকুনি কাজ, সেটুকুনিই করো দয়া করে। পড়াশুনো করে আমাদের উদ্ধার করো।

আমাকে নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ফিউচার আমি গড়ে নেব।

হুঁহ্, ফিউচার গড়বে! পাস্ট যেন দেখিনি, প্রেজেন্ট যেন দেখছি না...!

স্বপ্ন থেকে বাস্তবে আছড়ে পড়ে তিতান যেন হাঁসফাঁস করছে। তার সঙ্গে এভাবে উপহাসের সুরে কথা বলে মা? সায়র মিত্রর সঙ্গে?

ক্রুদ্ধ মুখে তিতান বলল,— আটভাট কমেন্ট করবে না মা। আমি কিন্তু লাইক করছি না।

তর্কাতর্কির মাঝে তিয়া কখন বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। হঠাৎই তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠেছে,— তুই কী লাইক করিস, ডিসলাইক করিস, তাতে আমাদের ঘেঁচু। সামনে পরীক্ষা, পড়বি, ব্যস আর কোনও কথা নয়।

তিতান দপ করে জ্বলে উঠল। দিদির আজকাল বহুত ফাঁট বেড়েছে। চাকরি করার পর থেকেই খুব এয়ার নিয়ে চলত, গাড়ি বিক্রি ছেড়ে কী এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট শুরু করে মাটিতে যেন পা পড়ছে না এখন! এক ফাটিয়ালের সঙ্গে মোটরসাইকেলে দু'দিন দেখেছে তিতান, নেহাতই কৌতূহলে জিজ্ঞেস করেছিল, ওই লাল হেলমেটটা কে রে... সঙ্গে সঙ্গে থাপ্পড়ের মতো জবাব, নিজের চরকায় তেল দে!

দিদির উত্তরটাই আজ দিদিকে ফেরত দিল তিতান,— আমি কী করব, না করব, সেটা আমার ব্যাপার। তুই নিজের চরকায় তেল দে। একদম নাক গলাবি না। বলেই মা'র দিকে আঙুল,— তুমিও না।

দোলা হতবাক। তিয়া চেঁচিয়ে উঠল,— তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর বুকনি শুনছ মা? দুমদুম পিঠে দু'ঘা কষিয়ে দিতে পারছ না?

তিতানের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। যে পিঠে স্বয়ং তিনি হাত বুলিয়ে গেছেন, সেই পিঠে কিল মারতে বলে দিদি? প্রায় বুনো জন্তুর মতো তিয়ার দিকে তেড়ে যাচ্ছিল তিতান, দোলা খপ করে তার হাত চেপে ধরেছে। স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে গর্জে উঠল,— তুই নিজেকে কী ভাবিস, অ্যাঁ? একদম বখে গেছিস তুই। একদম।

দু'-চার সেকেন্ড রাগে অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিতান। তারপরই বিস্ফোরিত হয়েছে। মেঝেতে পা ঠুকে বলল,— বেশ করছি বখে যাচ্ছি, হাজার বার যাব। আমার যেভাবে খুশি, সেভাবে চলব। তোমরা যা পারো, করে নিয়ো।

চোপ। তোর মুখ আমি ভেঙে দেব।

দাও। দেখি তোমার কত বড় হিম্মত!

শরীর শক্ত করে তিতান দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। যেন পরখ করছে মা'র ক্ষমতার দৌড়। দুপদাপিয়ে ঘরে ঢুকে যাওয়ার আগে একখানা হুংকার ছেড়ে গেল, প্রায় বাবারই গলায় —সাফ সাফ বলে দিচ্ছি, সায়র মিত্রকে ঘাঁটাতে এসো না, ভাল হবে না।

বিছানায় দড়াম শুয়ে পড়েছে তিতান। প্যান্টশার্ট না বদলেই। মাথায় কে যেন হাতুড়ি ঠুকছে। দুনিয়াসুদ্ধু লোক যার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলে, তাকে কিনা বাড়িতে এই ভাষা গিলতে হয়? তিতানের ভবিষ্যৎ তিতানের চেয়ে বেশি কে বোঝে? মা? বাবা? দিদি? ফুঃ।

কতক্ষণ শুয়ে আছে, তিতান জানে না। মা একবার খাওয়ার জন্য ডেকে গেল, শুনেও শুনল না। দিদির আর মা'র ঘরের আলো নেবার পর উঠে গিয়ে দেখল তার খাবারটা ঢাকা রয়েছে টেবিলে। খিদে বড় আপদ, ঠান্ডা রুটি তরকারি চিবোল কচকচ। সঙ্গে ঢকঢক এক বোতল ঠান্ডা জল। আশ্চর্য, খিদে কমতে মাথাও জুড়োল খানিকটা। একটু একটু অনুতাপও জাগছে যেন। সে কি মা'র সঙ্গে খুব কুৎসিত ব্যবহার করল? কেন তাকে চটিয়ে দিল এরা? মা আর দিদি কেন বোঝে না, তিতান এখন তিতান নয়, সে সায়র মিত্র!

রাতে ভাল ঘুম হল না তিতানের। পর দিন সকালেও বিছানায় পড়ে রইল চুপচাপ। উঠে একবার ব্রেকফাস্ট সেরে আবার গড়াচ্ছে। কলেজও গেল না শেষ পর্যন্ত। পরের দিনও না। মা শুকনো মুখে ঘুরছে, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছে না। কত অজস্র বার যে ভাবল তিতান, একবার সরি বললেই তো হয়।

তিতান একটু জড়িয়ে ধরলেই গলে যাবে মা। কিন্তু পারল কই? সায়র মিত্র ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে মধ্যিখানে! সমানে যে তর্জনী নাচাচ্ছে, মা-ই বা অত জেদ ধরে থাকবে কেন? দুটো নরম কথা বললে, ছেলের গায়েমাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলে কী ক্ষতি হয়! মা যদি ছেলের ওজন না বোঝে, ছেলের কীসের দায় মা'র মানভঞ্জনের!

অচলাবস্থা কাটল তৃতীয় দিন। তবে অন্যভাবে। বাড়িতে মোবাইল পুরো বন্ধ রেখেছিল তিতান, গেমস খেলতেও খোলেনি দু'দিন। তৃতীয় সকালে সুইচ অন করতে না করতেই শ্রেয়া। ওত পেতে ছিল সম্ভবত, কখন তিতানের মোবাইল প্রাণ পায়!

কী রে, তুই কোথায়? পাচ্ছি না কেন তোকে?

তিতান কষটে গলায় বলল,— বাড়িতেই আছি।

শরীর খারাপ?

ওই রকমই। ..কেন?

আজ তো লাস্ট ডে, ক্লাস সাসপেন্ড হয়ে যাচ্ছে... আসবি না?

ভাবছি।

প্লিজ আয়। এরপর তো কতদিন দেখা হবে না।

তিতান দুলে গেল। দু'-দুটো দিন স্বেচ্ছাবন্দি থেকে শরীর মন হেজে গেছে। বাড়ির এই গুমোট আর পোষাচ্ছে না। কমরেডরাও নিশ্চয়ই তার খোঁজ করছে। তার ওপর হের্ তুহিন মিত্র বোধহয় ফিরছেন আজ, এমন দরকচা মেরে পড়ে থাকলে তিনি আবার কী হল্লা জোড়েন!

কেঠো মুখে খাওয়া সেরে রওনা দিল তিতান। কলেজে ঢোকামাত্র ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্ন, রাশি রাশি কৌতূহল...। ঠোঁটে একটা ইলাস্টিক হাসি ঝুলিয়ে তিতান সামাল দিল কোনওক্রমে।

শ্রেয়া তাকে ধরল দেড়টা নাগাদ। থার্ড পিরিয়ডের পর। সবে তখন পরিবেশবিদ্যার ক্লাস সেরে তিতান ক্যান্টিনে যাচ্ছে।

ঝপ করে হাতটা ধরল শ্রেয়া। চোখ কুঁচকে বলল,— নাহ্, জ্বর তো নেই!

ভেতরটা এখন তেতো, তবু তিতান হাসল,— আমি কি বলেছি জ্বর হয়েছে?

তা হলে? কী হয়েছিল তোর?

এমনিই... গা ম্যাজম্যাজ করছিল। তা ছাড়া ভাবলাম তোদের কাছে একটু ভাও বাড়াই...

অজুহাতটা ঠিক যেন বিশ্বাস করল না শ্রেয়া, ভুরু কুঁচকেই আছে। এ-দিক ও-দিক দেখল একটু। গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল,— তোর এখন ক্লাস আছে?

সেই সওয়া তিনটেয়। কম্পালসারি ইংলিশ।

ফুঃ, ওটা আবার একটা ক্লাস নাকি? পনেরো নাম্বার তো হল কালেকশনেই জুটে যায়। চোখে একটা মদির ভাব আনল শ্রেয়া,— চল না, কাটি।

কোথায় যাবি? পলকের জন্য মা'র সে দিনের শাসন মনে পড়ে গেল তিতানের। গম্ভীর মুখে বলল,— আজ আমার টিউটোরিয়াল আছে।

ক'টায়?

সাড়ে পাঁচটায়।

তার আগেই চলে আসবি। তিতানের হাতে অল্প চাপ দিল শ্রেয়া,— চল রাস্তা-ঘাটে কী ঘুরব, আমাদের বাড়ি যাই চল।

তিতান ঈষৎ কেঁপে গেল,— তোর মা তো... এখন অফিসে...?

তো? আড্ডা তো মারব আমরা দু'জন, মা থেকে কী করবে? শ্রেয়া বিচিত্র মুদ্রা ফোটাল চোখে,— তোর কি ভয় করছে?

তা একটু একটু করছে বই কী। শূন্য বাড়ি, শুধু তিতান আর শ্রেয়া...! কিন্তু কমরেড সায়র মিত্র মুখ ফুটে ভয়ের কথা উচ্চারণ করতে পারে কি? মুখে একটা উদাসীন ভাব ফুটিয়ে তিতান বলল,— তা কেন? যেতেই পারি।

শ্রেয়াদের বাড়ি সেলিমপুরে। ছোট্ট দোতলা বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকে শ্রেয়ারা। বাবা, মা, মেয়ে, তিন জনের কাছেই চাবি মজুত, কারও ঢোকা-বেরোনোর অসুবিধে নেই।

বাড়িতে এসেও শ্রেয়ার কোনও আড়ষ্টতা নেই। লঘুপায়ে নিজের ঘরে ব্যাগ রেখে এল। জিজ্ঞাসা করল,— খাবি কিছু? আমি কিন্তু কফি বানাতে পারি।

না, থাক।

কোল্ড ড্রিঙ্কস? শ্রেয়া মুচকি হাসল,— হার্ড ড্রিঙ্কসও আছে। তবে দেওয়া যাবে না। বোতল সিলড।

ধুস্, আমি ওসব খাই না। তুই ঠান্ডাই আন।

শীতল পানীয়ের বড় একখানা বোতল বার করে আনল শ্রেয়া। দুটো গ্লাসও। সফেন তরল ঢালতে ঢালতে বলল,— তুই কোনওদিন হার্ড ড্রিঙ্কসে চুমুক মারিসনি?

মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠল বাবার মুখখানা। মদ খেয়ে চোখ লাল, মাকে দাবড়াচ্ছে। শুধু বাবাকে দেখে দেখেই যে সুরার প্রতি তিতানের অনীহা, এ কথা কি শ্রেয়াকে বলা যায়?

চোখে একটা বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে তিতান বলল,— নেভার। আই হেট হার্ড ড্রিঙ্কস।

শ্রেয়ার হাত থেমে গেছে। তিতানের গালটা নেড়ে দিয়ে বলল,— ওরে আমার সুইটি সুইটি দিঘির জল রে...! তোকে আমায় কত কিছু যে শেখাতে হবে। এরপর হয়তো বলবি, কখনও কোনও মেয়েকে চুমুও খাসনি!

তিতান ঢোক গিলে বলল,— খাইনি, বিশ্বাস কর। ...তুই?

কঅঅত। রোজ তো মিনিমাম দুটো করে খাই। বলেই তিতানের হতভম্ব মুখটার দিকে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে রইল শ্রেয়া। তারপর সেই শরীর কাঁপানো হাসি। কোনওক্রমে দম নিয়ে বলল,— ওমনি জেলাস হয়ে পড়লি তো। একটা বাপি, একটা মা। খুশ?

তিতান স্বস্তির শ্বাস ফেলল। তবে কেন যে স্বস্তি, ঠিক বুঝতে পারল না। দুটো-চারটে চুমু যদি কাউকে খেয়েও থাকে, শ্রেয়ার ঠোঁট দুটো তো ক্ষয়ে যায়নি! তবু ওই জানাটাতেই যেন এক ধরনের সুবাতাস বয়ে গেল।

তিতান কোল্ড ড্রিঙ্কসের গ্লাস হাতে তুলেছে। চোখ ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল,— সত্যি তোর বাপি বিড়ি খায়?

হ্যাঁ। কেন?

বাড়িটা দেখে বোঝাই যায় না। যা টিপটপ সাজানো।

সে তো মা'র কেরামতি। ঘরে কোথাও এক কণা ধুলো থাকলেও ঠিক হক-আইতে ধরা পড়বে।

আমার মা-টা এত গোছানো নয়। কেমন হ্যালহ্যাল ঝ্যালঝ্যাল। বরং দিদি অনেক বেশি নিট অ্যান্ড ক্লিন। নিজের ঘরটা এমন সুন্দর সাজিয়ে রাখে...

অ্যাই ছেলে, শুধু ফ্যামিলির গল্প করব নাকি? আমাদের কোনও গল্প নেই?

শ্রেয়ার চোখ দুটো কেমন জ্বলজ্বল করছে। ঠান্ডা পানীয়ে চুমুক দিয়েও তিতানের গলা শুকনো হঠাৎ। সে যে কমরেড সায়র মিত্র, তা যেন আর খেয়াল নেই। অস্ফুটে বলল— কী গল্প করব?

নরম সোফায় বসা শ্রেয়া ঝপ করে অনেকটা এগিয়ে এল। দু'হাতে তিতানের গলা বেড় দিয়ে বলল,— তুইই বল।

তিতানের বুক ধড়াস ধড়াস,— ক্‌ক্‌ক্‌কী বলব?

দরকার কী কথার? শ্রেয়ার ঠোঁট এগিয়ে এল। চেপে ধরেছে তিতানের ঠোঁটে। তুলতুলে এক জোড়া বুকের চাপ অনুভব করছিল তিতান। আপনাআপনি তিতানের হাত দুটো আঁকড়ে ধরল শ্রেয়াকে। খুলে গেছে ঠোঁট জোড়া...। কী পান করছে তিতান? অমৃত? তিতানের হাত আর স্থির থাকছে না, ঘুরছে আকুল আর্তি নিয়ে। পেলব স্তনে এসে থামল হাত...

আচমকাই মুখটা সরিয়ে নিল শ্রেয়া। হিহি হেসে উঠেছে,— এই, যাহ্‌... আমার কাতুকুতু লাগছে।

চমকে শ্রেয়াকে ছেড়ে দিল তিতান। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কমরেড সায়র মিত্র, বি-কম, ফার্স্ট ইয়ার, এখন স্রেফ শ্রীমান ভ্যাবলাকান্ত।

শ্রেয়া দুলছে মৃদু মৃদু। সাপিনির মতো কি? নাকি বেতসলতা? ওই সামান্য দুলুনিতেই কেন ঘোর লাগে চোখে?

ফিসফিস করে শ্রেয়া বলল,— দেখবি?

তিতান ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল,— কী?

যা দেখতে চাইছিস। নেকু! হি হি হি হি।

এ খেলার কোনও শেষ নেই। আবার যেন আছেও। চরম কিছু ঘটার আগেই জ্বোরো রোগীর মতো কাঁপতে থাকা তিতানকে হটিয়ে দিল শ্রেয়া। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে ফেলল চটপট। তিতানের হাঁটু কাঁপছিল। সর্বাঙ্গ দিয়ে তাপ বেরোচ্ছে যেন। শ্বাস পড়ছে ঘনঘন। তীব্র এক মাদক ছড়িয়ে গেছে রক্তে, উদ্ধত পৌরুষ কঠিন থেকে কঠিনতর। শ্রেয়ার দু'কাঁধ চেপে ধরল তিতান। হিসহিসিয়ে বলল,— কী হল, থামিয়ে দিলি কেন?

শ্রেয়া জোরে জোরে মাথা নাড়ল,— না না, আজ নয়। আর একদিন।

কেন নয়? ক্ষণপূর্বের সংকুচিত তিতান বদলে গেছে সায়র মিত্রে। না শোনার অভ্যেস যে দ্রুত ঝেড়ে ফেলছে। গরগরে গলায় কমরেড সায়র মিত্র বলল,— আজই চাই।

শ্রেয়া ভেসে গেল কিনা সে তথ্য নিষ্প্রয়োজন। হয়তো বা তেমন অনিচ্ছাও ছিল না শ্রেয়ার। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে নেই, কমরেড সায়র মিত্র হওয়ার পথে একটা বড় ধাপ এগিয়ে গেল তিতান।

নয়

স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচ-সাতের রাস্তা। সরু খালের ওপর ছোট্ট সাঁকো পেরিয়ে খোলা মাঠে ছড়ানো-ছেটানো কিছু বাড়িঘর। কোথাও গুচ্ছ গুচ্ছ, কোথাও বা খানিক তফাতে তফাতে। তার মাঝে একখানা বড়সড় ঘেরা জায়গা। গেটে সাদাকালো সাইনবোর্ড—হ্যাপি হোম।

গরম পড়েছে বটে এ বছর। শেষ বৈশাখের প্রখর তাপে পুড়ছে পৃথিবী। কালবৈশাখীও হয়নি বড় একটা, সূর্যের তেজ বেড়েই চলেছে দিনদিন। কবে যে এই দাবদাহ কমবে!

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে তিয়া ছাতা বন্ধ করল। পাশেই প্লাস্টারহীন বড়সড় ঘর একখানা। হ্যাপি হোমের অফিসরুম। সামনে চন্দন রং মারুতি ভ্যান দাঁড়িয়ে। গাড়িতে হেলান দিয়ে বছর সতেরো-আঠেরোর একটি ছেলের সঙ্গে নিঃশব্দে বাক্যালাপ চালাচ্ছে ইন্দ্রজিৎ। সাংকেতিক ভাষায়।

তিয়াকে দেখে ইন্দ্রজিৎ হেসে এগিয়ে এল,— আপনি সত্যি আবার এলেন তা হলে?

দোপাট্টায় মুখ মুছতে মুছতে তিয়া বলল,— বা রে, কাল তো ফোনে বললাম, যদি আজ ফ্রি থাকি তো চলে আসব।

তবু... ঠিক বিশ্বাস হয়নি। আপনি শহুরে মহিলা, গরিবের ঘোড়ারোগ দেখতে গ্রামেগঞ্জে ছুটে আসবেন...

নরেন্দ্রপুর আবার গ্রাম কোথায়! জাস্ট সাবার্ব। যাদবপুর থেকে তো ট্রেনে দশ মিনিট। তিয়া মিষ্টি করে হাসল,— আপনি দেখি আজ চাষির বেশে...! হাঁটু অবদি জিন্‌স গুটিয়েছেন, খালি পা... কোদাল চালাচ্ছিলেন নাকি?

হা হা হা। ওই সবার সঙ্গে একটু হাতে হাতে মেলানো। ইন্দ্রজিতের মুখে নির্মল হাসি,— আমি পাশে থাকলে ছেলেরা একটু এক্সট্রা ইমপেটাস পায়। ...আসুন, ভেতরে আসুন। ঘেমে নেয়ে গেছেন দেখছি!

বাহুল্যবর্জিত অফিসঘর। খান তিনেক চেয়ার, সাদামাটা টেবিল, একখানা স্টিল আলমারি আর রং-জ্বলা স্ট্যান্ড ফ্যান। একটা জনতা স্টোভ, টুকিটাকি কয়েকটা বাসন আর ওপাশের দেওয়াল ঘেঁষে ইন্দ্রজিতের ক্যাম্পখাট। ঘরে একটি জিনিসই শুধু বেমানান। কম্পিউটার। হ্যাপি হোমের হিসেবরক্ষক।

তিয়া চেয়ার টেনে বসেছে। ইন্দ্রজিৎও। বিনয়ের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ বলল,— বলুন, আপনার কী সেবা করতে পারি?

ধ্যাত, সেবা নিতে এসেছি নাকি? তিয়া জোরে হেসে উঠল,— আগের দিন তাড়াহুড়োয় বেশিক্ষণ বসতে পারিনি। অথচ জায়গাটা এত ভাল লাগছিল। তাই ভাবলাম আজ একটু সময় নিয়ে...

আমার পরম সৌভাগ্য। ...চা খাবেন তো?

কে বানাবে? নিশ্চয়ই আপনাকেই...

উপায় কী। ছেলেদের কাউকে বললে এক্ষুনি হাসিমুখে করে দেবে, কিন্তু আমি বলি না। নিজের কাজ নিজেরই তো করা উচিত। দলবলের সঙ্গে আমার দু'বেলার রান্নাটা হয়ে যায়, এই তো যথেষ্ট। বলেই উঠেছে ইন্দ্রজিৎ। স্টোভের দিকে যেতে যেতে বলল,— এই সাড়ে তিনটে-চারটের সময়ে আমারও জিভটা খুব চা চা করে। দেখুন না খেয়ে, মুখে তোলা যায় কিনা।

তিয়া চা খায় না বিশেষ। তবে এখন আপত্তি করল না। গরমে তেষ্টা পাচ্ছে খুব, যত্রতত্র জল খাওয়ার চেয়ে চা অনেক বেশি নিরাপদ। থুতনিতে হাত রেখে ইন্দ্রজিতের কার্যকলাপ দেখছিল তিয়া। উবু হয়ে পলতে তুলল স্টোভের, সসপ্যানে জল ঢালল, আগুনে বসিয়ে দিল পাত্রটা। আলমারি খুলে কাপডিশ নিয়ে গেল একজোড়া। কাপড়ে মুছছে।

তিয়ার ভারী অবাক লাগছিল। বিস্ময়টা জেগেছিল আগের দিনই, সেটা যেন বাড়ছে। মালহোত্রা অটোমোবাইলসে তার প্রাপ্য কমিশনটা দিয়ে আসার দিনই এই হ্যাপি হোম দেখানোর জন্য বেজায় পীড়াপীড়ি করছিল ইন্দ্রজিৎ। তার পরেও অন্তত বার পাঁচেক ফোন করেছে। শেষমেশ উপরোধেই ঢেঁকি গিলেছিল তিয়া। দিন দশেক আগে, তিয়ারই পছন্দ মতো সময়ে, গড়িয়াহাট মোড় থেকে তাকে তুলে ইন্দ্রজিৎ সোজা এখানে।

এসে কিন্তু তাক লেগে গেছে তিয়ার। বারো জন অনাথ বোবা-কালা ছেলে নিয়ে কী চমৎকার এক হোম বানিয়েছে ইন্দ্রজিৎ। আড়াই বিঘা জমির এক দিকে ছেলেদের থাকার বন্দোবস্ত, পাশে ছোট একটি কর্মশালা, বাকি প্রায় গোটা জমিতে সবজি চাষ হচ্ছে হরেক রকম। ছেলেরাই করছে। কর্মশালায় তাদের হাতের কাজও শেখাচ্ছে ইন্দ্রজিৎ। মোমবাতি তৈরি, গ্রিটিংস কার্ড বানানো, টুকটাক কাঠের কাজ...। লেখাপড়াতেও অবহেলা করেনি, ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল থেকে নিজেই নাকি ট্রেনিং নিয়ে যথাসাধ্য

পড়াশুনোও চালাচ্ছে ছেলেদের। এমন একটা জায়গা দেখে তিয়া আশ্চর্য না হয়ে পারে!

না, শুধু আশ্চর্য নয়, তার চেয়েও বুঝি বেশি কিছু। এক ধরনের মুগ্ধতা। ভাল লাগা। তার নিজের কাজ তো সারাক্ষণ এক যান্ত্রিক দুনিয়ায়, যেখানে সমানে ইঁদুরদৌড় আর চোয়ালে চোয়াল কষে লড়াই। টাকা আর প্রতিষ্ঠা, এ ছাড়া তো কিচ্ছু নেই সেখানে। গাড়ির শো-রুমে ছিল টারগেট, ডিসকাউন্ট, কমিশন, ইনসেনটিভ, প্রিমিয়াম, আর ঠোঁটে মেকি হাসি ঝুলিয়ে কিছু মানুষের অর্থের দম্ভ হজম করা...। এক একজন তো অবলীলায় কুপ্রস্তাব দিত, গাড়ি তো হবেই ম্যাডাম, চলুন আজ একটু ডিসকো ঘুরে আসি, অথবা কান্ট উই গো ফর আ শর্ট ড্রাইভ ম্যাম! কত কায়দা করে এড়াতে হত লোকগুলোকে। আরও খারাপ লাগে ভাবতে, যারা ওই ধরনের প্রস্তাব দেয়, তাদের বউটউরা যখন শো-রুমে এসে দাঁড়ায়, তখন তাদের চোখেও তিয়ারা সস্তা দামের মেয়েছেলে! এখনও কি পরিস্থিতিটা আমূল বদলেছে? এখন তো প্রায় স্বাধীন পেশা, সূর্যর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে তিয়া, তবু মাত্র ক'দিনেই কেমন যেন হাঁপ ধরে গেল। অনবরত ক্লায়েন্টের মন জুগিয়ে চলো, যাদের দিয়ে প্রোগ্রাম তুলতে হবে তাদের শতেক বায়নাক্কা সামলাও, কোথাও পান থেকে চুন খসলে চোখা চোখা গাল শোনো, পেমেন্টের জন্য হত্যে দিয়ে বেড়াও...! তুলনায় হ্যাপি হোম যেন এক ঝলক টাটকা বাতাস। কয়েকটা প্রতিবন্ধী ছেলে প্রাণের সুখে কাজ করছে, তাদের জীবনে দাঁড় করানোর জন্য একা লড়ে যাচ্ছে এক আদর্শবাদী মানুষ... নাহ্, এখানে না এলে তিয়া বোধহয় ভুলই করত। তার কেজো পৃথিবীর বাইরেও যে এক অন্য পৃথিবী আছে, তা তো তিয়ার জানাই হত না।

ইন্দ্রজিৎ চা এনেছে। টেবিলে কাপডিশ রেখে বলল,— নিন, আপনার অগ্নিপরীক্ষা।

আমার? না আপনার? তিয়া মিটিমিটি হাসছে,— যদি ভাল না লাগে, লাইফে আপনার হাতের চা খাব না।

অত আনাড়ি নই ম্যাডাম। তবে দুধটা নেই...

খেলে আমি লাল চা-ই খাই। ঠোঁটে কাপ ছোঁয়াল তিয়া। ছোট্ট চুমুক দিয়ে দু'-আঙুলে মুদ্রা ফুটিয়েছে,— নাহ্, পাশ করে গেলেন। অবশ্য আপনারই কাজ বাড়ল। ফের যদি আসি, আপনাকে স্টোভ জ্বালাতে হবে...

যদি কেন? আর আসবেন না?

ওরে বাবা, সময় কোথায়। নেহাত আজ সানডে, আমার পার্টনার আমায় দয়া করে ছাড়ান দিলেন...। বাক্য শেষ হওয়ার আগেই মোবাইলে গান। তিয়া মুখে ছদ্ম আতঙ্ক ফোটাল,— ও মাই গড, এ বোধহয় তারই কল!

নম্বরটা দেখে তিয়া অবশ্য নিশ্চিন্ত একটু। সূর্য নয়, লোপামুদ্রা।

কী রে, কী করছিস আজ?

একটু বেরিয়েছি রে।

রোববারও তোর কাজ? চাকরিটা ছেড়ে তা হলে কী লাভ হল?

না না, কাজ নয়। একটা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব হোমে এসেছি রে। কী সুন্দর জায়গাটা, আহা!

অনেক দূর?

কাছেই। নরেন্দ্রপুরে।

ও। ...চলে আয় না সিটি প্লাজায়। মৌমিতা, পুবালী আর লিপিও আসছে। মৌমিতা চাকরি পাওয়ার ট্রিট দিচ্ছে আজ। মুভি, ডিনার, সব আজ ওর।

বলিস কী রে? কিপটেটা রাজি হল? কলেজে তো পার্সই খুলত না।

অনেক কাণ্ড করে জপিয়েছি। প্রথমে মাল্টিপ্লেক্সে 'চিনি কম' দেখব। বুড়ো নাকি ফাটাফাটি অ্যাক্টিং করেছে। ফিল্মটা দেখে, চাইনিজ টাইনিজ খেয়ে...। আয় না, বহুকাল জমিয়ে আড্ডা হয় না।

তিয়া একটুক্ষণ ভাবল। এসেই এক্ষুনি এক্ষুনি উঠে যাওয়াটা কেমন দেখায় না? আজ এখানে খানিকক্ষণ কাটাবে বলেই তো...। বন্ধুরাও টানছে, কিন্তু..। ওদিকে সূর্যকেও তো টাইম দেওয়া... সাড়ে সাতটায়...। সূর্যকে অবশ্য সিটি প্লাজায় আসতে বলা যায়, লোপামুদ্রা মৌমিতারা তো সূর্যর অচেনা নয়...। তুত্, তাদের চার বান্ধবীর মাঝে সূর্য 'হংসো মধ্যে বকো যথা বনে যাবে না? পুরনো কোনও প্রসঙ্গে তারা হিহি হাহা করবে, মিছিমিছি বোর হবে সূর্য, পরে কাঁইকাঁই...

গলা ঝেড়ে তিয়া বলল,— না রে, ব্যাড লাক। আজ আমার হবে না।

পারবি না? দারুণ মস্তি হত কিন্তু। মৌমিতা বোধহয় ওর দাঁড়কাকটাকে নিয়ে আসবে। ওকে আজ লেগপুল করে কাঁদিয়ে ছাড়ব।

মৌমিতার তমাল কলেজে পড়ায়। ফিজিক্স। চুলগুলো খাড়া খাড়া বলে বেচারার ওই নামই চালু এখন। খেপিয়ে মজা আছে তমালকে। নার্ভাস হয়ে তোতলাতে থাকে।

কী রে, চুপ কেন? চেষ্টা করে দ্যাখ না।

আমাকে আজ বাদ দে রে। মৌমিতাকে বলিস, আমারটা ডিউ রইল।

ও আর হাত উপুড় করেছে! তুই-ই মিস করলি।

কেয়া করে ভাই? নসিব।

মোবাইল অফ করে তিয়া দেখল ইন্দ্রজিৎ দরজায়, হাতে চায়ের কাপ। সহবত জ্ঞান আছে তো লোকটার, সামনে দাঁড়িয়ে কথা গিলছে না!

তিয়া চা শেষ করে উঠে এল,— চলুন, আপনার গার্ডেনটা দেখে আসি।

হা হা হা, খেতটাকে আপনি বাগানে প্রোমোশন দিলেন? হাসতে হাসতেই টেবিলে কাপ রেখে ফিরল ইন্দ্রজিৎ,— অবশ্য বাগান বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঝিঙেফুল, লঙ্কাফুলেরও তো বাহার আছে। আর কুমড়োফুলের মতো নরম রং...

কুমড়োফুলের টেস্টও ভাল। ভাজা তো ফ্যান্টাসটিক।

অনেক ফুটেছে। দেব নাকি কয়েকটা?

এমা, ছি ছি। তিয়া তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাল,— গাড়িটা সার্ভিস দিচ্ছে কেমন?

এক্সেলেন্ট। ভ্যানরিকশায় সবজি তুলে সেই সোনারপুর নিয়ে যাওয়া ভারী ঝকমারি কাজ ছিল। খরচাও বেশি পড়ত। ছেলেরা এখন ঝপাঝপ কুমড়ো লাউ ঝিঙে পটল শসা গাড়িতে ভরে দিচ্ছে, আমি ড্রাইভ করে পৌঁছে দিয়ে আসছি। তবে সব থেকে সুবিধে হয়েছে কলকাতা যাওয়ার। ছেলেদের তৈরি মালগুলোর মধ্যে অনেক ডেলিকেট জিনিস থাকে তো, ট্রেনে বেশ প্রবলেম হত। এখন তো গড়িয়াহাটের দোকানে পৌঁছে দেওয়া জলবৎ তরলং।... তার থেকেও বড় সুবিধে কী হয়েছে জানেন... আপনাকে তো আগের দিন বলিইনি...। ইন্দ্রজিৎ গাল ছড়িয়ে হাসল,— আমার ছেলেদের নিয়ে এবার এদিক ওদিক বেড়াতে যাওয়া যাচ্ছে।

তিয়া এক পা, এক পা করে হাঁটছিল, থেমে গেল। চোখ ঘুরিয়ে বলল,— কী কাণ্ড, বারো জনকে একসঙ্গে গাড়িতে তুলছেন কী করে?

হা হা হা। হয় নাকি তা? আমার রথের স্প্রিং বসে যাবে না? তিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে তেজিয়ান আকাশটাকে ঝলক দেখল ইন্দ্রজিৎ। দৃষ্টি নামিয়ে বলল,— আমি ওদের দুটো ব্যাচ করে দিয়েছি। সিক্স প্লাস সিক্স। এ সপ্তাহে এরা, তো পরের উইকে ওরা। পিছনে দুটো টুল বসিয়ে দিই, দিব্যি আরামসে চলে যায়। গত হপ্তায় তো ক্যানিং ঘুরিয়ে আনলাম।

ইন্দ্রজিৎকে যত দেখছে, চমৎকৃত হচ্ছে তিয়া। পটল খেতের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেই ফেলল,— আপনি কিন্তু সত্যিই খুব মহৎ কাজ করছেন।

দুত, ওভাবে ভাবছেন কেন? ছেলেগুলো খাটছে, চাষবাস করছে, হ্যান্ডিক্র্যাফ্‌ট বানাচ্ছে... আমি শুধু দেখছি ওরা যেন পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু পয়সাটয়সা পায়। অনাথ ছেলেগুলোকে একটু স্বনির্ভর করে দেওয়া আর কী।

তা আপনার চলে কী করে?

ওই যে আগের দিন বললাম, আমি হচ্ছি ওদের মধ্যে তেরো। আনলাকি থার্টিন।

আনলাকি বলছেন কেন?

কয়েক সেকেন্ড থেমে রইল ইন্দ্রজিৎ। মাচায় তোলা কুমড়োলতায় হাত বোলাল একটু। তারপর গলা নামিয়ে বলল,— এই হ্যাপি হোম করার কারণটা তা হলে আপনাকে বলি। আমার ছোট ভাই... একমাত্র ভাই... হি ওয়াজ ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব। বড় প্রিয় ছিল আমার। দেশবন্ধু পার্কে হঠাৎ জলে ডুবে মারা যায়। ওটাই আমায় খুব হন্ট করে। ইনফ্যাক্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়েই আমি ঠিক করেছিলাম, ডেফ অ্যান্ড ডাম্বদের জন্য একটা হোম খুলব।

আপনি তো যাদবপুরে পড়তেন, না?

হ্যাঁ। মেকানিকাল। ইন্দ্রজিৎ ঘাড় চুলকোচ্ছে।

পাশ করে নিশ্চয়ই চাকরিতেও ঢুকেছিলেন?

করেছি দু'-তিনটে কোম্পানিতে। মন বসত না। শুধু বুকে বাজত, মিশনটা ফুলফিল হচ্ছে না... মিশনটা ফুলফিল হচ্ছে না...! তখনই হঠাৎ এদিকে এসে একদিন জমিটা পছন্দ হয়ে গেল, ঝপ করে কিনেও ফেললাম...। তারপর ঘুরে ঘুরে এইসব ছেলেদের জোগাড় করা...

ব্যস, হোম বানিয়ে চাকরিটাও ছেড়ে দিলেন। তাই তো?

দু'নৌকোয় পা রেখে কী করে চলব, বলুন?

আপনার বাবা মা নিশ্চয়ই আপনাকে খুব এনকারেজ করেছিলেন?

তখন তারা আর নেই।

সে কী?

হুম, একটা কার অ্যাক্সিডেন্ট...। বছর দশেক আগে। আমি তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি।

ও। তিয়ার গলায় কিছুক্ষণ স্বর ফুটল না। তারপর আড়চোখে ইন্দ্রজিৎকে দেখে নিয়ে বলল,— এই মিশনের জন্যই বুঝি বিয়েটিয়েও হয়ে ওঠেনি।

নাহ্, সে ভুলটা করেছিলাম। তবে ওই যে, কপাল মন্দ, টিকল না।

পরের প্রশ্নটা অশোভন জেনেও তিয়া জিজ্ঞেস করে ফেলল,— কেন?

তার মনে হত আমার মাথার ঠিক নেই! যত সব আজেবাজে চিন্তা মগজে ঘুরছে! ইন্দ্রজিৎ বড় একটা শ্বাস ফেলল,— আসলে শি হ্যাড আদার প্রবলেম। একটা পুরনো অ্যাফেয়ার ছিল... যাক গে যাক, বাদ দিন। এক দিক দিয়ে তো আমি ভালই আছি, বলুন? মুক্ত বিহঙ্গ।

তিয়া মনে মনে বলল, ডানায় চোট খাওয়া। মুখে বলল,— ডিভোর্স হয়ে গেছে?

বছর চারেক আগে। এই হোম তৈরির পর পরই। ইন্দ্রজিৎ হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠেছে, একটু যেন জোর করে,— এসব জেনে আর কী লাভ? চলুন চলুন, আমাদের ঝিঙেগাছ দেখবেন চলুন। সন্ধে হলে যা সুন্দর ফুল ফোটে না...

তিয়ার বুকটা ঈষৎ চিনচিন করে উঠল। আহা রে কত দুঃখ চেপে কাজে ডুবে আছে লোকটা। শ্রদ্ধা হয়, মায়াও জাগে।

তিয়া আর কথা বলছিল না। ইন্দ্রজিৎ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সবজি খেত। বলছে, জলের অভাবে এবার ফলন কতটা মার খেল, ডিপ টিউবওয়েল বসানোর তার সাধ্য নেই, একটা কুয়ো খোঁড়ার চিন্তা ঘুরছে মাথায়, পাম্প বসিয়ে কুয়োর জলেই যদি সেচের কাজটা হয়ে যায়...। ছেলেদের ডেরাতেও নিয়ে গেল তিয়াকে। অনাড়ম্বর ছিমছাম আয়োজন। টালির শেড, সিমেন্টের মেঝে, সার সার শয্যা...। অনেকটা ডরমিটরি যেন। ষোলো সতেরো থেকে বছর কুড়ির ছেলেগুলো বেশ আছে নিজেদের মতো। বইপত্র উলটোচ্ছে, কিংবা খবরের কাগজ, গল্পআড্ডাও চালাচ্ছে সাংকেতিক ভাষায়। তিয়াকে তারা ইশারায় নাম বলে গেল একে একে। ইন্দ্রজিৎই ব্যাখ্যা করল সংকেতের। কেউ কমল, কেউ নয়ন, কেউ বা গণেশ...

বিকেল পড়ে আসছিল। পায়ে পায়ে ফের অফিসঘরে এল তিয়ারা। ইন্দ্রজিৎ বলল,— খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তো?

গরমে ঘুরে সত্যিই শ্রান্তি আসছিল তিয়ার। বলল,— একটু একটু।

তা হলে বসে জিরিয়ে নিন। ফ্যানের মুখ তিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রজিৎ,— জল খাবেন?

থাক।

ইন্দ্রজিৎ চেয়ার টেনে বসল সামনে। বলল,— একটা ব্যাপার ভাবছি, বুঝলেন। ছেলেগুলোর ইন্ডোর রিক্রিয়েশনের জন্য এবার একটা টিভি আনব।

ভাল আইডিয়া। শুনতে না পাক, দেখাটাও তো আনন্দের। তিয়া চেয়ারে হেলান দিল,— আচ্ছা, একটা কথা বলি... এই যে আপনি হোমটা চালাচ্ছেন, তার তো অনেক খরচখরচা আছে?

তা তো আছেই।

পাচ্ছেন কোথ্থেকে? নিশ্চয়ই সবজি আর হ্যান্ডিক্র্যাফট বেচে সব দিক মিট-আপ করা যায় না?

ইন্দ্রজিতের মুখে এবার মিটিমিটি হাসি,— খানিকটা হয়। বাকিটার জন্য হাত পাতি।

ও। তার মানে আপনার ডোনার আছে?

ফিক্সড আছে দু'-চারজন। আই মিন, দু'-চারটে কোম্পানি। আফটার অল, হ্যাপি হোম একটা এন জি ও তো, তার কাজকর্ম দেখিয়ে অ্যাপিল জানাই। কেউ দেয়, কেউ দেয় না, তবে কুড়িয়ে বাড়িয়ে চলে যায়। খুব শর্টফল হলে মেম্বাররাও দেয় কিছু কিছু।

তিয়া সামান্য চিন্তা করল। আগের দিনই বাড়ি গিয়ে স্থির করেছিল কমিশনের দু'হাজার টাকাটা সে ফেরত দেবে ইন্দ্রজিৎকে। সত্যি বলতে কী, আজ আসার সেটাও একটা কারণ বটে। এমন একটা প্রতিষ্ঠানে গাড়ি বেচার কমিশন তিয়া অন্তত নিতে পারবে না। কিন্তু মাত্র দু'হাজারই দেবে? আর একটু বেশি কি দেওয়া উচিত নয়? ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স অবশ্য ঝপ করে নেমে গেছে, বাবাকে পঁচিশ হাজার দিয়ে দিল কিনা। বাবা অবশ্য ঘোরতর আপত্তি জুড়েছিল। শেষে তিয়া যখন বোঝাল, লাগলে আবার নেবে সে, তখন খানিক ঠান্ডা হল যেন। যাক গে, সূর্যর কাছ থেকে পেমেন্ট পেলে না হয় হ্যাপি হোমে আরও কিছু...

ইন্দ্রজিৎ দেখছিল তিয়াকে। জিজ্ঞেস করল,— কী ভাবছেন?

তিয়া ব্যাগ খুলে সাদা খামখানা বাড়িয়ে দিল,— এটা রাখুন।

কী আছে এতে?

কমিশনটা।

ওমা, কেন? ওটা তো আপনার প্রাপ্য।

আমি তো শাইলক নই।... রাখুন তো।

তিয়ার দিকে স্থির তাকিয়ে আছে ইন্দ্রজিৎ। দৃষ্টিটা রীতিমতো অস্বস্তিকর। ঠোঁটে একটা অসহজ হাসি টেনে তিয়া বলল,— আসলে কী হয়েছে জানেন তো, আপনাদের কাজকর্ম দেখে আমি খুব মুভড্। আমি কি এই এন জি ও-র মেম্বার হতে পারি না?

অবশ্যই পারেন। ইন্দ্রজিৎ চোখ সরায়নি তিয়ার চোখ থেকে। হাসিমাখা মুখে বলল,— আমি কিন্তু আপনাকে তার চেয়েও একটু বেশি কাছে পাব বলে ভেবেছিলাম।

তিয়ার ভুরু কুঁচকে গেল। এ আবার কী ধরনের কথা? মোটেই সে ইন্দ্রজিতের টানে আসেনি এখানে, এসেছে হ্যাপি হোমে!

তিয়ার চলকে ওঠা বিরাগটা বুঝি পড়ে ফেলেছে ইন্দ্রজিৎ। তাড়াতাড়ি বলে উঠল,— মেম্বাররা তো শুধু তাদের নাম আর যৎসামান্য সাহায্য দিয়েই খালাস। আমি চাইছিলাম আপনার সক্রিয় সহযোগিতা।

কীরকম? তিয়ার ভুরুর ভাঁজ মোছেনি পুরোপুরি।

যদি অভয় দ্যান, তো মনোবাসনাটা জানাই।... আপনাকে প্রথম দিন দেখেই খুব ভাল লেগেছিল। কী সুন্দর কথা বলেন, চমৎকার কনভিন্সিং পাওয়ার আছে আপনার... সে-দিন থেকেই কেন যেন মন বলছে, আপনাকে যদি এই প্রতিষ্ঠানের কাজে টেনে আনতে পারি...। বুঝছেন তো, এই ক'টা ছেলেতে থেমে থাকা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি চাই হ্যাপি হোম অনেক বড় হোক, আরও অনেক বেশি ছেলে হোমের ছায়ায় থেকে আত্মনির্ভর হয়ে উঠুক।... কিন্তু তার জন্য তো টাকা চাই ম্যাডাম। প্রচুর টাকা।

তিয়া স্বচ্ছন্দ ফের। ঠোঁট টিপে বলল,— তা আমি কী করব? আমার তো লাখ লাখ টাকা নেই!

আপনার পোটেনশিয়াল আছে। আমি লোককে সেভাবে ইমপ্রেস করতে পারি না, যেটা আপনি পারেন। যদি হোমের জন্য অল্প সময় দ্যান... দু'-চারটে বড় কোম্পানিতে ডোনেশনের জন্য অ্যাপ্রোচ করেন... প্রয়োজনে আমিও সঙ্গে থাকব...।

ওরে বাবা, এখন যা কাজের চাপ! তিয়া হাসার চেষ্টা করল,— আগের দিন তো শুনলেন, একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে নেমেছি...

আহা, কাজের ফাঁকে ফাঁকেই নয় করবেন। আমার... আই মিন আমাদের পাশে যদি একটু দাঁড়ান, অসহায় ছেলেগুলোর ভারী উপকার হয়।

এরপর কি মুখের ওপর না বলা যায়? তবু তিয়া সরাসরি সম্মতি জানাতে পারল না। কথা দেওয়া মানেই তো আটকে পড়া, নয় কি? অস্পষ্টভাবে বলল,— ঠিক আছে, ভেবে দেখব।

আমি কিন্তু ছিনেজোঁকের মতো লেগে থাকব। নুন ছিটিয়েও তাড়াতে পারবেন না।

নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা হাসছে ইন্দ্রজিৎ। তিয়াও উঠে পড়ল হাসিমুখে। বলল,— আজ তা হলে চলি?

চলি বলতে নেই। বলুন, আসি। আমি কিন্তু আপনার অপেক্ষায় থাকব।

বারংবার আপত্তি সত্ত্বেও তিয়াকে স্টেশন অবধি এগিয়ে দিল ইন্দ্রজিৎ। কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাতে জানাতে। দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না তিয়ার ট্রেন আসে।

ছুটির দিন। কামরা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। জানলায় বসে হ্যাপি হোমের কথাই ভাবছিল তিয়া। দুম করে তাই আবার আসা, প্রতিষ্ঠানটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে... বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো? অচেনা লোকটা তাকেই কেন পাকড়াও করল? সত্যিই কি তাকে যোগ্য মনে হয়েছে? কাজের সূত্রে বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা তিয়ার আছে বটে, এখন তো আরও বাড়ছে। কিন্তু তাদের কাছে হ্যাপি হোমের হয়ে বলা কি সম্ভব? নিজেদের ধান্দা ছেড়ে? যাক গে যাক, তিয়া তো প্রতিশ্রুতি দেয়নি কোনও। পারলে করবে, না পারলে করবে না, বেশি ভাবাভাবির কী দরকার!

বালিগঞ্জে নামল তিয়া। ব্যক্তিগত কেনাকাটা ছিল কিছু, সারল গড়িয়াহাটে ঘুরে ঘুরে। ব্রা, প্যান্টি, একটা স্লিপ, গোটা দুয়েক নাইটি, চুলের ক্রাঞ্চি, ক্লিপ, পছন্দসই নেলপালিশ, লিপস্টিক। ভাল একখানা সানস্ক্রিন লোশন কিনতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, গার্গীদি গুচ্ছের ক্রিম লোশন গছিয়ে গেছে বাড়িতে। মাকে নাকি এজেন্ট বানানোর চেষ্টা করছে! মা বনবে এজেন্ট, হাহ্! বেছে বেছে গোটা তিনেক সিডি-ও কিনল তিয়া। বাজার মাত করা সাম্প্রতিক সংগীতের অ্যালবাম। দোকানটায় দাঁড়িয়ে গানও শুনল খানিকক্ষণ। সময় কাটাতে হবে তো!

সূর্য এল নিখুঁত সময়ে। তার মোটরবাইকে সওয়ার হয়ে এবার সোজা

এক শপিংমলের ফুডকোর্ট। মেলানো মেশানো রংদার আইসক্রিম খাচ্ছে দু'জনে।

সূর্য জিজ্ঞেস করল,— কেমন হল তোমার নরেন্দ্রপুর ট্রিপ?

দারুণ। গড়গড় করে গোটা বিকেলটা উগরে দিল তিয়া। তারিফের সুরে বলল,— লোকটার কিন্তু এলেম আছে। একা হাতে একটা হোম তৈরি করা কি মুখের কথা!

সূর্য হালকা চালে বলল,— একা কেন হবে? এন জি ও-র একটা বডি থাকে। ডেফিনিটলি তারাও কিছু ডিউটি পারফর্ম করে।

আমার তো তা মনে হল না। আগের দিনও আর কারওকে দেখিনি, আজও নয়। একা একাই তো করছে সব।

উম্। সূর্য বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল,— এই ধরনের লোকরা দুটো টাইপ হয়, বুঝলে। হয় ছিটগ্রস্ত, নয়তো দু'নম্বরি।

ছিট তো আছেই। নইলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে, ভাল চাকরি পেয়েও, সব ছেড়েছুড়ে নিজের আইডিয়াল নিয়ে মেতে থাকে!

স্রেফ আদর্শ? নিজেরও কি টু পাইস থাকে না?

কোথথেকে থাকবে?

আছে, আছে, অনেক রকম কায়দা আছে। তুমি বুঝবে না। ফরেন গ্রান্ট আসে কিনা জিজ্ঞেস করেছ?

না তো।

পরের দিন পতা কোরো। ইকুয়েশনটা বোঝা যাবে। সূর্যর চোখ সরু,— মালটার বয়স যেন কত বলেছিলে?

দেখে যতটা ইয়াং লাগে, ততটা বোধহয় নয়। তিরিশ-একত্রিশের বেশিই হবে। মিনিমাম পঁয়ত্রিশ। ডিভোর্সই তো হয়েছে বছর চারেক।

হুম্। খুব সাবধান।

কেন?

মনে হয় তোমার দিকে ঢলেছে। এই বয়সের বউ পালানো লোক... খুব ডেঞ্জারাস।

ভাবনাটা যে তিয়ার মনেও উঁকি দেয়নি, তা নয়। তবে ইন্দ্রজিৎকে বিপজ্জনক লোক ভাবতে সে রাজি নয়। আবার এই নিয়ে এমন এক মনোরম সন্ধ্যায় তর্কাতর্কিতেও তার স্পৃহা নেই। মুখভঙ্গি করে বলল,—

লোকটার কথা থাক। কাল আমাদের কাজের ডিস্ট্রিবিউশন কীভাবে হচ্ছে।

ফার্স্ট আওয়ারে আমি প্রেসে যাচ্ছি। বুকলেটের লে-আউট ঠিকঠাক করল কিনা দেখে আসা দরকার। সেখান থেকে যাব ইভিটা ম্যাগাজিনের অফিসে। অ্যাডভান্সের সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট কালেক্ট করতে হবে। তারপর অফিসে আসছি। ততক্ষণে তুমিও তোমার কাজ সারতে থাকো। লিস্ট দেখে দেখে সেলিব্রিটিদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো করে ফ্যালো। যদি দ্যাখো কেউ রিকোয়ার্ড ডেটে অ্যাভেলেবল হচ্ছে না, পরের লিস্ট ধরবে। তেমন বুঝলে ইভিটা-র এডিটরকে ফোন করে আরও কয়েকটা নাম চেয়ে নেবে। মনে রেখো, ওদের সেমিনারটা সাকসেসফুলি উতরে দিতে পারলে কেল্লা ফতে। পুজোর সময়ের কাজটার জন্য প্রেস করতে পারব। ডি-ডের কেটারিংয়ের ব্যাপারটা আমি...

আর মিস্টার তানেজাদের অর্ডারটার কী হল?

ওটা কিন্তু তোমায় যেতে হবে। কাঠ কাঠ থেকো না, বি মাখন, মাখন...। তোমার সুইটি সুইটি স্মাইলটাকে ইউটিলাইজ করো ডার্লিং। লাস্ট ইয়ারে ওদের সেমিনারটার অর্ডার পেয়েছিল রেনেসাঁ। এবার ব্যাটারা যেন ও-মুখো ঘেঁষতে না পারে।

রেনেসাঁ কত কোট করেছিল, তা কিন্তু এখনও জানতে পারোনি।

সেটা জানাও তোমারই কাজ ম্যাডাম। তানেজাকে টিপলেই বেরিয়ে আসবে।

দেখি চেষ্টা করে। ওই কাজে কিন্তু আমাদের ভাল ইনভেস্টমেন্টও আছে। ডিগনিটরিজদের আনা, হোটেল বুকিং...

আস্তে আস্তে পেশাদারি আলোচনায় ঢুকে পড়ছিল তিয়া। বলছে, শুনছে, বলছে...। কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ভেসে উঠছিল নরেন্দ্রপুরের ঘেরা জায়গাটা। ইন্দ্রজিৎ, বোবা-কালা ছেলেগুলো, সবুজ খেত...। হারিয়েও যাচ্ছিল।

দশ

শেফালি জিজ্ঞেস করলেন,— কী রে, এবার তা হলে তোদের লুচিটা ভাজি?

মাধবীলতা চোখ পাকাল,— ছটফট করছ কেন? চুপটি করে বোসো। এখন মোটেই তোমাকে গ্যাসের সামনে যেতে হবে না।

হ্যাঁ, খিদে পেলে আমরা বলব। দোলা তালে তাল দিল,— ঝুমা আজ বাড়িতে, ঝুমা ভেজে দেবে।

কেন? ঝুমা কেন? শেফালি রীতিমতো অপ্রসন্ন,— আমি কি অথর্ব হয়ে গেছি? ময়দা তো মাখাই আছে, ক'টা লুচি বেলে ভাজতে পারব না?

মাধবীলতা হাত উলটে দিল। দোলাও হাসছে। মাকে নিয়ে এই হয়েছে ফ্যাসাদ, কাজ করতে না দিলেই খেপে যাবে। বিশেষ করে রান্নাবান্নাটা। পঁচাত্তর বছর বয়স হল, চোখে ভাল দেখছে না ইদানীং, শরীর স্বাস্থ্যও সুবিধের নয়, কিন্তু হাতাখুন্তি ছাড়তে ঘোর আপত্তি। জোর করে ঝুমা সম্প্রতি এক রাঁধুনি রেখেছে, পুত্রবধূর ওপর তাই রেগে টং। ফোনে সে-দিনও গজগজ করছিল, সংসারে তো আমার সবই গেছে, ওই একটা জায়গা ছিল, ঝুমা তাও কেড়ে নিল! কে বোঝাবে, বন্দোবস্তটা মা'র ভালর জন্যই!

ক'দিন ধরেই ডাকাডাকি করছিল ভাইয়া। মা নাকি রাতে একেবারেই ঘুমোচ্ছে না, সারাদিন ঝিমোচ্ছে, টলে যাচ্ছে হাঁটতে গিয়ে...। দুপুরে দোলা যখন দিদির সঙ্গে এল, তখনও মা বিছানায়। কিন্তু মেয়েদের দর্শন পেয়েই হঠাৎ তিনি চনমনে। গুটগুট হেঁটে বেড়াচ্ছেন, বকবক চলছে অবিরাম।

শয্যাশায়ী নয়, মাকে এই অবস্থায় দেখতেই ভাল লাগে দোলার। আবার একটু একটু খারাপও লাগে যেন। সংসারে এক সময়ের দাপুটে অধিকর্ত্রীর কী হাল! মাত্র আট ফুট বাই পাঁচ ফুট একটা ঘরের দখলদারির জন্যই কী আকুলতা এখন! অবশ্য দোলার নিজের দশাই বা কী এমন আলাদা? শেফালির তো তাও বয়স হয়েছে, শরীর ভেঙেছে, দোলা তো শক্তসমর্থ অবস্থাতেই...! দিনভর শুধু কী রান্না হবে, আর কে কী খাবে! তার পরেও ছেলে মেয়ে বর, কেউ কি তাকে পোঁছে?

মেয়েদের বারণকে তোয়াক্কা না করে শেফালি চলে গেছেন স্বস্থানে। ছ্যাঁকছোঁক শব্দ আসছে লুচি ভাজার। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে লাভ নেই, শেফালি হাউমাউ চেল্লাবেন, অতএব দুই বোন এখন ঠুঁটো জগন্নাথ। বাবলিকে

পাড়ার নাচের স্কুলে দিতে গিয়েছিল ঝুমা, ফিরে ঘরে কী যেন করছিল, বেরিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে ফিক করে হাসল,— কী গো, তোমরা আটকাতে পারলে?

মাধবীলতা হেসে বলল,— থাক না, করুক না... শুধু একটু নজর রাখিস।

সে নয় যতক্ষণ বাড়ি আছি, চোখে চোখে রাখলাম। কিন্তু যখন নেই?

হুম্। দোলা মাথা নাড়ল,— একটা রাতদিনের লোক রাখলে বোধহয়...

কোনও লাভ হবে না ছোড়দি। চেঁচামিচি করে মা দু'দিনে তাকে ভাগাবেন।

গভীর সমস্যা। তা ঘুমটুমের ব্যাপারে ডাক্তার কী বলল?

ওষুধের ডোজ বাড়িয়েছে। কিন্তু তোমাদের ভাই তো দিতে সাহস পাচ্ছে না। এমনিতেই টলছেন, কখন কোথায় পড়ে গিয়ে বিচ্ছিরি কিছু ঘটে যাবে...। বলতে বলতে ঝুমা চলে গেছে রান্নাঘরে, সেখান থেকেই গলা ওঠাল,— জানো তো, গাঙ্গুলিবাড়ির শরৎবাবু চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে এখন নার্সিংহোমে। ফিমার বোন নাকি দু'টুকরো।

ওমা, সে কী? শরৎজেঠুর পা ভেঙেছে কবে?

পরশু সন্ধেবেলা। কী আতান্তর বলো তো? বাকি জীবনটা হয়তো বিছানাতেই থাকতে হবে।

বটেই তো। বুড়ো বয়সে ওই হাড় আর জোড়া লেগেছে!

নিজেরও কষ্ট। বাড়ির লোকেরও ভোগান্তি। যত দিন বাঁচবেন, পার্মানেন্ট গৃহবন্দি।

শেফালিকে সফলভাবে রান্নাঘর থেকে হঠিয়ে দিয়েছে ঝুমা। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন শেফালি। রাগ রাগ গলায় বললেন,— অত আহা-উহুর কী আছে? এ হল গিয়ে কর্মফল। ওই লোক সুধাদিকে সারা জীবন দগ্ধে মেরেছে! নিজে উনি ট্যাঙোস ট্যাঙোস চরকি মারছেন, ওদিকে সুধাদির ঘরের বাইরে বেরোনো মানা! পরপুরুষের নজর লাগলে বউয়ের নাকি চরিত্তির যাবে! এবার নিজে শুয়ে থেকে দ্যাখো চার দেওয়ালে আটকে থাকা কেমন লাগে!

এটা অবশ্যি ঠিক বলেছে মা। মাধবীলতা সায় দিল,— শরৎজেঠু সুধাজেঠিমার সঙ্গে যে আচরণটা করেছেন, সে তো অত্যাচার। বউ সুন্দরী বলে একসময়ে তো তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে অফিস যেতেন।

পাষণ্ড। শেফালি মোড়া টেনে বসলেন,— বাড়িতে অত বাহারি গোলবারান্দা, জন্মে কখনও সেখানে বউকে দাঁড়াতে দিল না গো। আটকে

থেকে থেকে এমন অভ্যেস হয়েছে, সুধাদি এখনও বারান্দায় দাঁড়াতে পারে না। অসোয়াস্তি হয়।

বারান্দা তো একটা দোলাও পেয়েছিল। সুধাজেঠিমার থেকে এক প্রজন্ম পরে জন্মেও। সে কি পারল দাঁড়াতে? অংশুদা যতই ডাকুক, সৃষ্টিতে যেতে আর কি তার পা উঠবে?

লুচির প্লেট হাতে ঝুমা এসেছে। টেবিলে রাখতে যাচ্ছিল, মাধবীলতা হা হা করে উঠল,— করছিস কী? দাঁড়া, আগে ছবিগুলো সরাই।

বাবানের পাঠানো একগাদা ফটো এনেছিল মাধবীলতা। এসেই ছড়িয়ে দিয়েছিল টেবিলে। বাবানের বাড়ির অন্দরের ছবি, বাইরের ছবি, বাবান আর অলির একসঙ্গে ছবি, আলাদা আলাদা ছবি...। গোছা করে তুলছে এখন। খামে ভরতে ভরতে দোলাকে বলল,— ও হ্যাঁ, দরকারি কথাটা বলতে ভুলে যাচ্ছি। তিয়ার কোনও রিসেন্ট ছবি আছে? একটু সেজেগুজে তোলা?

দোলা লুচি ছিঁড়তে গিয়ে থমকাল,— দেখতে হবে। কেন বলো তো?

অলি একটা ভাল সম্বন্ধর কথা বলছিল। যদি লেগে যায়, আমাদের তিয়াও চলে যাবে মেলবোর্নে।

শেফালি আগ্রহভরে বলে উঠলেন,— তিয়ার জন্য পাত্র? মেলবোর্নের? বাঙালি তো?

হ্যাঁ গো। খড়্গপুর আই-আই-টির ইঞ্জিনিয়ার। বাবানদেরই বন্ধু।

লাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে। শেফালি উল্লাসে ফুটছেন,— মেয়েটা বড্ড উড়ছে। আমার কাছে আসারও সময় পায় না। দে বেটির ডানা ছেঁটে।

ছাড়ো তো দিদির কথা। দোলা পলকাভাবে বলল,— অত ভাল ছেলে তিয়াকে থোড়াই পছন্দ করবে!

কেন করবে না শুনি? তিয়া আমাদের কীসে কম? দেখতে সুন্দর, লেখাপড়া জানে, ফটাফট ইংরিজি বলতে পারে...

ঠিকই তো। মাধবীলতা মাথা দোলাল,— ওখানকার ছেলেদের জন্য তিয়া পারফেক্ট ম্যাচ। ফ্যামিলিটাও ভাল। বাবা মা দু'জনেই প্রফেসার, বেহালায় নিজেদের বাড়ি। কাস্টও খাপে খাপে মেলে। বসু। সৌকালীন গোত্র।

ওফ দিদি, এ যুগেও তুই জাতগোত্রে পড়ে আছিস?

তুত্ আমি ওসব মানি নাকি? তবু সম্বন্ধ করার সময়ে একটু দেখতে হয়। সবাই দ্যাখে।

বটেই তো। শেফালি বললেন,— ছেলের বাপ মায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ কর। দেরি করিস না, ভাল পাত্র বেশি দিন ফাঁকা থাকে না।

দোলা তবু উৎসাহ পাচ্ছিল না। মেয়ের ধাত তো সে জানে। একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল,— থাক রে দিদি। জানিসই তো, সম্বন্ধ করা বিয়েতে তিয়া রাজি হবে না।

ছাড় তো। ছেলের বায়োডাটা শুনলে আপ্‌সে গলে যাবে।

তবু...

তুই ছেলেমেয়ের ভয়ে এত কাঁপিস কেন বল তো? তুই না মা?

ঝুমা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎই নাক গলিয়েছে,— আমি একটা কথা বলব বড়দি? তিয়া নিজে কাউকে পছন্দ করেছে কিনা সেটা আগে জেনে নিলে হয় না?

মাধবীলতা দোলার দিকে ফিরল,— কী রে, তেমন আছে নাকি কেউ?

দোলা আমতা আমতা করল,— না মানে... আমার সঙ্গে তো ঠিক কথা হয় না... সারাক্ষণ এমন ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে থাকে...

আমি কিন্তু তিয়াকে একটা ছেলের সঙ্গে দেখেছি। ঝুমা ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে চোখ ঘোরাল,— দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম। মোটরসাইকেল আছে ছেলেটার।

সে বোধহয় ওর কোনও এমনি বন্ধুটন্ধু...

তা আমি জানি না। তবে যেভাবে দু'জনে হাত ধরাধরি করে রাস্তা পার হয়ে বাইকে উঠল...

অ। মাধবীলতা যেন হতাশ,— তবে আগে জান ব্যাপারটা। আমাকে আর তা হলে কষ্ট করে এগোতে হয় না।

ঝুমার দেওয়া খবরটা বিশ্বাস করতে পারছিল না দোলা। আবার পুরোপুরি ঝেড়েও ফেলতে পারছে না। প্রেমে পড়লে মেয়েদের একটু পরিবর্তন তো হয়ই, তিয়ার মধ্যে তেমন কিছু লক্ষ করেছে কি? চালচলনে? হাবভাবে? অবশ্য চাঁদ-তারা-ফুলের যুগ চলে গেছে, এখনকার ভাবভালবাসা হয়তো এরকমই হয়! চাকরির মতো! ব্যাবসার মতো! তবে এও ঠিক, তিয়া ঢুলুঢুলু চোখে ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলছে, বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, এ-দৃশ্যও তো অকল্পনীয়!

মা'র কাছে আরও খানিকক্ষণ বসে পাতিপুকুর থেকে বেরিয়ে পড়ল দুই বোন। ফিরছে মাধবীলতার গাড়িতে। বাইরে একটা ফুরিয়ে আসা বিকেল। ম্লান সন্ধ্যা নামছে মন্থর পায়ে। আকাশে অল্প অল্প মেঘ। বর্ষা আসি আসি

করেও আসছে না, তবে প্রায় রোজই বৃষ্টি হচ্ছে একটু-আধটু। ভি-আই-পি রোডের দু'ধারে গাছগাছালির সবুজ ভাব বেড়েছে খানিকটা। বাতাসে বাষ্প নেই তেমন, এখনও হাওয়া কেমন শুকনো শুকনো।

বাইপাসে এসে মাধবীলতা বলল,— তুই এখন বাড়ি ফিরবি তো?

তিয়ার কথাই ফের ভাবছিল দোলা। আনমনে বলল,— হুঁ।

তবে চল না আমার ওখানে।

কেন রে?

এমনি। যাসনি তো অনেক দিন। তোর আশিসদা বোধহয় আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে, একটু নয় গপ্পোটপ্পো করে আসবি।

সামান্য চিন্তা করে দোলা বলল,— না রে, আজ থাক। তিতানটার পরীক্ষা চলছে...

ওমা, এখনও শেষ হয়নি?

আর একটা বাকি। মঙ্গলবার লাস্ট। পরিবেশ বিজ্ঞান না কী একটা যেন আছে।

পরীক্ষা ভাল হচ্ছে তো?

দোলা মনে মনে বলল, যে পড়াশুনোই করে না, পরীক্ষা তার ভাল হবে কোথ্থেকে। মুখে বলল,— মোটামুটি দিচ্ছে আর কী।

বেশ, তবে মঙ্গলবারের পরেই নয় আসিস। মাধবীলতাকে ঈষৎ উদাস দেখাল,— আসলে কী জানিস, একা একা আর ভাল্লাগে না।

একা কোথায় রে? আশিসদা জলজ্যান্ত মজুত...?

তবু তো ওই একাই। দু'জনে মিলে একা। আমি ওর মুখ দেখি, ও আমার মুখ দেখে, কাঁহাতক ভাল লাগে, বল? কীভাবে যে দিন কাটে!

বাবানের জন্য খুব মন কেমন করে বুঝি? তা অস্ট্রেলিয়া থেকে ক'দিন ঘুরে আয় না দু'জনে।

সে নয় গেলাম। মাসখানেক নয় হইহই করে এলাম। কিন্তু তারপর? মাধবীলতা একখানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল,— ওরা বোধহয় আর ফিরবে না, বুঝলি।

কেন? ওকে তো মাত্র পাঁচ বছরের জন্য পাঠিয়েছে?

সেরকমই তো জানতাম। কিন্তু এখন তো অন্য রকম শুনছি। কোম্পানি বাবানের থাকাটা এক্সটেন্ড করতে চাইছে। বাবানও তাতে খুব হ্যাপি। তাই মনে হচ্ছে...

সে আর কী করবি বল দিদি? ওদের জীবন, ওদের জীবন। আমরা চাইলেই বা আমাদের ইচ্ছেমতো ওরা লাইফ কাটাবে কেন?

তা বটে। মাধবীলতা আবার লম্বা শ্বাস ফেলল,— একটা কথা ভাবছিলাম, বুঝলি। আমি আর তোর আশিসদা বেলুড় মঠে গিয়ে দীক্ষাটা নিয়ে নিই। মনের উচাটন হয়তো কমবে।

মানুষ খুব অসহায় বোধ করলেই না কোনও একটা আশ্রয় খোঁজে! দিদির জন্য মায়া হচ্ছিল দোলার। ছেলে নিয়ে ভারী গর্ব ছিল দিদির, সেই গরিমা ক্রমশ বিষাদে গড়িয়ে যাচ্ছে। এ কি সন্তান নিয়ে বেশি সম্পৃক্ত থাকার পরিণাম? হবেও বা। হয়তো এইজন্যই একটা নিজস্ব জগতের প্রয়োজন হয় মানুষের। দোলাকে অবশ্য এ কষ্ট পেতে হবে না নতুন করে। সে তো একাই, বহু কাল ধরেই একা।

দোলা আলতোভাবে বলল,— দ্যাখ, যা ভাল বুঝিস।

মাধবীলতা শুনতে পেল কিনা কে জানে, তার চোখ বাইরে, বাইপাসের ধারে এক প্রকাণ্ড জলাশয়ে। দেখছে কি কিছু? পড়ন্ত বিকেলের আলোয়? বিম্বিত হচ্ছে কি কোনও স্মৃতি? নাকি এ শুধুই তাকিয়ে থাকা? হঠাৎই ঘুরে বলল,— তুহিনের কী খবর রে?

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় দোলা সামান্য চমকেছে। পরক্ষণে হেসে বলল,— ঠিকই আছে। অফিস নিয়ে যেমন থাকে।

ওর সেই প্রোমোশনের কদ্দূর?

হবে বোধহয় শিগগির। খুব টেনশন করে তো দেখি।

ড্রিঙ্ক করাও নিশ্চয়ই বেড়েছে?

তার আর বাড়া কমা!

চিন্তা হয় রে। বয়সটা তো ভাল নয়... সারাক্ষণ টেনশন, বাইরে বাইরে ঘোরা...! উফ, বেচারা এই বয়সেও এখনও কী দৌড়োদৌড়িটাই না করে!

দিদি ভুল বলেনি। বয়সের তুলনায় বড্ড বেশি ধকল যায় তুহিনের। কিন্তু তাকে বেচারা বলা যায় কি? এই দুনিয়ায় কে যে প্রকৃত বেচারা, টের পাওয়া কি অতই সহজ? দেহের ধকল, শরীরপাত, এগুলো তাও দেখা যায়, মনের ক্রমশ ক্ষয়ে যাওয়া কে দেখে! দোলার তো কারও কাছে অভিযোগ জানানোরও উপায় নেই। কী বলবে? আপাতদৃষ্টিতে অল্পস্বল্প বদমেজাজ আর একটু বেশি মাত্রায় মদ্যপান ছাড়া দোলার বর তো খুঁতহীন মানুষ, সংসারের

জন্য যে নিরলস খেটে মরছে। ছেলেও এমন কিছু গুন্ডাবদমাশ, বয়ে-যাওয়া নয়। মেয়েকেও সময়ের নিরিখে সেভাবে উচ্ছৃঙ্খল বলা যায় না। তবু তাদের ঘিরে এক গভীর অতৃপ্তি যে দোলাকে কুরে কুরে খায়, এও তো সত্যি। আর এই অবয়বহীন সুখহীনতা কারওকে দেখাতে পারে না বলেই দোলার বেচারাত্ব বহু গুণ বেড়ে যায় না কি?

একটু ভার মনেই বাড়ি ফিরল দোলা। দেখল তিতান এসে গেছে, আলুপরোটা বানানো ছিল, খাচ্ছে আয়েশ করে।

প্রশ্ন করা নিরর্থক, তবু সংসারের নিয়ম মেনে দোলা জিজ্ঞেস করল,— কেমন হল আজ পরীক্ষা?

হল একরকম। তিতানের নির্বিকার জবাব।

রোজই তো শুনি একরকম। একদিন কি অন্য কিছু বলতে পারিস না?

আর কী বলব?

ভাল। খারাপ। কিংবা খুব একটা ভাল নয়...

পরীক্ষার ভাল খারাপ নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই না। ওসব আমার আসে না।

পাশ করবি তো?

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই মনে করল না তিতান। ঠোঁটের কোণে ফুটেছে এক চিলতে বিদ্রূপ। উপেক্ষা। খাওয়া সেরে হেলেদুলে ঘরে। চেঁচিয়ে বলল,— এক কাপ কফি বানাও তো।

আগের মতো আবদার নয়, এ যেন নির্দেশ। নাকি আদেশ? ভঙ্গিটা তুহিনের, তবে স্বরের দাপট তুহিনকেও ছাপিয়ে যায়।

রাগতে গিয়েও রাগল না দোলা। গরম কফি নিঃশব্দে রেখে এল ছেলের টেবিলে। এবং তখনই স্থির করে ফেলল, অনেক হয়েছে, আর নয়, ছেলে মেয়ে বর কারও ব্যাপারে সে কৌতূহল দেখাবে না।

তা এমন শপথ তো জীবনে হাজার বার হল, কতক্ষণ টেকে ওই প্রতিজ্ঞা। সংসার থেকে দোলা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে কই! তিয়া ফিরতে সেই তো পায়ে পায়ে ঢুকেছে মেয়ের ঘরে!

এসেই বিছানায় চিতপাত তিয়া। পোশাক বদলানোর বালাই নেই, জিন্‌স-টিশার্টেই লম্বা হয়েছে। কানে নতুন আইপড, গানের তালে তালে দুলছে পা।

দোলা খাটের কোনায় বসল। মুখে হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল,— কী রে, খুব টায়ার্ড নাকি?

তিয়া হেডফোন নামিয়েছে। চোখ কুঁচকে বলল,— কিছু বলছ?

এসেই শুয়ে পড়লি যে বড়? খাটুনি গেছে বুঝি আজ?

সেইজন্যই তো রিল্যাক্স করছি।

বলেই আবার হেডফোন চড়াচ্ছিল তিয়া, দোলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল,— তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বলে ফ্যালো।

ছেলেটা কে রে?

কোন ছেলেটা?

ওই যে... যার সঙ্গে তুই মোটরসাইকেলে...?

কে বলল? তিতান?

তার এখন কথা বলার সময় কোথায়! এই তো, বাড়ি ঢুকেই বেরিয়ে গেল। আমি অন্য একজনের মুখে শুনলাম।

ও, গার্গীদি? যে এখন তোমার খুব প্যাল হয়েছে?

নাম জেনে তোর কী হবে? বল না কে?

অন্য দিন হলে এ প্রশ্নে খিঁচিয়ে উঠত মেয়ে। কিন্তু আজ কেন যেন খানিকটা সদয়। স্বাভাবিক স্বরেই বলল,— ও তো সূর্য। আমার বিজনেস পার্টনার। ও আর আমি মিলেই তো এখন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করি।

দোলার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,— শুধুই বিজনেস পার্টনার।

পলকে তিয়ার চোখ সরু,— মানে?

সঙ্গে সঙ্গে দোলা ঢোঁক গিলেছে,— না... একসঙ্গে কাজে নেমেছিস যখন... নিশ্চয়ই তোর অনেক দিনের চেনা...?

খুব বেশি দিন নয় মা। কলেজ ছাড়ার পরে আলাপ।

ও। ছেলেটা থাকে কোথায়?

সল্টলেক। গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে। বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার, মা স্কুলটিচার। নো ভাইবোন। এক বিধবা পিসি আছে, সঙ্গেই থাকে...। হয়েছে? তোমার নলেজ ব্যাঙ্ক ফুল?

দোলা ভ্রূকুটি করল। আত্মরক্ষার সুরে বলল,— আহা, আমি কি অত খবর চেয়েছি?

কৌতূহল তো পেটে বুড়বুড়ি কাটছে। তবে তুমি যা ধরে নিচ্ছ...। তিয়া ঝুপ করে থেমে গেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে দোলার মুখমণ্ডল। সময় নিয়ে আড়মোড়া ভাঙল একটা। ছড়ানো হাত তুলে রেখেই হঠাৎ মুখ টিপে হাসি। দোলাকে অবাক করে বলল,— তোমার গেসিংটা রাইট। আমরা বিয়ে করতে পারি।

ওমা, তাই? খবরটা দিব্যি চেপে রেখেছিস?

অত পুলকিত হওয়ার কিছু নেই মা। এক্ষুনি এক্ষুনি কিছু হচ্ছে না। আগে আমরা একটু সলিড ফুটিং পাই...

একদিন নিয়ে আয় না ছেলেটাকে।

দেখি। তিয়া বাবু হয়ে বসল,— শোনো, যা বললাম তা কিন্তু বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। চারদিকে ড্রাম পিটিয়ে বেড়িয়ো না। ঠিক?

দোলা ঢক করে ঘাড় নাড়ল। হঠাৎই যেন একটা সুন্দর বাতাস ঢুকে পড়েছে ঘরে। হাত বোলাচ্ছে দোলার গায়ে, মাথায়। এই যে কথাগুলো মেয়ে তার ঝাঁপিতে তুলে দিল, এইটুকুই তো সে চায়। টুকরো-টাকরা এই মুহূর্তগুলোই কি সুখ? এক অসহ্য সংসারকে সহনীয় মেনে হেঁটে চলার পাথেয়? হয়তো বা।

এগারো

এবছর বর্ষা এল বেশ দেরিতেই। তবে বৃষ্টির ঘাটতি হয়নি, পুষিয়ে দিয়েছে পুরো মাত্রায়। আষাঢ়ের মাঝামাঝি টানা তিন-চার দিন তো সূর্যদেবের দেখাই মিলল না। সারাক্ষণ শুধু ঝরছে আর ঝরছে। কলকাতাও ওমনি সুযোগ পেয়ে ফিরে গেছে স্বমহিমায়। খানাখন্দ, রাস্তাঘাট জলে টইটুম্বুর, দোকানবাজার ভাসছে, ট্রামবাস প্রায় বন্ধ, ট্রেন চলাচলের ঠিক নেই— সব মিলিয়ে এক কেচ্ছাকেলেঙ্কারি দশা। গণমাধ্যম আর জনসাধারণের গুঁতো খেয়ে ঘুমন্ত পুরসভা পর্যন্ত নেমে পড়েছে ত্রাণকাজে। আমহার্স্ট স্ট্রিটে নৌকো বাইছে পুলিশ— ছোট্ট মোদের পানসি তরী, সঙ্গে কে কে যাবি আয়...!

তিয়াদেরও ক'দিন কাজকর্মের বারোটা। অফিস যাবে কী, তাদের কানেক্টিভিটির সামনে এক কোমর জল। কোথ্থাও নড়ার উপায় নেই,

জোরজার করে বেরোলেও অর্ধেক লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না...। এক মোবাইল ফোনই যা ভরসা। এর মধ্যে একদিন বীরত্ব দেখাতে গিয়ে বিশ্রীভাবে ভিজল তিয়ার সূর্যদেব, তারপর জ্বরে কাবু, চার দিন বিছানায়। শুয়ে শুয়ে সমানে তিয়াকে মেসেজ পাঠাচ্ছে। কাজের। অকাজের। আর কখনও কি দেখা হবে! তানেজাকে মিট কোরো কিন্তু! শালা মনসুনটা এমন ভিলেনি করল কেন বলো তো! চুমু পাঠালাম, ডিলিট কোরো না! ইভিটার ফাইনাল পেমেন্টের জন্য একবার যাও না প্লিজ! সূর্যর পাম্প-খেয়ে তিয়াও ঘুরেছিল জলে জলে। ব্যস, ওমনি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ সর্দি, ঘঙঘঙ কাশি। শয্যা নিতে হয়নি, এই যা বাঁচোয়া।

তা আকাশ এখন খানিক শুধরেছে। তেড়েফুঁড়ে হানা দিচ্ছে বটে হঠাৎ হঠাৎ, আবার মেঘ হঠিয়ে রোদ্দুরও লাফাচ্ছে ঝিকঝিক। শহরের পথঘাট মাড়ি বের করে হাসছে।

আজ একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিল তিয়া। একের পর এক অফিসে ঢুঁ মারতে। আজকাল যে পণ্যই বাজারে আসুক, গোড়াতেই একটু ফোকাস চায়। সে ফিল্ম হোক, কি গানের ডিস্‌ক, কিংবা বিস্কুট, গুঁড়োমশলা। নতুন কোনও ঘ্যামচ্যাক দোকান খুললেও এখন একই রেওয়াজ, শুরুর আগে ট্রাম্পেট বাজানোর জন্য একটা জম্পেশ অনুষ্ঠান দরকার। রংদার। জেল্লাদার। মিডিয়ার যাতে চোখ টানে। এ ছাড়া অফিস কনফারেন্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ তো লেগেই থাকে হরবখত। আর এইসব কাজ উতরে দিতেই তো কানেক্টিভিটিদের উদ্ভব। যত নিখুঁত করবে, তত নাম ছড়াবে। তবে কাজটা আগে পেতে হবে তো। তার জন্য দোরে দোরে ঘোরাটাও কাজ। তিয়াই এখন এদিকটা সামলাচ্ছে বেশি। প্রথমে আজ গেল এক অ্যাড এজেন্সিতে, সেখান থেকে একটা বুটিক, তারপর মদের কোম্পানি। কোথাও স্রেফ ছুঁয়ে যাওয়া, আর সেই ফিকিরে নতুন কাজের অনুসন্ধান এবং যোগাযোগের পরিধি বাড়ানো। কোথাও বা অর্ডারের জন্য বডি ফেলে রাখা। সুরা নির্মাতা অবশ্য কাজ দেবে না কানেক্টিভিটিকে। তাদের হাইফাই ব্যাপার, সামাল দেওয়ার মতো রেস্তোও নেই তিয়াদের। তবে ঘুরপথে অল্পস্বল্প কাজ আসে বই কী। খোলাখুলি মদের বিজ্ঞাপন আইনে নিষিদ্ধ, তাই কোনও অছিলায় নামটুকু দেখাতে তারা অজস্র প্রোগ্রামে টাকা ঢালে। ওই সব প্রোগ্রামের লিস্ট বাগাতে পারলে, অনুষ্ঠানগুলোর জন্যও তো তিয়ারা দৌড়ঝাঁপ করতে পারে।

তিন জায়গায় সফর সারতে দুপুর গড়িয়ে গেল। অফিসে ফেরার আগে একবার মালহোত্রা অটোমোবাইলসে এল তিয়া। কবে চাকরি ছেড়েছে, তিন মাস হয়ে গেল, এখনও একটা ইনসেনটিভের টাকা বাকি। কত বার ফোন করল, প্রতি বারই এক বুলি, এখনও বিল হয়নি! অবশেষে কাল বাবুদের দয়া হয়েছে, ফোন করে নিজেরাই বলল নিয়ে যেতে।

চেকটা হাতে পেয়ে তিয়ার মেজাজ ভারী শরিফ হয়ে গেল। আঠাশশো টাকা, মন্দ কী! পুরনো সহকর্মীদের হাই হ্যালো করে তিয়া প্রজাপতির মতো উড়ে বাইরে। খিদে পাচ্ছিল একটু একটু। অফিসে ফিরে সূর্যর সঙ্গে লাঞ্চ সারবে? নাকি এখনই? সূর্যর জন্য একটা বারগার নিয়ে গেলেও হয়।

কাছের কফি-বারটায় ঢুকে পড়ল তিয়া। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কফি স্যান্ডুইচের অর্ডার দিচ্ছে। তখনই নজরে পড়ল সোনালিকে। কোল্ড ড্রিঙ্ক আর পিৎজা নিয়ে বসে আছে। আনমনে। একা।

তিয়া খাবারের ট্রে হাতে টেবিলটায় গেল। বসতে বসতে রগুড়ে গলায় বলল,— কী খপর, সোনালি মেমসাব?

আরে, তুই? হোয়াট আ সারপ্রাইজ! সোনালির চোখ উজ্জ্বল হয়েছে,— কেমন চলছে তোদের বিজনেস?

দৌড়ে, হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে... ঠিকই আছে।

মানে তুই হ্যাপি? চাকরিটা ছেড়ে?

বলতে পারিস। রোকড়া কী আসছে বড় কথা নয়, তবে জবটা চ্যালেঞ্জিং। ভ্যারাইটি আছে।

দ্যাটস গুড। প্রেজেন্টলি কেমন পাচ্ছিস?

পাওয়া-পাওয়ির কিছু নেই, এটা তো আমারও ব্যাবসা। তোকে তো বলেই ছিলাম, আমি আর সূর্য ফিফটি ফিফটি। উইদাউট এনি ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম মাই সাইড।

সোনালি একটুক্ষণ চোখ গেঁথে রাখল তিয়ায়। কপালে নেমে আসা চুল আঙুলে সরিয়ে বলল,— ডিড করেছিস?

তুত্, সূর্যর সঙ্গে আবার কীসের ডিড! জাস্ট ভারবাল এগ্রিমেন্ট।

মানছে তো? পয়সাকড়ি মিলছে তো ঠিকঠাক? নাকি প্রেমের জাদুকাঠি নেড়ে তোকে ব্যাপক খাটিয়ে নিচ্ছে?

তিয়ার শুনতে ভাল লাগল না মোটেই। স্যান্ডুইচে কামড় দিয়ে বলল,— যাহ্, সূর্যও কি কম খাটে!... আমি তো কাজ ধরা, মিডিয়া হ্যান্ডলিং, সেলিব্রেটি অ্যাপ্রোচ মেনলি এসব সামলাই। সূর্য বাকি কাজগুলো করে। আর প্রোগ্রামে তো দু'জনকেই একসঙ্গে থাকতে হয়।

ট্রু লাইফ পার্টনার, অ্যাঁ? জীবনসাথী! সোনালির কণ্ঠে কটাক্ষ। চোখ টিপে বলল,— আসলি বাতটা কিন্তু চেপে গেলি!

কী?

তোর মেটিরিয়াল বেনিফিট কত হল?

আপাতত পনেরো নিচ্ছি। সূর্য বলছিল, পুজোর আগে অ্যামাউন্টটা হয়তো বাড়বে।

সূর্য বলছিল মানে? স্টিয়ারিং তা হলে সূর্যর হাতে? তুই গাড়ি ঠেলছিস?

বড্ড আলফাল বকে তো সোনালি! কানেক্টিভিটি সূর্যর ব্রেন চাইল্ড, দেড়-দু'বছর ধরে চালাচ্ছে, স্টিয়ারিং তার হাতে থাকাই তো স্বাভাবিক। হ্যাঁ, এটা ঠিক, মান্থলি পনেরো হাজার এক বারে তিয়ার হাতে আসে না। খেপে খেপে দেয় সূর্য। কখনও বা তিয়াকে চাইতেও হয়। তো কী আর করা, পেমেন্ট আসার ব্যাপারটাও তো ভাবতে হবে। বেচারা সূর্যকেও তো পার্টির চেকের অপেক্ষায় থাকতে হয়, নয় কি? কানেক্টিভিটির লাখ লাখ ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হয়নি এখনও। মার্কেটে ক্রেডিট পড়ে, নতুন কাজ ধরলে আগাম গাঁটের কড়ি ঢালতে হয়, এ ছাড়া অফিসে বিজয়, নীলেশের মাইনে...। সব দিক ব্যালেন্স করে চলার দায়িত্বটা মাত্র তিন মাসেই তিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে সূর্য?

তিয়া ঠোঁট উলটে বলল,— তুই কিন্তু খুব সিনিক হয়ে গেছিস।

এমনি এমনি হইনি ইয়ার। সোনালি কাঁধ ঝাঁকাল,— পুরুষমানুষ তো লাইফে কম দেখলাম না! ওরা কী চিজ, আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

বেশি পুরুষ ঘেঁটেই তোর মাথাটা বিগড়েছে। কথাটা টুপুস ছুড়ে দিল তিয়া। হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে বলল,— যাক গে, তোর খবর বল। ব্যালেরিনাটা গছাতে পেরেছিলি শেষ পর্যন্ত?

পেরেছি। সোনালি কোল্ড ড্রিঙ্কের স্ট্রয়ে ঠোঁট ছোঁয়াল, কিন্তু চুমুক দিল না। মুখ সরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়েছে। কাচের ওপারে দৃষ্টি মেলে বলল,— আমি ভাল নেই রে তিয়াসা।

একেবারে অচেনা স্বর। সোনালির গলা এমনটা কখনও শোনেনি তিয়া। ভুরু কুঁচকে বলল,— কেন? কী হয়েছে?

সেম কোয়েশ্চেন তো আমিও করছি নিজেকে। কী হল? কেন ফালতু ফালতু জড়িয়ে গেলাম?

কীসে জড়ালি?

ওই যে ... মহেশ ... মহেশ শ্রীবাস্তব।

বি-কে ইন্ডাস্ট্রিজের জোনাল ম্যানেজার? যাকে তুই ব্যালেরিনাটা...?

হুম্। কী যে হয়ে গেল... একটু ইন্টিমেট হওয়ার পর মনে হল, ও খুব আনহ্যাপি। আমিও কেমন গ্র্যাজুয়ালি ... মহেশের বউ আছে, বড় বড় ছেলেমেয়ে ..., কিছুই আর মাথায় রইল না। আই অ্যাম ইন লাভ তিয়াসা, কী যে করি!

তিয়া হেসে ফেলল,— তুই? তুই প্রেমে পড়েছিস?

সোনালি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল,— আমি কি ভালবাসতে পারি না? আমার কি মন নেই?

কিন্তু ... একটা ম্যারেড, এজেড লোকের সঙ্গে...?

মহেশ বুড়ো নয় রে তিয়াসা। হার্ডলি ফরটি ফাইভ।

মে বি। তবে তোর চাইতে না হোক বিশ বছরের বড়!

অত বড়, ছোট, মেপেজুপে কি ভালবাসা হয় রে।

ও কে। ও কে। মহেশকে তা হলে ডিভোর্স নিতে বল।

পারবে না রে। ফ্যামিলিতে ভীষণ জড়িয়ে আছে। মাঝখান থেকে বউটা সব জেনে গিয়ে বাড়িতে হেভি অশান্তি। মহেশ তো এখন আমাকে মিট করতে ভয় পাচ্ছে।

তোর মহেশ ব্লাফ মারছে না তো? মে বি তোকে কাটাতে চায়...

না রে তিয়াসা। মহেশ ওই টাইপই নয়। তুই ওকে দেখলে বুঝতিস।

সব বুঝেছে তিয়া। সোনালির থেকে যেটুকু নেওয়ার উশুল করে মহেশ শ্রীবাস্তব মানে মানে ভাগতে চায় এখন। আশ্চর্য, পুরুষদের হাড়হদ্দ জানা সোনালির মতো চালু মেয়েও শেষে বোকা বনে গেল? নাহ, প্রেমের পাওয়ার আছে। দৃষ্টিমানকেও দিব্যি অন্ধ করে দেয়।

তিয়া সোনালির হাতে হাত রাখল,— ফরগেট ইয়ার। লাইফমে কভি কভি অ্যাইসা ভি হোতা হ্যায়। ভুলতেও হয়।

আই কান্ট। পারছি না রে।

খুব পারবি। একটা ঠিকঠাক ছেলে দেখে এবার সেটল্ করে যা তো।

হুম্। সোনালি নাক টানল,— নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছে, জানিস। মা'র একটা অ্যাফেয়ার ছিল বলে... ছিল কেন, এখনও আছে... আই হেট মাই মম। সেই আমিই কিনা মার মতো একটা ম্যারেড লোকের সঙ্গে...! ঠাস ঠাস চড়াতে ইচ্ছে করছে নিজেকে।

তিয়া মনে মনে বলল, এ দাওয়াইটা খারাপ নয়। মুখে বলল,— কাম অন ইয়ার। অনেক প্রিন্স চার্মিং তোর জন্য ওয়েট করছে। গো অ্যান্ড ফাইন্ড দেম।

সোনালি আর কিছু বলল না। নখ খুঁটছে।

অফিসে ফিরে সোনালির গল্পটা সূর্যকে শোনাবে ভেবেছিল তিয়া। সুযোগ পেল না। সূর্য বেজায় সিরিয়াস মুখে স্ন্যাকসের লিস্ট বানাচ্ছে। সামনের সপ্তাহে অর্থোপেডিক ডাক্তারদের একটা সেমিনার আছে কলকাতায়, কানেক্টিভিটি বরাতটা পেয়েছে, পরিকল্পনার শেষ ধাপ চলছে এখন। লিস্ট ধরে টুকটুক করে খাবারের নাম বলছে সূর্য, কম্পিউটারে ঢুকিয়ে নিচ্ছে নীলেশ।

সূর্যর জন্য বারগার এনেছিল তিয়া। ধরিয়ে দিয়ে বলল,— আগে খেয়ে নাও।

হাতে নিল সূর্য, তবে মোড়ক খুলল না। চোখ পিটপিট করে জিজ্ঞেস করল,— কোন বিস্কিটটা বেটার হবে? ক্রিম? না বাটার?

বাটারই দাও। একটু নোনতার দিকে। আসবে তো বেশির ভাগই ফরটি প্লাস, মিষ্টি কেউ প্রেফার করবে না।

কারেক্ট। এইজন্যই তো টিমে একটা মেয়ে দরকার। সূর্যর দু'আঙুলে প্রশংসার মুদ্রা,— ভেজ আইটেম কী কী থাকছে শুনে নাও। ধোকলা, পনির চপ, ভেজ কাটলেট।

আর নন-ভেজে?

চিকেন পকোড়া, ফিস টিক্কা।

এই স্ন্যাকস্ ওরা অ্যাপ্রুভ করেছে?

বলেছে, ওটা আপনাদের লিবার্টি। শুধু কোয়ালিটি যেন ফ্রেশ থাকে। তবে লাঞ্চ ওদের লিস্ট মতো দিতে হবে। আজই রুপোলি কেটারারকে ধরিয়ে দেব।

হোটেল বুকিংয়ের ব্যাপারটা ফাইনাল হল?

ইয়েস। বুকিং আমরা করব, পেমেন্ট ওরা। ডাইরেক্ট। গাড়ি নিয়েও কথা হয়ে গেছে। আগের দিন চারটে, প্রোগ্রামের দিন বারোটা, পরের দিন দুটো। লাস্ট দুটো গাড়ি তিন দিন ধরেই থাকবে। ফ্রম মর্নিং এইট টু এনি টাইম দে লাইক। ... ওহ্ হো, গোটা পনেরো ছেলেমেয়েও তো লাগবে।

অত? আর একটু কম নিলে হয় না? ডাক্তার তো আসবে হার্ডলি সিক্সটি ফাইভ টু সেভেনটি!

না না, কমানো যাবে না। দু'জনকে এয়ারপোর্ট পাঠাতে হবে। কনফারেন্স হলে প্রেজেন্ট থাকবে অ্যাট লিস্ট ছ'জন। প্লাস রিসেপশন। প্লাস ফুড অ্যান্ড বেভারেজের দিকটা দেখা। হোটেলে যারা উঠবে, তাদের জন্যও তো...। সূর্য মৃদু হাসল,— এটা আমাদের লাভের কাজ নয় তিয়াসা। জাস্ট বর্ষাকালটা পার করার জব। অ্যান্ড মাইন্ড ইট, এভরি ডক্টর ইজ আ গুড সোর্স।

হুঁ। তিয়া ঘুরনচেয়ারে বসল,— এবার আমার ইনফর্মেশানগুলো শোনাই? অ্যাকর্ডিং টু ক্রিয়েশান পাবলিসিটি, এই ডিসেম্বরেই সানশাইন একটা নতুন হেয়ার অয়েল বাজারে ছাড়বে।

পরে হচ্ছে। সূর্য হাত তুলে থামাল,— আগে হাতের কাজটা সেরে নিই। টেবিলে ডাক্তারদের লিস্টটা তোলো, পর পর ফোন মেরে যাও। কেউ যদি আনসার্টেন থাকে, নামের পাশে স্টার দিয়ে রাখো। একদমই না এলে, ক্রস।

ব্যস, টেলিফোনের খেল শুরু। চলছে মোবাইলও। কথা, শুধু কথা বলে যাওয়া। নরম ভঙ্গিতে। মিষ্টি গলায়। সূর্যরও ঘাড় ঘোরানোর ফুরসত নেই। হিসেব কষছে, কম্পিউটারে বসছে, টেলিফোন ধরছে, টেলিফোন করছে, ক্রমাগত নির্দেশ দিয়ে চলেছে নীলেশকে। কার রেন্টালের লোকটা এল, তাকে পেমেন্ট নিয়ে খেলাল একটু, তারপর ছোটখাটো চেকও ধরিয়ে দিল একটা। বিজয়কে পাঠাল কেটারারের কাছে। বারগার পড়েই আছে, পড়েই আছে। কখন যে সে ঠান্ডা হয়ে গেল!

দুপুর হেলেছে বিকেলের দিকে। এবার বুঝি ক্ষণিকের অবসর। শুকনো বারগার কচকচ চিবোচ্ছিল সূর্য। মিনারেল ওয়াটারের বোতল খুলে জল খেল। কাগজরুমালে মুখ মুছে বলল,— এবার অফিসে একটা মাইক্রো ওভেন রাখতে হবে।

সেমিনার রুম সাজানোর নকশা তৈরি করছিল তিয়া। হালকাভাবে বলল,— তারপর ফ্রিজ, তারপর গ্যাস... পুরো সংসার পেতে নিলেই হয়।

টু স্টার্ট উইথ ... খারাপ কী? এমন একটা ওয়ানরুম ফ্ল্যাট... বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মতো জায়গা ... কোয়াইট গুড লোকালিটি। বলেই সূর্যর চোখ নীলেশে। কম্পিউটারের কি-বোর্ডে নীলেশের আঙুল নিথর, সূর্য-তিয়ার সংলাপ গিলছে। বুঝি তাদের সম্পর্কটা আন্দাজ করেছে মনে মনে। ভুরুতে ছোট্ট ভাঁজ ফেলে কথার মোড় ঘোরাল সূর্য,— তুমি লাঞ্চ করেছ?

ইয়েস স্যার। আমাদের কফি বারে। ওখানে সোনালির সঙ্গে দেখা।

কী বলে?

বেশ মনমরা। জোর ফেঁসেছে।

ও তো আমার আগেই ফোরকাস্ট করা ছিল। সূর্য শোনার আগ্রহই দেখাল না। চেয়ারে পিঠ টান করে বলল,— বুটিকে আজ কতটা এগোলে?

কাজটা হয়ে যাবে। তবে বায়নাক্কা আছে। ফিল্ম হিরোইনকে দিয়ে ওপেন করাতে চায়।

হিরোইনদের রেট বলেছ?

ওই নিয়েই একটু কিন্তু-মিন্তু করছে। তবে পটে যাবে। মিডিয়া কভারেজের ব্যাপারেও ভীষণ লোভ। নিউজ পেপার আর টিভিতে বিষ্ণুপ্রিয়া বুটিকের ছবি চাইই চাই। এবং অবশ্যই বিষ্ণুপ্রিয়া মজুমদারেরও। ... আমিও বলে দিয়েছি, পপুলার পারসোনালিটি এলে তবেই কিন্তু মিডিয়ার দর্শন মিলবে।

কাজটা কিন্তু ছাড়া নেই। তানেজাটা বহুত ঝুল দিল, এসব খুচখাচ করে করেই এখন টানতে হবে।

তানেজারটাও পাব। প্রোব্যাবলি পিছিয়ে ডিসেম্বরে হচ্ছে। আমি তো উসকে এসেছি, সেমিনারটা সি-সাইডে করুন, দারুণ ইন্টারেস্টিং হবে। আর কাছাকাছি করতে চাইলে রায়চক। পসিবলি, আইডিয়াটা খেয়েছে।

দ্যাখো চিঁড়ে ভেজে কিনা। ব্যাটা কানেক্টিভিটির পয়সায় আরও হুইস্কি ধসাবে মনে হয়। সূর্য কপালে আঙুল ঘষছে। হঠাৎ ঘড়ি দেখে বলল,— এই, তুমি আর দেরি কোরো না, বেরিয়ে পড়ো। তোমার সাড়ে চারটেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট না?

পাঁচটায়।

ওই হল। ট্রেনে সোনারপুর যাবে, কতক্ষণ টাইম লাগে, না লাগে...।

তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?

আমাকে তো ইভিটায় যেতে হবে। রান্নার ওয়ার্কশপটার রেট ফাইনাল করব না?

হিহি। তিয়া হেসে ফেলল,— কী কাণ্ড বলো তো? কুকিংয়েরও ওয়ার্কশপ?

করুক বাবা করুক। রান্না, ঘর সাজানো, জামাকাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা, যা খুশির ওয়ার্কশপ করুক। অর্ডারটা আমরা পেলেই হল। সূর্য উঠে পড়ল,— চলো তোমাকে বালিগঞ্জ স্টেশন অবধি লিফট দিয়ে দিই।

ট্রেনে ঠাসাঠাসি ভিড়। সোনারপুরে নামল যখন, তিয়ার গলদঘর্ম দশা। এখানে কাজটা ছোট, তবে উপেক্ষা করার জো নেই। এ রাজ্যেরই এক মাঝারি গুঁড়োমশলা নির্মাতা সরষের তেল বানানো শুরু করেছে সম্প্রতি। বিভিন্ন জেলার বাজারে সংস্থাটি একটু প্রচার দিয়ে ঢুকতে চায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'রুচি' গুঁড়োমশলার মূল মজুতদার সোনারপুরের। তারই ঠিক করা জায়গায় ছোটখাটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রুচি সরষের তেল জাহির করবে তার আগমন বার্তা। অনুষ্ঠানটা তোলার কাজ তিয়াই জোগাড় করেছে ঘুরে ঘুরে। অতএব স্টকিস্টের সঙ্গে আলোচনা করে গোটা জেলার ডিলার আর বড় বড় দোকানদারদের জড়ো করার প্রাথমিক দায়িত্বটাও তিয়ার।

দেখা হল মধ্যবয়সি লোকটার সঙ্গে। আলাপ আলোচনাও। নেমন্তন্নর একটা লম্বা ফিরিস্তি ধরাল লোকটা। ডিলারদের কী ধরনের উপহার পছন্দ, তা নিয়েও মতামত জানাল। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল, কলকাতার মতো কেক-পেস্ট্রির বাক্স এখানে অচল, মফস্‌সলের মানুষগুলোকে মাংস-ভাত খাওয়াতেই হবে। আর মূল অনুষ্ঠানে একটা গায়ক-টায়ক ছাড়তে পারলে আমন্ত্রিতরা নাকি ভারী অভিভূত হয়।

মনে মনে হিসেব কষতে কষতে স্টকিস্টের ঘর থেকে বেরোল তিয়া। মোটামুটি চলনসই একজন গায়ক বা গায়িকা কত নিতে পারে? পনেরো? কুড়ি? গিফট... দেওয়াল ঘড়ি। কোয়ার্টজ্ ক্লক লটে রাধাবাজার থেকে কিনলে পার পিস একশোর বেশি পড়বে না। লোক আসবে শ'খানেক, অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়াতে দশ। উঁহুঁ, আর একটু বেশি। নয় পনেরোই হল। এ ছাড়া আরও বিশ-পঁচিশ হাজার তো আছেই...। অর্থাৎ রুচিকে রেটটা দিতে হবে পঁচাশি থেকে নব্বইয়ের মধ্যে। কিংবা এক লাখ। তারপর

টানামানি। আহা, কম লাভই সই, অন্য ডিস্ট্রিক্টের কাজগুলো তো জুটতে পারে।

কী ম্যাডাম, আপনি আমাদের পাড়ায়?

চমকে তাকাল তিয়া। ইন্দ্রজিৎ!

পরনে সেই পোশাক, মুখে সেই হাসি।

ভুরু নাচিয়ে তিয়া বলল,— সোনারপুর কবে থেকে নরেন্দ্রপুরে ঢুকে পড়ল? ... আমি কাজে এসেছিলাম...

আমিও। বাজারে কটা লাউ-লঙ্কা-কুমড়ো দিয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে যা সব্বোনাশটা হল, বাব্বা!

খুব ক্ষতি হয়েছে বুঝি?

সময় আছে? চলুন না, স্বচক্ষে দেখবেন।

নাকমুখ কুঁচকে তিয়া ভাবল একটু। পৌনে ছ'টা বাজে, অফিস ফিরে লাভ নেই, সূর্য আর আসবে না। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকেই বা করবে কী? আজ একবার ঘুরে গেলে হয়। সেই ভারী বর্ষার আগে এসেছিল আর একবার। তাও প্রায় দিন পনেরো-কুড়ি হল। কমল-গণেশরা খুব খুশি হয়েছিল সেদিন। হাতের ইঙ্গিতে আবার যেতে বলেছিল।

ভাবছেন কী? তাড়া আছে খুব?

না, চলুন। এদিক ওদিক তাকাল তিয়া,— আপনার রথ কোথায়?

ওই তো। দূরে আঙুল দেখাল ইন্দ্রজিৎ,— এই ভিড়ে কি গাড়ি রাখা যায়?

মারুতি অবধি পৌঁছে তিয়া অবাক। নয়ন গাড়িতে বসে। চকচক করছে চোখ দুটো।

সামনের সিটে বসে তিয়া বলল,— ওমা, এ সঙ্গে আছে বলেননি তো?

ওই তো আমায় দেখাল। ইন্দ্রজিৎ গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। সদ্য নির্মিত উড়ালপুল পেরোতে পেরোতে বলল,— কী জাদু যে করেছেন আপনি! প্রায়ই আমাকে খোঁচায়, দিদিকে ডাকো! দিদি যে কত ব্যস্ত মানুষ, সে তো ওদের মগজে ঢুকবে না!

সত্যি, বড্ড চাপ। তিয়া ঘাড় ঘোরাল। কেটে কেটে নয়নকে জিজ্ঞেস করল,— লুউউডোও খেএলছও?

ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে প্রশ্নটা পড়তে পেরেছে নয়ন। ঘাড় এক দিকে ঝুলে গেল।

ইন্দ্রজিৎ বলল,— শুধু খেলছে না, খেলতে খেলতে ঝগড়াও চলছে। চারখানা সেট দিয়েছিলেন, তার মধ্যে দুটো বোর্ড ভেঙে টুকরো।

এক্সেলেন্ট। এবার ওদের জন্য একটা লুডোর ট্যুর্নামেন্ট চালু করে দিন।

উদ্‌বোধনটা আপনি করবেন তো? সেদিন হোল ডে থাকবেন, বেশ খাওয়াদাওয়া হবে। চড়ুইভাতির মতো।

ইচ্ছে তো করে। কিন্তু হয়ে যে উঠবে না, তাও তিয়া বিলক্ষণ জানে।

ফাঁপা আশ্বাসবাণী শোনাল না তিয়া। তবে কথা বলছে দুলকি চালে। গাড়ি কামরাবাদের রাস্তা দিয়ে যেরকম নাচতে নাচতে চলেছে, অনেকটা সেই রকম। পথের ঘোরপ্যাঁচ পেরিয়ে তিয়া যখন হ্যাপি হোমে পৌঁছোল, সূর্য প্রায় ডুবুডুবু।

ভেতরে ঢুকে সবজি খেতের দিকে যাচ্ছিল তিয়া, ইন্দ্রজিৎ হা হা করে উঠেছে,— উঁহুঁ, ওখানে এখন সাপখোপ ঘুরছে ম্যাডাম। দূর থেকে দেখুন।

সাপ? তিয়া ত্রস্ত,— পয়জনাস্?

ছোবল খেয়ে তো দেখিনি ম্যাডাম। ইন্দ্রজিৎ হো হো হাসল,— আমি ভিতু মানুষ, প্রয়োজন না হলে বর্ষাকালে ওদিকে ঘেঁষি না। তাও হাতে লাঠি থাকে, ঠুকতে ঠুকতে যাই।

কথার মাঝেই ছেলেরা সদলবল হাজির। নয়ন বুঝি ছুট্টে গিয়ে খবর দিয়েছিল। হাত-চোখ-মুখ নেড়ে উল্লাস দেখাচ্ছে সবাই। লুডো খেলায় কে কত পারদর্শী, জানাচ্ছে সগর্বে। ডাকছে ওদের ঘরে যাওয়ার জন্যে।

অজানা এক অনুভূতি জাগছিল তিয়ার হৃদয়ে। কী এমন মহামূল্যবান বস্তু দিয়েছে সে, তাতেই এত কৃতজ্ঞতা? এখনও এমন তুচ্ছ জিনিসে আনন্দিত হতে পারে মানুষ? অথচ ওই একই দুনিয়ায় তিয়ারাও তো আছে। যাদের শুধু চাই চাই ... চাহিদার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। কী আশ্চর্য, তৃপ্তিও নেই যেন। গত মাসেই তো শ'তিনেক টাকার একটা লিপস্টিক কিনল তিয়া, বড়জোর চার-পাঁচ দিন মেখেছে, চোখে একটু চড়া লাগছে বলে প্রায় বাতিল, হয়তো আর ছুঁয়েও দেখবে না কোনওদিন। বিউটি পারলারে পাক্কা ন'শো টাকা গুনে চুলে অবার্ন কালার করাল, পছন্দ হল না, এক মাস পরে ফের ন'শো, ফের বারগেন্ডি। এক অদৃশ্য তাড়না যেন ছোটাচ্ছে, ছোটাচ্ছে... চটকদার বিজ্ঞাপন ডাকছে হাতছানি দিয়ে। ওই সব প্রলোভনের বাইরে থাকে বলেই কি বোবা-কালা ছেলেগুলো এত অল্পে তুষ্ট?

জল-ডোবা খেতে চোখ বোলানোর পর নয়ন-কমলদের আস্তানায় মজায় কাটল খানিকক্ষণ। সেখান থেকে তিয়া যাচ্ছিল অফিসঘরে। বিকেল ফুরিয়ে এল, সন্ধে ডানা মেলছে। মেঘ ঘনাচ্ছে আকাশে, হাওয়া নেই। কেমন গুমোট গুমোট লাগে।

অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তিয়া বলল,— দিব্যি আছেন কিন্তু আপনারা।

ইন্দ্রজিৎ ঘাড় বেঁকাল,— কেন? আপনারা কি মন্দ আছেন?

কী জানি। বুঝতেই পারি না। সারাক্ষণ দৌড় দৌড় ...

সে তো আপনাদের বেছে নেওয়া জীবন। ... আপনাদের সঙ্গে আমাদের বড় তফাতটা হল, আপনাদের পছন্দ-অপছন্দকে ঠিক করে দিচ্ছে বাজার। ইউ আর গাইডেড বাই দা মার্কেট। আর আমরা চেষ্টা করছি যথাসম্ভব তার বাইরে থাকতে। বলেই ইন্দ্রজিৎ ফের জোরে জোরে হাসছে,— নাহ্, এসব বলারও কোনও মানে হয় না। আমরাও তো ওই বাজারের ওপরই ডিপেন্ডেন্ট। যাদের মাল বেচি, তারাও বাজার। যারা আর্থিক সাহায্য দেয়, তারাও বাজার।

হুম্‌ম্‌।

তা আমার সেই স্পনসরদের কাছে যাওয়ার কী হল? চলুন না, এবার একদিন নক্ করে আসি।

উত্তর দেওয়ার আগেই মোবাইলে সুর। বিশেষ গান, বিশেষ লোক।

ফোন কানে লাগিয়ে তিয়া বলল,— হ্যাঁ সূর্য, কাজ হয়েছে। রেটও বানিয়ে ফেলেছি মোটামুটি।

গুড। ... এখন কোথায় তুমি?

নরেন্দ্রপুর। হ্যাপি হোমে।

হোয়াট? সোনারপুর থেকে ওখানে চলে গেছ?

হ্যাঁ। হঠাৎ ইন্দ্রজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা ...

ওমনি তুমি নাচতে নাচতে...! স্ট্রেঞ্জ, একবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করলে না? এসব কী ধরনের আহ্লাদিপনা, অ্যাঁ? অফিসের একটা ডেকোরাম আছে, ফিরে এসে ডিটেল রিপোর্ট দেবে...

এ তো অবিকল মালহোত্রা অটোমোবাইলসের সেল্‌স ম্যানেজারের কণ্ঠ! তিয়া ক্ষুব্ধ গলায় বলল,— তুমি তো বলে যাওনি আবার অফিসে আসবে!

কী বললাম, না বললাম, সেটা বড় কথা নয়। তোমায় রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে, সো ইউ শুড কনট্যাক্ট মি, অ্যান্ড রিপোর্ট। একটা কল পর্যন্ত করলে না? কোথাকার এক হ্যাগার্ডের সঙ্গে এখন প্রেমসে ফুর্তি মারছ?

ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে গেছে। তাকে একবার দেখে নিয়ে তিয়া চাপা স্বরে বলল,— বিহেভ ইয়োরসেলফ্। কী যা তা বলছ!

কিচ্ছু বাজে বলিনি। আমি এসব লাইক করি না। সূর্যর গলা সামান্য নামল,— কাজের সময়ে আগে কাজ। তারপর অন্য কিছু।

ঠিক আছে। কাল কথা হবে। ছাড়ছি।

ব্যাগে ফোন রেখে তিয়া স্থির দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। কান ঝাঁ ঝাঁ। এ কী টোনে কথা বলে সূর্য? তিয়া কি সূর্যর কর্মচারী? হুকুম চালায় কোন সাহসে? এমনিই তো সর্বক্ষণ বস্ বস্ এয়ার নিয়ে চলে। যেভাবে বলবে, সেভাবেই চলতে হবে তিয়াকে! নাহ্, কাল অফিসে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত চাই। কষে ঝাড় দেবে, তা হলে যদি সূর্য সিধে হয়! এত চটার কী আছে? উঁহুঁ, অফিসে ফেরার ব্যাপারটা স্রেফ ঢপ। তিয়া নরেন্দ্রপুরে এসেছে বলেই...। সূর্য কি হিংসে করছে ইন্দ্রজিৎকে? না না, এ মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। সন্দেহের পোকা ব্রেনে ঢুকলে সম্পর্ক চিড় খেয়ে যায়। নিজের বাবা মাকে দেখছে না তিয়া? মা নাটকের গ্রুপে ছুটছিল, বাবা ওমনি অংশু রায়কে হিংসে করে পুড়তে লাগল। আর কি জুড়ল সম্পর্কটা? না, খ্যাপাটাকে ঠিকঠাক সমঝাতে হবে, কীসের টানে হ্যাপি হোমে আসছে তিয়া। জোর করে এখানে একবার ধরে আনলে হয় সূর্যকে। দেখেশুনে নিজেই বুঝুক। বেসিক্যালি তো সূর্য ছেলে খারাপ নয়। তিয়াকে ভালবাসে...

ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করল,— কী ম্যাডাম, চা বসাব নাকি?

তিয়া অন্যমনস্ক মুখে বলল,— নাহ্, আজ যাই।

আরজেন্ট ডাক এল বুঝি?

তিয়া উত্তর করল না। হাসার চেষ্টা করল শুধু।

ইন্দ্রজিৎ কাছে এল,— অল রাইট, তা হলে আর আটকাব না। ... আমার স্পনসরের কেসটা কী করছেন? পারবেন তো যেতে?

সূর্যর স্বর কানে বেজে উঠল, আমি এসব লাইক করি না...! তিয়ার চোয়াল শক্ত সহসা। সে কি সূর্যর কেনা বাঁদি? তার লাইক, ডিজলাইকই মানতে হবে সর্বদা? তিয়ার নিজের ভাল লাগা, না লাগা নেই?

তিয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,— না পারার কী আছে? নেক্সট্ উইকে ফোন করবেন, ডেট বলে দেব।

ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে। তিয়া ছাতা খুলল।

বারো

কলেজের নোটিশবোর্ডের সামনে থিকথিকে ভিড়। একটু আগে রেজাল্ট টাঙিয়েছে, তারপর থেকে চলছে ছেলেমেয়েদের ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি। পাশ ফেলের তালিকা দেখে সরে আসার পর কারও চোখ জ্বলজ্বল, কারও বা মুখ তোলো হাঁড়ি।

বোর্ডে সাঁটা কাগজটায় অস্থির ভাবে চোখ ঘুরছিল তিতানের। একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার। খানিক উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বেরিয়ে এল জটলা থেকে। বুকটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। হাত পায়ে যেন জোর নেই। হাঁটু কাঁপছে ঠকঠক।

শ্রেয়া রাজ্যশ্রীরা তফাতে দাঁড়িয়ে কলকল করছিল। তুরতুরে পায়ে দৌড়ে এল শ্রেয়া। চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল,— কী হল রে সায়র? সব ঠিকঠাক তো?

না বলতে জিভ আটকে গেল তিতানের। ঠোঁট চেপে জোরে জোরে মাথা নাড়ল দু'দিকে।

নাম নেই?

দেখছি না তো।

ও নো! কী হবে এখন?

কী যে হবে, তা কি তিতানও জানে? সে কি আগে ফেল করেছে কখনও? লেখাপড়ায় যেমনই হোক, পাশ তো করে যায় বরাবর। ইউনিভার্সিটির প্রথম পরীক্ষাতেই কিনা দুর্ঘটনা ঘটে গেল?

শ্রেয়ার চোখ ছলছল করছে,— কোনও মানে হয়?

তিতান ভারী গলায় বলল,— দেখছি তো হয়।

তুই তো বলেছিলি, পরীক্ষা খারাপ দিসনি...?

তিতানেরও তো সেইরকমই অনুমান ছিল। আনসারগুলো হয়তো গুছিয়ে লিখতে পারেনি, একটু আধাখেঁচড়া মতন হয়েছিল, তা বলে একেবারে পাশ না করানোটা কি উচিত কাজ হল? মাস্টারদের এ কী ধরনের শয়তানি? ফেল করিয়ে কী আনন্দ পায়?

শ্রেয়া তিতানের হাত ধরে টানল,— মন খারাপ করিস না। আয়, কোথাও বসি।

কোথায় বসব? ভাল্লাগছে না।

ওরকম করে না, আয়। প্লিজ।

করিডর পেরিয়ে লাইব্রেরির সামনের ধাপিটায় বসেছে দু'জনে। শ্রেয়া নরম গলায় বলল,— এত ভেঙে পড়ছিস কেন? ইউনিভার্সিটির রেজাল্টের শিটে হয়তো ভুলভাল আছে। মার্কস এলে দেখবি হয়তো পাশ করে গেছিস।

সত্যি সত্যি ভেঙে পড়েছে বলেই বোধহয় দপ্ করে জ্বলে উঠল তিতান। শ্রেয়া কি মলম লাগাচ্ছে?

তিতান বিরক্ত গলায় বলল,— কানের কাছে ফ্যাচফ্যাচ করিস না তো। বললাম না, আমার ভাল লাগছে না।

যাহ্ বাবা, আমাকে বকছিস কেন? বিলিভ মি, আমিও খুব শকড্।

তা হলে মুখে ফেবিকল সেঁটে বসে থাক।

গত দু'-তিন মাসে শ্রেয়ার সঙ্গে তিতানের সম্পর্কটা ঘন হয়েছে আরও। পরীক্ষার পরও দেখাসাক্ষাৎ চলেছে নিয়মিত। কখনও ঢাকুরিয়া লেক, কখনও সিনেমাহল কিংবা স্রেফ রাস্তায় ট্যাঙোশ ট্যাঙোশ। কে জানে কেন, বাড়িতে আর ডাকেনি শ্রেয়া। ভয় পেয়েছে কি? তিতানও অবশ্য যেচে যেতে চায়নি। কেন চাইবে? সে সায়র মিত্র, কোনও ভুক্কার পার্টি নয়। তা ছাড়া লেক-টেকই বা মন্দ কী, দুঃসাহসী হয়ে উঠতে তো বাধা নেই। এক নিরালা দুপুরের জেরে শ্রেয়ার তুলতুলে শরীরটার ওপর সায়র মিত্রর যে একটা অধিকার জন্মে গেছে, এ ব্যাপারে তিতান পুরো মাত্রায় সচেতন। এবং এখন সে শ্রেয়াকে দাবড়াতেও পারে। অনায়াসে।

তা শ্রেয়া কি চুপচাপ বসে থাকার পাত্রী? বকুনি খেয়েও উশখুশ করছে। একবার বর্ষাশেষের নীল নীল আকাশটা দেখল, পরক্ষণে চোখ নেমেছে ঘড়িতে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

তিতান গোমড়া মুখে বলল,— কী হল? এত ছটফটানি কীসের?

পলা রাজ্যশ্রী বোধহয় খুঁজছে আমাকে। একবার ঘুরে আসি? পাঁচ মিনিট।

কোথ্থাও যাওয়ার দরকার নেই। গেলে আর আসতে হবে না।

শ্রেয়া পালাতে পারল না। তবে বিচিত্র সব মুখভঙ্গি করেই চলেছে। আর আড়ে আড়ে দেখছে তিতানকে। তার এই আটকে যাওয়াটা, এমন বিচ্ছিরি মুহূর্তেও, বেশ লাগল তিতানের। পরীক্ষার ফল তার ভার কমিয়ে দেয়নি তা হলে!

কলেজের এই দিকটা ছেড়ে তিতানের উঠতে ইচ্ছে করছিল না। সামনেটায় যাওয়া মানে অজস্র ড্যাবডেবে চোখ, কলেজময় নির্ঘাত এতক্ষণে চাউর হয়ে

গেছে তিতান গাড্ডু, ঠিকরে ঠিকরে আসবে সমবেদনা, বিস্ময় ... নাহ্, সহ্য হবে না সায়র মিত্রের।

কিন্তু এখানেই বা শান্তি কোথায়? হঠাৎ কোথ্থেকে পল্লব এসে হাজির, প্রায় মাটি ফুঁড়ে। ধপ করে বসল পাশে। পিঠে হাত রেখে বলল,— কাম অন সায়র, বি স্টেডি। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

শ্রেয়া আদুরে গলায় বলল,— দ্যাখ না, আমি তো ওকে সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি। পরীক্ষাতে তো এমন হয়েই যায়, তাই না?

চোপ। তিতান মৃদু ধমক দিল। ঘুরে পল্লবকে বলল,— তোর তো ডান্স করা উচিত।

কেন?

তুই তো চেয়েইছিলি সায়রটা ফেল করুক।

আমার সম্পর্কে এরকম ভাবতে পারলি? পল্লব রীতিমতো আহত,— তোকে আমি পরীক্ষার আগে বলিনি, যদি প্রিপারেশানে গলতি থাকে তো এবারটা ড্রপ মেরে দে?

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। তবু একটুও সান্ত্বনা পেল না তিতান। মনে হল, এটাও এক ধরনের হ্যাটা। পল্লব যেন পরীক্ষার আগেই বুঝে ফেলেছিল এবার কোনও ভাবেই টপকানোর সাধ্য নেই তিতানের!

তিতান নয়, সায়র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল,— ছাড় তো। আমি আর রেজাল্ট ফেজাল্ট নিয়ে ভাবছি না। বাইগন্স আর বাইগন্স।

বাচ্চাদের মতো করিস না। আমরা কি বুঝছি না, তুই কতটা হার্ট হয়েছিস? বাবা বলে...

পরীক্ষায় ফেল নিয়েও তোর বাবার কোনও গপ্পো আছে বুঝি?

পল্লব রাগল না। শান্তভাবেই বলল,— শোন, তুই তো আর রেগুলার স্টুডেন্ট থাকছিস না, একটা বছর কলেজে আসা কমিয়ে দে। পার্টি-ফার্টি হঠা, তেড়ে খাট, তোর সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, নেক্সট ইয়ার এক দাঁড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবি।

ঝাং করে তেতে গেল সায়র মিত্র। ভেংচে বলল,— অ্যাই, কপচাস না তো। পাশ করেছিস, বাড়িতে খিল এঁটে পড় গে যা। ফের যদি তোকে ইউনিয়ন-রুমে দেখেছি...

পল্লব একটা শ্বাস ফেলে হাত উলটোল। শ্রেয়াকে একবার আড়চোখে দেখে চলে যাচ্ছে ধীর পায়ে।

শ্রেয়া মিনমিন করে বলল,— পল্লব তোকে খারাপ কিছু তো বলেনি!

ভাল খারাপের তুই কী বুঝিস? পল্লবটা বহুত দু'নম্বরি। আউট অ্যান্ড আউট ধান্দাবাজ। শালা পার্টিকে ইউজ করছে...

আহা, সে তো তুইও করিস।

নো। সায়র মিত্র পার্টিকে ইউজ করে না। সে নিজেই পার্টি... আই মিন, পার্টিরই একজন।

আমি বাবা অত মারপ্যাঁচ বুঝি না। পল্লব যেমনই হোক, তোর না পড়াশুনো করার কী আছে?

ট্যাকট্যাক করিস না তো। বসতে ইচ্ছে না হলে যা ভাগ, কেটে পড়। রাজ্যশ্রীদের গলা জড়িয়ে হিহি কর।

নতুন ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। এক ঝাঁক এসে এমন কিচিরমিচির শুরু করল, লাইব্রেরির সামনে আর তিষ্ঠোনো যাচ্ছে না। এরই মধ্যে বাড়ি থেকে ফোন। মা।

কী রে? কী খবর?

গলা ভারিক্কি করে তিতান বলল,— গিয়ে বলব।

পাশ করেছিস তো?

বললাম তো, গিয়ে বলব।

কখন আসছিস?

বলতে পারছি না।

কট্ করে ফোনটা কেটে দিল তিতান। বিস্বাদ মেজাজ এখন নিমতেতো। মাকে বড় কায়দা মেরে বলেছিল, পাশ ফেল নিয়ে ভাবতে হবে না... ফিরে কী বলবে এখন?

চিন্তিত মুখে উঠল তিতান। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টের পেল মাঝপথে শ্রেয়া ভিড়ে গেল একটা দলে। তিতান যেন দেখেও দেখল না। সোজা চলে গেছে কলেজের অফিসরুমে। হ্যাঁ, উৎপলবাবুর টেবিলে পৌঁছে গেছে মার্কশিট। সামনে যতীনবাবুকে বসিয়ে দু'জনে মিলে মার্কস তুলছে জাবদা খাতায়।

উৎপলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল তিতান। বলল,— কাইন্ডলি আমার মার্কসগুলো একটু দেখব?

এখন না, এখন না। দু'হাত নেড়ে উৎপল বলল,— শান্তিতে কাজটা ফিনিশ করতে দাও।

একটা মার্কশিট বার করতে কী এমন অসুবিধে? তিতান পলকে সায়র মিত্র। কোমরে হাত রেখে বলল,— প্রিন্সিপালের অর্ডার আনতে হবে নাকি?

উফ্, কী যে করো না...! উৎপল এক ডোজেই নরম। রোল নাম্বার ঘেঁটে বার করেছে কাগজটা। বলল,— চটপট দেখে দাও।

দেখার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। নম্বরগুলোর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। দশ, বারো, ষোলো...। শুধু কম্পালসারি গ্রুপটাই চলনসই। পরিবেশবিদ্যায় মাত্র তেরো!

তিতান দুর্বল পায়ে বেরিয়ে এল। বুকে বুঝি ক্ষীণ আশা ছিল একটা, তাও ভেঙে চুরমার। দমাদ্দম হাতুড়ির ঘা পড়ছে মাথায়। এতক্ষণে বুঝি যেন তার ফেল করাটা সম্পূর্ণ হল। এবার কী করবে? কোথায় যাবে? বাড়ি? নাকি একবার পার্টি অফিসে...? পল্টুদা না বলেছিল...! কিছু একটা নিশ্চয়ই করতে পারবে পল্টুদা। কিন্তু এখন, এই সাড়ে তিনটে-চারটের সময়ে, ব্যস্ত মানুষটাকে কি পাওয়া যাবে?

প্রযুক্তির কল্যাণে যোগাযোগ এখন হাতের মুঠোয়। নম্বরও রয়েছে পল্টু বিশ্বাসের।

হ্যালো, পল্টুদা? সায়র বলছি।

আরে, কী খবর? তোমায় ক'দিন দেখছি না কেন?

এই তো, আজ যাব ভাবছি। আপনি থাকবেন? আপনার সঙ্গে একটা জরুরি দরকার ছিল।

চলে এসো। ঘণ্টাখানেক পর।

একটা ঘণ্টা যে এত লম্বা হয় তিতানের জানা ছিল না। ঘড়ির কাঁটা যেন লেংচে লেংচে চলছে। এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে বার দু'-তিন দেখতে পেল শ্রেয়াকে, অমিত-শ্রীমন্তদের সঙ্গেও মোলাকাত হল বেশ কয়েক বার, তিতান কথাও বলল দাঁড়িয়ে, কিন্তু সময় আর এগোয় না। শেষে ধুস্ বলে বেরিয়েই পড়ল কলেজ ছেড়ে। হাঁটছে। দুলে দুলে।

ভাদ্রের আকাশ বিচ্ছিরি রকমের নীল। রোদ এখনও গা জ্বালাচ্ছে। পাছে সূর্যকে ঢাকা দিতে হয়, মেঘেরা তাই বেবাক উধাও। এক রত্তি হাওয়া নেই। পচা গুমোটে গেঞ্জি জামা ঘামে জবজব। তিতানের অন্যমনস্ক পা ঠোক্কর খেল রাস্তায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনওক্রমে সামলেছে।

পল্টু বিশ্বাস আজ অফিসে একা। সাদা ফুলস্কেপ কাগজে কী যেন লিখছিল। তিতানকে বসতে বলে শেষ করল কাজটা। তারপর চোখ তুলেছে,— বলো কী ব্যাপার।

যা বলার বলল তিতান। শুধু নম্বরগুলো উচ্চারণ করল না। লজ্জা করল।

চোখ থেকে চশমা খুলে রুমালে মুছল পল্টু। ফের পরে নিয়ে বলল,— হুম, খুব দুর্ভাগ্যজনক। দেবাশিস কি ভাল নোট-ফোট দেয়নি?

টিউটোরিয়ালে আর যেতে পেরেছি কোথায়! প্রায় রোজই তো পার্টির কাজে...

আমি কিন্তু তোমায় আগাগোড়াই বলে আসছি, পড়াশুনোটা মাস্ট। টিউটোরিয়ালের ওপরও ডিপেন্ড করতে তোমায় মানা করেছিলাম। ঠিক?

অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আপনাআপনি তিতানের ঘাড় ঝুলে গেল।

চেয়ারে হেলান দিয়েছে পল্টু,— এনি ওয়ে, আপসেট হোয়ো না। একটা পরীক্ষায় পাশ-ফেল এমন কোনও হাতিঘোড়া ব্যাপার নয়। ইনফ্যাক্ট, এক-আধটায় ফেল করাই ভাল। ব্যর্থতার আগুনই মানুষকে পুড়িয়ে সাচ্চা করে। আর আমরা সাচ্চা কমরেডই চাই।

কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন... পরীক্ষার ব্যাপারটা... দেখবেন...

তুমি কী আশা করছ সায়র? পার্টি তোমার মার্কস বাড়িয়ে দেবে? এমন একটা অনৈতিক কাজ কি আমরা করতে পারি?

তিতান বলে ফেলল,— তা হলে আর কীভাবে সাহায্য করবেন?

শোনো সায়র, ইংরিজিতে একটা প্রবাদ আছে, গড হেলপ দোজ, হু হেলপ দেমসেল্‌ভস্‌। আমরা তো ঈশ্বর মানি না, তাই আমরা বলি, পার্টি হেলপ দোজ, হু হেলপ দেমসেল্‌ভস্‌। তুমি কিন্তু নিজের কাজটা করোনি। এখন পার্টিকে দুষলে চলবে কেন?

এই নিশ্ছিদ্র যুক্তিজালের সামনে তিতানের কী বলার থাকে?

পল্টু কোমল গলায় বলল,— যাক গে, লং টার্ম গোলের কথা ভাবলে তোমার হয়তো আল্টিমেটলি উপকারই হল। ছাত্রফ্রন্টে তুমি একটা বছর বেশি কাজ করতে পারবে। ... তুমি ভবিষ্যতের যোদ্ধা, এত অল্পে তোমার ভেঙে পড়লে চলবে?

বাক্যের কী অপরূপ মহিমা! মিইয়ে যাওয়া তিতান চাঙ্গা হচ্ছিল ক্রমশ। গলা ঝেড়ে বলল,— তা হলে পড়াশুনো স্টার্ট করি...

এ কি বলার অপেক্ষা রাখে নাকি? আরে, পাশ-টাশগুলো তো তোমাকে করতে হবে। তারপর তো আমরা আছি। সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেকে তো প্রফেসর করে দেওয়া যায় না! তাকে অন্তত এম এ-র গণ্ডিটা পার হতে হয়, ইউ-জি-সির ফ্যাকড়াগুলো সামলাতে হয়...। অর্থাৎ আমাদের 'পিক অ্যান্ড চুজের' জায়গাটায় তোমাকেই পৌঁছোতে হবে। তুমি যদি ভাবো স্কুলের চাকরির পরীক্ষায় পার্টি তোমার হয়ে লিখে দিয়ে আসবে, সেটা কি বাড়াবাড়ি নয়? আমরা নীতি মেনে চলি সায়র, ইন্টারভিউতে এলে তোমায় ঠিক তুলে নেব। বাট এই সব অ্যাশিওরেন্স তখনই খাটবে, যখন তুমি পার্টির মেশিনারির সঙ্গে খাপে খাপে মিশে যাবে। বুঝেছ কী বলতে চাইছি?

হ্যাঁ। আমি তো সাধ্যমতো করছি পল্টুদা।

জানি তো। তাই তো তোমায় এত স্নেহ করি। ... যাক গে, একটা খবর দিই। শুনে আনন্দ পাবে। আমি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে নমিনেটেড হয়েছি।

তাই? কনগ্র্যাচুলেশন্স পল্টুদা।

বুঝতেই পারছ, আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। ...আর কী, মনটা এবার ভাল করো। একটু চা-কফি খাও।

আরও যে কত কথা হল পল্টু বিশ্বাসের সঙ্গে। এ যেন ভীষ্মের পায়ের কাছে বসে যুধিষ্ঠিরের রাজনীতির শিক্ষা নেওয়া। শুধু পল্টু শরশয্যায় নেই, পার্টিতে এক ধাপ উঠেছে, এটুকুই যা তফাত। নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিল তিতানের। পল্লব যা বলেছিল, এ যদি খাঁচাও হয়, তার জন্য দুঃখ কীসের? মানে মানে পাশটুকু করতে পারলে জলটা ছোলাটার তো অভাব হবে না। একই সঙ্গে ছাত্রফ্রন্ট আর পার্টি, দু'জায়গাতেই তার পা রইল।

সন্ধেবেলা তিতান যখন বাড়ি ফিরল, মনে গ্লানির ছিটেফোঁটাও নেই। বরং অবাক হয়েছে বেশ। হের্ পপ্ এসে গেছে জলদি জলদি! এবং বোতল খোলেনি এখনও! নিউজ দেখছে টিভিতে! পাশে মা! স্নায়ু টানটান রেখে নিঃশব্দে নিজের ঘরে যাচ্ছিল তিতান, বাবার গলার শব্দে দাঁড়িয়ে গেল,— ডাকছ?

তুহিনের কপালে ভাঁজ,— তোমার মার্কশিট পেয়েছ?

তিতান থমকাল। ঠিক এই প্রশ্নটির জন্য বুঝি প্রস্তুত ছিল না মগজ। একটু সময় নিয়ে বলল,— না। পরশু ইস্যু করবে।

হাতে এলে একবার দেখিও। আফটার অল, আমরা তো তোমার বাবা মা।

তুহিনের স্বর অদ্ভুত রকমের তাপহীন। জোর একটা ধাক্কা খেল তিতান। সে ধরেই নিয়েছিল, বাবা জোর হল্লাগুল্লা জুড়বে, পাত্তা না দিয়ে পালটা জবাব দিয়ে যাবে সে, নিজের ওজনটা বুঝিয়ে দিয়ে চুপ করিয়ে দেবে সকলকে। কিন্তু যারা নিজেরাই চুপ মেরে যায়, জেরা চোটপাটের ধার দিয়েই হাঁটে না, তাদের জন্য তো তিতানের স্নায়ু তৈরি নেই। তুহিনের দৃষ্টি ফের টিভিতে, কিন্তু তিতান যেন আর নড়তে পারছিল না। পা জোড়া বুঝি গেঁথে গেল মোজাইক মেঝেতে। প্রশ্নহীনতার চাপই যেন ক্ষণপূর্বের সায়র মিত্রকে বদলে দিচ্ছে তিতানে।

আশ্চর্য, নিজের অজান্তে হাত কচলাচ্ছে তিতান! অপরাধীর সুরে বলল,— এবার রেজাল্টটা খারাপ হয়ে গেল।

তুহিন ভারী স্বরে বলল,— হুঁ।

আমি এরকমটা এক্সপেক্ট করিনি।

হুঁ।

সামনের বছর ঠিক বেরিয়ে যাব। দেখে নিয়ো।

ভাল।

আর টিউটোরিয়ালের দরকার নেই।

তুহিন আর দোলার চোখ একযোগে ঘুরেছে তিতানে। বিস্ময়ে? বিরক্তিতে? হতাশায়? তিতান মা বাবাকে ঠিকঠাক পড়তে পারল না যেন। মাথা নামিয়ে বলল,— আমি নিজে নিজেই পড়ব।

যা তোমার ইচ্ছে। তুহিনের স্বরে ওঠাপড়া নেই,— কিছুই বলব না আর।

তিতান আস্তে আস্তে ঘরে চলে গেল। বিছানায় বসে শুনতে পাচ্ছিল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মা। চাপা স্বরে বাবা কী যেন বলল, মা'র কান্না বাড়ল আরও। হঠাৎ দুটো গলাই থেমে গেছে। ও-ঘরে গ্লাস-বোতল সাজিয়ে বসল নাকি বাবা? পরিচিত ঝাঁঝালো গন্ধটা আসে না কেন?

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে অনেকক্ষণ। কম্পিউটারে খুটখাট করছিল তিয়া, কখন সেও শুয়ে পড়েছে। গোটা ফ্ল্যাট নিস্তব্ধ, পাড়া নিঝুম, হঠাৎ হঠাৎ কুকুরের কোরাস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই কোথ্থাও। আচমকা এক ট্যাক্সি এসে থামল আবাসনের গেটে। মিটারের টুং টাং ধ্বনি। ইঞ্জিনে কর্কশ আওয়াজ বাজিয়ে চলেও গেল গাড়িটা। রাত বাড়ছিল।

তিতানের ঘুম আসছিল না। বিচিত্র এক চাপান উতোর চলছে অন্তরে। গমগমে গলায় উপদেশ দিচ্ছে সায়র মিত্র, তাকে প্রাণপণে নস্যাৎ করতে চাইছে তিতান। সায়র ধমক দিচ্ছে, তিতান প্রতিবাদ জুড়ছে। কখনও সায়র জেতে, তো কখনও তিতান।

নাহ্, এ লড়াই বুঝি থামার নয়। অন্তত এক্ষুনি এক্ষুনি।

তেরো

অনেক দিন ধরেই খবরটা ভাসছিল বাতাসে। অবশেষে অর্ডারটা বেরোল। ভেনাস রবারের চিফ সেল্‌স ম্যানেজার পদে উন্নীত হয়েছে তুহিন মিত্র। আগামী সোমবার থেকে তাকে কাঁধে তুলে নিতে হবে দায়িত্বভার।

সঙ্গে সঙ্গে অফিসময় রটে গেছে বার্তা। অভিনন্দনের বন্যা বইছে। কেউ চেম্বারে এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল, কেউ বা মোবাইলে।

কিন্তু অভিনন্দন কুড়িয়ে সময় কাটালে তো চলবে না তুহিনের, তাকে কাজও করে যেতে হচ্ছে সমানে। প্রথমেই সেল্‌স অফিসারদের নিয়ে একটা মিটিং সারল। শেষ হতে না হতেই ছুটল জি-এমের ঘরে। আবার মিটিং। সেখান থেকে এক রাশ ফরমান নিয়ে চেয়ারে ফিরতে না ফিরতেই স্থানীয় এক স্টিল কোম্পানির পারচেজ অফিসার উপস্থিত। আগামী লটের মালের দাম নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করল খানিকক্ষণ। সে উঠতে না উঠতে এম-ডির চেম্বারে ডাক। এখানে কী হচ্ছে, সেখানে কী হল, ওখানে সেটা হয়নি কেন...!

সওয়া দুটো নাগাদ একটু হাঁপ জিরোনোর সময় পেল তুহিন। গেছে ক্যান্টিনে। লাঞ্চ সারতে। অনাড়ম্বর আহার। টোস্ট, স্টু, স্যালাড, টক দই।

সবে চিকেন স্টুতে চামচ ডুবিয়েছে, টেবিলে অ্যাকাউন্টসের দিলীপ দত্ত। হাত বাড়িয়ে বলল,— কনগ্র্যাটস্। মেরে দিলেন তা হলে?

প্রায় সমবয়সি দিলীপের সঙ্গে কিঞ্চিৎ খাতির আছে তুহিনের। লোকটা তেমন কুচুক্কুরে নয়, কথাবার্তায় চালবাজিও কম।

তুহিন মৃদু হেসে বলল,— হ্যাঁ, শিকেটা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ল।

রায়চৌধুরী তো শুনলাম খুব ফ্যাবুলাস অফার পেয়ে কোম্পানি ছাড়ল?

গুজব তো সেই রকমই। তবে টেক্-হোম শেষ পর্যন্ত কত পাবে, তা তো জানার উপায় নেই। অবশ্য স্টক অপশনও বোধহয় আছে কিছু।

আপনারও তো লিফ্‌ট ভালই হল।

এখনও ডিটেল হিসেব করিনি। মনে হয় ফিফটিন টু টোয়েন্টি হাইক হবে। অফকোর্স ট্যাক্স বাদ না দিয়ে।

ট্যাক্স ধরলেও দশের কম তো নয়। আমাদের জমিয়ে একটা ট্রিট দিন। ফাইভ স্টার-ফার চাই না, যেখানে ঘ্যাম করে মাংস-টাংস রাঁধে, সেরকম কোনও জায়গায়। আর এবার চোখকান বুজে একটা গাড়ি কিনে ফেলুন।

এমন এক বাসনা তুহিনের মাথাতেও ঘুরছে বটে। কিন্তু কেনা তো সমস্যা নয়, মেনটেন করাটাই ঝামেলার। নিজে গাড়ি চালানো শেখেনি, এই বয়সে আর হবেও না, ড্রাইভারই তো খেয়ে নেবে হাজার তিনেক। ফ্ল্যাটের লোন ছ'বছর টানতে হবে এখনও। সঙ্গে আরও একটা দেনা যোগ করবে কিনা দশবার ভাবা দরকার। তাও স্রেফ অফিসে আসা-যাওয়ার জন্যে। ছুটির দিনে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রমোদভ্রমণে যাবে, এমন সৌভাগ্য তো করে আসেনি তুহিন! তবু কেনার ইচ্ছেটা জাগে। নিজের গাড়িতে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে তুহিন, এ দৃশ্য কল্পচোখে দেখতেও তো আরাম। সেই তুহিন, কীটপতঙ্গের মতো বেঁচে থাকা এক কেরানির ছেলে তুহিন...!

মুখে অবশ্য তুহিন বলল,— কী হবে দত্ত, এঁড়ে গরু কিনে?

কেন কিনবেন না? এবার তো তেলের পয়সা পেয়ে যাবেন!

ক'টাকা দেবে? এ তো মাল্টিন্যাশনালের চাকরি নয় রে ভাই, সিলিং বাঁধা।

আহা, একটু হিসেব-টিসেব রেখে চালাবেন। দিলীপ হাসছে,— গাড়িও তো আপনি ভাল ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন। আপনার মেয়ে আছে না?

ছিল। লেফ্‌ট। শি ইজ ইন বিজনেস নাউ।

ওইটুকু মেয়ে ব্যাবসা করছে? কী ব্যাবসা?

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

বাহ্, দারুণ লাইন। আজকাল তো সার্ভিস সেক্টরেই পয়সা। হাওয়ায় হাওয়ায় টাকা আসে। আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মতো বাজার নিয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয় না। জাপানে রিসেশন, আমরা কাঁপছি। আমেরিকা যুদ্ধে নামল, আমাদের তালু শুকিয়ে গেল। দিলীপের সামনে মশালা ধোসা।

ভেতরের পুরটা চামচে দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বলল,— যাই হোক, আপনার কন্যাটি তার মানে বেশ চইয়ে-বইয়ে হয়েছে!

তারিফটা শুনতে ভাল লাগল তুহিনের। আবার কোথায় যেন একটা চিনচিনে কষ্টও হল। মেয়ের এই চালাকচতুর হওয়ার পিছনে তার কোনও ভূমিকা আছে কি? চিরকাল শুনে এসেছে, বাবা-মেয়ের নাকি একটা আলাদা ভালবাসার সম্পর্ক থাকে, তিয়ার সঙ্গে তেমনটা তার হল কই? একটু যেন তফাতে তফাতেই রইল মেয়ে, মনপ্রাণের কথা বলে না তুহিনকে। তিয়ার কোনও ইচ্ছেতেই সে কখনও বাধা দেয়নি, কিন্তু মেয়ে তাকে আদৌ আপন ভাবে কি? ভাবলে মুখের ওপর টাকাগুলো ফেলে দেয়? বাবাকে দেনা শোধ করতে মরিয়া, এ কেমন মেয়ে?

তুহিন আলগা হাসল,— ওই আর কী। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

প্রার্থনা করুন, যেন দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েরা রোজগেরে হলে বাপ-মা'র মঙ্গল। মেয়েদেরই মনে একটু মায়াদয়া আছে, শেষ জীবনটা হয়তো বুড়োবুড়িকে দেখবে। ছেলেরা তো ফার্স্ট চান্সেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাওয়া।

হায় রে, সে সম্ভাবনাও যদি থাকত! হাওয়া তো হবেই না তিতান, ঘাড়ে বসেই খাবে। বরং বাপ-মাকেই না শেষমেশ ঘেঁটি ধরে আউট করে দেয়! সেদিন তো অন্য দাওয়াই দিয়েও দেখল তুহিন। তখনকার মতো সুবোধ বালক হয়ে প্রতিশ্রুতি দিল, এবার থেকে মন দিয়ে পড়বে, অথচ তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি? পার্টি স্বর্গ, পার্টি ধর্ম, পার্টি হি পরমতপঃ, জপ করতে করতে নেচে বেড়াচ্ছে। পার্টি যে ওই মাথামোটা ছেলেকে ছিবড়ে করে ফেলে দেবে, এটুকু বোঝার বুদ্ধি ঘটে থাকলে তো। ভাবছে পার্টি ওর মই। ওদের মতো গাড়োলদের কাঁধেই যে মইটা চাপানো থাকে, এ বোধ যে ছেলের কবে গজাবে?

খাওয়া সেরে উঠে পড়েছে দিলীপ দত্ত। বেসিনে মুখ ধুতে ধুতে চেঁচাল,— এখন কি আবার মিটিং?

আর কী, এখন তো অফিস মানেই মিটিং। অবিরাম মিটিং। ঘনঘন মিটিং। তুহিন জোর করে হাসল,— এই তো, এক্ষুনি মহেশতলায় ছুটব। কয়েকটা ডেলিভারি শিডিউল নিয়ে ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে বসতে হবে।

দৌড়োন তা হলে।... খ্যাটনটার কথা কিন্তু ভুলবেন না। কবজি ডুবিয়ে মাংস...

তুহিনও টেবিল ছাড়ল। চেম্বারে ফিরে জিরোল না আর, ব্রিফকেস গুছিয়ে সোজা কারখানা। অফিস ফিরতে প্রায় সন্ধে। জি-এম দেখা করে যেতে বলেছিল, এসেই দৌড়েছে তার গুহায়।

বছর পঁয়তাল্লিশের ব্যাকব্রাশ চুল, ঝাঁটাগোঁফ, সুরেশ গুলাটি আজ বেশ খোশমেজাজে। আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছিল কফিতে। জিজ্ঞেস করল,— চলবে?

তুহিন হাত তুলল,— নো, থ্যাঙ্কস।

তারপর বোলুন, কেমোন ফিল করছেন অর্ডারটা পাওয়ার পর? অফকোর্স ইটস নট এ সারপ্রাইজ ফর ইউ?

সত্যি বলতে কী, তুহিনের তো তেমন কোনও প্রতিক্রিয়াই হয়নি। হয়তো বা মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া জাগানোর কোষগুলোই অকেজো হয়ে গেছে তার। এখন তো প্রোমোশন মানে স্রেফ ঘর বদল, নয় কি? তবু সৌজন্য দেখিয়ে বলল,— ভালই তো লাগছে।

ম্যাডামকে গুড নিউজটা শুনিয়েছেন?

দোলাকে আদৌ বলবে কিনা তাও জানে না তুহিন। তবে এবারও অবলীলায় ডাহা মিথ্যে ঝেড়ে দিল,— শিয়োর। শি ইজ হ্যাপি।

কফি শেষ করে সুরেশ হঠাৎ টানটান,— নাউ লেটস টক শপ। সকালে আমি ডিসকাস করিনি, লাস্ট বোর্ড মিটিংয়ের দুটো ডিসিশন আপনাকে জানানো বহুত জরুরি। ফার্স্টলি, আমাদের হাফ ইয়ার্লি টারগেটের থেকে আমরা কিন্তু পিছিয়ে আছি। শর্টফল নিয়ে বোর্ড মেম্বারস আর ওয়ারিড। সেকেন্ডলি, সেল্‌সের স্টাফ প্যাটার্নটাকে রিস্ট্রাকচারিং করতে হোবে।

ও। তুহিনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল,— ছাঁটাই-ফাঁটাই...?

ওয়েল, ইট মে বি ভি-আর অলসো। নট ইয়েট ডিসাইডেড। মিনিমাম যা না রাখলে নয়, তার বেশি ভেনাস রবার রাখতে চাইছে না। কে কে না থাকলেও চলে, তার একটা লিস্ট বানান। অফকোর্স, নতুন পোস্টে জয়েন কোরার পর। মেক এ লিস্ট অব টেন উইথ দেয়ার পারফরমেন্স রিপোর্ট। তারপর দেখি কী কোরা যায়।

কী শুরু! তুহিন একটা শ্বাস চাপল। নতুন চেয়ারে বসেই হাতে রক্তের ছিটে! তবু বাধ্য জল্লাদের মতো ঘাড় নাড়ল তুহিন,— হয়ে যাবে।

উইদিন নেক্সট উইক দিয়ে দিন। সুরেশ গদিমোড়া চেয়ারে হেলান দিয়েছে। মুচকি হেসে বলল,— আপনার আর একটা কাজ আছে। রাউরকেল্লার ডি-কে স্টিল ইন্ডাস্ট্রির জি-এম কামিং উইকে কলকাতা আসছেন।

মিস্টার সাহু?

হাঁ। আমি থাকব না, চেন্নাই যাচ্ছি... আপনি প্লিজ ওঁকে অ্যাটেন্ড করবেন। সুরেশ চোখ টিপল, জানেন নিশ্চয়ই, হি ইজ উইডোয়ার?

জানি। বছর দুয়েক আগে ওঁর স্ত্রী ক্যান্সারে মারা গেছেন।

ঠিক।... সো প্লিজ লুক আফটার এভরিথিং।

সুরেশের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আপন মনে একটু হাসল তুহিন। গুলাটির ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধে নেই। তবে বউ মরেছে বলেই যে সাহু কলকাতায় এসে মেয়েমানুষের জন্য ছোঁকছোঁক করবে, তা তো নয়। ঘরে সুন্দরী বউ থাকা সত্ত্বেও এই হোমরা-চোমরাগুলো অধিকাংশই নারীমাংসভোজী। দেখে দেখে চোখ পচে গেল তুহিনের। এক সময়ে অবশ্য গা কিশকিশ করত, এখন আর তাপউত্তাপ জাগে না। সেই প্রথম বারের ঘটনাটা মনে পড়লে তো হাসি পায়। ধানবাদের সেই মাইনসের পারচেজের বড়কর্তা পদধূলি দিয়েছেন কলকাতায়, মুখ ফুটে বলেও ফেলেছেন সন্ধেবেলা তাঁর কী চাই। তুহিন তখন রবার ইন্ডিয়ায়, বয়স বড়জোর বছর তিরিশ, সবে তিয়া হয়েছে...। এমন একটা দাবি শুনে তার মাথায় বজ্রাঘাত। কী করবে, কোথায় খুঁজবে, কোথ্থেকে জোগাড় করবে, ভেবে ভেবে দিশেহারা। মরিয়া হয়ে দু'-চারজনকে ফোন করল, তারা এই মারে তো সেই মারে। শেষে অফিসের ঘোষ সুলুকসন্ধান দিয়ে তাকে উদ্ধার করল। তারপর তো আর এক গাড্ডায়। মেয়েটার হোটেলে আসার কথা সাতটায়, তুহিন কর্তাটিকে হুইস্কি খাইয়েই যাচ্ছে, খাইয়েই যাচ্ছে... আটটা বাজল, ন'টা... সে পাখি আর আসেই না! কর্তার রোষ এড়াতে শেষে হোটেলের গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুহিন, ফুটপাথে কোনও মেয়ে দেখলেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে...। অবশেষে যখন চিড়িয়াটি এল, তুহিন প্রায় তার হাত চেপে ধরে, বাঁচালে মা! পরে অবশ্য সবই অভ্যেস হয়ে গেল। এখন তো কোনও সমস্যাই নেই। হাজারো এজেন্সি রয়েছে। নিজেও ফোন লাগাতে

পারো, সেল্‌সের কাউকে টিপে দিলেও চলবে, ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় চাহিদা মাফিক মাল পৌঁছে যাবে। কলেজগার্ল, গৃহবধূ, যা চাইবে তাই। অভাব-অনটন আজকাল আর বড় কথা নয়, এখন তো এটা স্রেফ উপরি রোজগারের রাস্তা। দিনে দিনে শহরটা কী যে হয়ে গেল!

তা এই আক্ষেপ কি তুহিনের সাজে? শহর তো শুধু ইট-কাঠ- পাথর-মল্‌-ফ্লাইওভার নয়, শহর তো মানুষ। সেই মানুষই যদি বদলে যায়...! তুহিন নিজেও কি সেই নিষ্পাপ তরুণ আছে এখনও?

টুকটাক চিন্তাগুলো মাথায় নিয়ে শেষ মুহূর্তের কাজ সারছিল তুহিন। ডেলিভারি শিডিউল ফ্যাক্স করার বন্দোবস্ত করল, চেক করল মেল, একটা টেকনো-কমার্শিয়াল টেন্ডারের বয়ানে চোখ বুলিয়ে নিল। একটু ভাল করে দেখবে বলে ফাইলটা পুরেই নিল ব্রিফকেসে।

মোবাইল বাজছে। বিশ্রী ধাতব ঝংকারটা থামানোর আগে তুহিন নম্বরটা দেখল। সুজয়।

কী রে, অফিসে? না বেরিয়ে পড়েছিস?

এই তো, বেরোব বেরোব করছি।

জানি, তুই শালা এখনও চেয়ারে সেঁটে। প্রেস থেকে ফিরছি, তোকে তুলে নেব?

নিয়ে?

একটু বসি কোথাও। কত দিন গপ্পোআড্ডা হয় না।

স্কুলের তিন-চারজন সহপাঠীর সঙ্গে এখনও অল্পস্বল্প যোগাযোগ আছে তুহিনের। তাদের মধ্যে সুজয়ই ফোন করে ঘনঘন। কলেজ স্ট্রিটে সুজয়দের বিশাল ছাপাখানা। পারিবারিক ব্যাবসা। রমরমিয়ে চলছে। মাঝে বিশ-তিরিশ বছর তুহিনের খুব একটা খোঁজখবর রাখত না সুজয়। গত অঘ্রানে একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কৈশোরের বন্ধুত্বটাকে আবার চাগিয়ে তুলছে। প্রায়ই ডাকাডাকি করে পুরনো ইয়ার দোস্তদের। গল্পগাছা করে সুখ পায়।

দু'-এক পল ভাবল তুহিন। এখন বাড়ি ফিরেই বা তার কী কাজ? নিরানন্দ গৃহে ঢোকা মানেই তো দম আটকে আসা। মেয়ে নেই, ছেলে নেই, থাকলেও তারা এসে দুটো কথা বলবে কিনা সন্দেহ। আর বউ? সে তো এক নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব মাত্র।

পল্‌কা গলায় তুহিন বলল,— চলে আয় তা হলে। আমি অফিসের সামনেটায় আছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তুহিন ফুটপাথে। আলোয় আলোয় বাহার খুলেছে শহরটার। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, ভিজে পিচরাস্তা থেকে দ্যুতি ঠিকরোচ্ছে। খানিক তফাতে এক শপিংমলের চোখ ঝলসানো রোশনাই। এ দিকের বাসস্টপটা একটু যেন অন্ধকার। দাঁড়িয়ে আছে অফিসফেরতা লোকজন। তিন-চারটে সুবেশা মেয়েও। ওরা কি এ-পাশ ও-পাশের অফিস থেকে...? নাও হতে পারে অবশ্য। শহরটাই এখন মেয়েছেলের বাজার। কে ভদ্র, কে ধান্দেওয়ালি, ঠাহর করা দায়। সোনাগাছি, হাড়কাটা গলি যে কদ্দুর ছড়িয়েছে!

তুত্, যত্ত সব নোংরা চিন্তা। হলটা কী তুহিনের? দুনিয়ার কোনও ভালই কি তার চোখে পড়ে না? আজকালকার মেয়েরা কত স্বচ্ছন্দ হয়ে গেছে, কঠোর পরিশ্রম করছে, তিয়ার মতোই...! মেয়ের কথা স্মরণে আসতেই তুহিন ঈষৎ মেদুর। দোলা সেদিন বলছিল, তিয়া নাকি একজনকে পছন্দ করেছে, হয়তো বিয়ে করবে...। তিয়ার দাম্পত্য জীবন নিশ্চয়ই তুহিনদের মতো হবে না। বড্ড হেডস্ট্রং মেয়ে, মানিয়ে-গুনিয়ে চলতে পারবে তো?

সুজয়ের বড় গাড়ি হর্ন বাজাচ্ছে। উঠে নরম সিটে শরীর ছেড়ে দিল তুহিন। ড্রাইভার স্টার্ট দিতেই জিজ্ঞেস করল,— যাবি কোথায় এখন?

আমাদের ক্লাবে চল। উইক-ডে তো, ক্লাবটাই নিরিবিলি।

রেনবো ক্লাব দক্ষিণ কলকাতায়। এক বহুতল অট্টালিকার একতলা, দোতলা জুড়ে। ব্যাঙের ছাতার মতো সদ্য গজিয়ে ওঠা আর পাঁচটা ক্লাবের মতো, আভিজাত্য বা ঐতিহ্য না থাক, ঠাটঠমক আছে দিব্যি। হালফ্যাশনের ঝাড়বাতি, কাচ বসানো থাম, বিদেশি কেতার আধুনিক আসবাব, শরীর জুড়োনো শীতলতা...। ইনডোর গেমস, জিমন্যাশিয়াম, লাইব্রেরি, সবই আছে মাপ মতো।

তুহিনকে নিয়ে দোতলার টেরেস্‌টায় বসল সুজয়। মনোরম পরিবেশ। গাছ-টাছ দিয়ে সুন্দর সাজানো জায়গা।

শৌখিন গার্ডেন-চেয়ারে হেলান দিয়ে তুহিন প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল,— এরকম একটা ক্লাব-ফাবের মেম্বারশিপ নিলে হয়।

নে না। আমি তো আগের দিনই তোকে বললাম। সেক্রেটারির সঙ্গে আমার ভাল খাতির, এখন লাখের কমে নিচ্ছে না, তুই পঁচাত্তরে এনট্রি পেয়ে যাবি।

ওরে বাবা, সে তো অনেক টাকা!

টাকা টাকা করেই গেলি। কী হবে যখের মতো আগলে রেখে? উড়িয়ে পুড়িয়ে সাফ করে দে।

এমন দর্শন সুজয় আওড়াতেই পারে। একে তার টাকায় ছাতা পড়ছে, তার ওপর মেয়ের বিয়ে দিয়ে সে এখন ঝাড়া-হাত-পা। কিন্তু তুহিনের দায়দায়িত্ব তো চিতেয় ওঠা পর্যন্ত ফুরোবে না। সন্ধেবেলা এইসব জায়গায় খানিকটা সময় কাটালে ভালই লাগে, তবে এই বিলাসিতা তুহিনের জন্য নয়। টাকাটা অপচয় ভেবে সারাক্ষণ গা কুটকুট করবে যে।

তুহিন হেসে বলল,— তুই ওড়া। আমি তোর পাশে আছি।

কিপটের হদ্দ!... যাক গে, কী নিবি বল?

যা খুশি। তুহিন কাঁধ ঝাঁকাল। পলকের জন্য ভাবল প্রোমোশনের কথাটা সুজয়কে বলে, উৎসাহ পেল না। আলগা ভাবে বলল,— বিয়ার নিতে পারিস। ঠান্ডা ঠান্ডা।

ভাল আইডিয়া। ভাদুরে গরমটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।

বেয়ারাকে ডেকে দু'বোতল বিয়ারের অর্ডার দিল সুজয়। সঙ্গে কাবাব। সিগারেটের প্যাকেট বার করে রাখল টেবিলে। তুলে একটা ধরিয়ে প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুকে।

তুহিন বলল,— থাক না। আমি তো খাই না বড় একটা।

আমিও কি বেশি খাই? তোল, তোল। সিগারেট খাওয়াটা তুইই আমায় শিখিয়েছিলি, মনে আছে?

নেই আবার! স্কুলের টিফিনটাইমে বাথরুমে গিয়ে...। তখন তো এইট, তাই না?

উঁহুঁ নাইন। তুই ব্যাটা চিরকাল কিপটের যাশু... কোথ্থেকে একটা সস্তার সিগারেট... ভয়ংকর কড়া... টান দিতে গিয়ে শালা আমার বল দুটো টাকে উঠে গেছিল মাইরি!

তুই শালা পুরো ভোম মেরে গিয়েছিলি। মুখ লাল-টাল করে...

তুহিন গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল। বহুকাল পর। একমাত্র স্কুলের বন্ধুদের সান্নিধ্যেই বুঝি এমন হাসি আসে। চুয়ান্ন বছর বয়সেও। হাসতে হাসতেই

তুহিন দেখছিল নীচের সুইমিং পুলটা। থলথলে বপু নিয়ে দুটো লোক দাপাদাপি করছে নীল জলে। দু'খানা বাচ্চা হাতির মতো। দৃশ্যটা ইশারায় দেখাল সুজয়কে। দুই বন্ধু আরও জোরে হেসে উঠেছে।

বিয়ারের বোতল হাজির। সন্তর্পণে দু'গ্লাস ভরতি করে ঢালল সুজয়। গ্লাস উঁচু করে বলল,— চিয়ার্স।

তুহিনের মেজাজ আশ্চর্য রকমের ফুরফুরে হয়ে গেছে। গ্লাসে গ্লাস ঠুকে বলল,— চিয়ার্স টু আওয়ার চাইল্ডহুড।

বড় একটা চুমুক দিয়ে সুজয় বলল,— স্কুলের খবর কিছু রাখিস?

কী হয়েছে?

এ-বছর প্ল্যাটিনাম জুবিলি। একটা গালা কিছু করতে হবে। তুই তো শালা অ্যালাম্‌নির মেম্বারও হোসনি।

হয়ে যাব।

স্কুলের দশা দেখেছিস? বিল্ডিংটা তো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কত ভাল ভাল স্টুডেন্ট ছিল আমাদের সময়ে!... বাংলা মিডিয়াম স্কুল তো, এখন ঝি-চাকরের ছেলে ছাড়া কেউ পড়তে যায় না। স্ট্যান্ডার্ড একদম ফল করে গেছে।

তো?

তো মানে? উই মাস্ট ডু সামথিং।... লাস্ট অ্যালাম্‌নি মিটিংয়ে আমরা ঠিক করেছি, মোটা টাকা ডোনেট করব স্কুলে। বিল্ডিংটাও রিপেয়ার হবে, কয়েকটা কম্পিউটার কিনে দেব...। তুই দু'হাজার দিবি।

হাজার।

শালা সেল্‌সে চাকরি করে দর করাটা স্বভাব হয়ে গেছে, না? নো আরগুমেন্ট। মিটার তা হলে আরও চড়ে যাবে কিন্তু।

আচ্ছা আচ্ছা, হবেখ'ন। তুহিন অনাবিল হাসছে,— আর কী প্ল্যান?

একটা বড় ফাংশন করব। লিডিং আর্টিস্ট-ফার্টিস্ট এনে। প্লাস, একটা স্যুভেনির। আমি তো অ্যাড দিচ্ছি, তুইও কয়েকটা জোগাড় কর। বলতে বলতে সুজয়ের প্রবল আবেগ এসে গেছে,— আয় না, সবাই মিলে একটু খাটি। আমি অন্তত পুরনো একশো জনের সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছি। অনেকেই খুব আগ্রহ দেখিয়েছে...

সুজয়ের আবেগ যেন তুহিনকেও গ্রাস করছে ক্রমে ক্রমে। হয়তো কালই কথাগুলো হাস্যকর মনে হবে, তবু এই মুহূর্তে তারও উচ্ছ্বাসে কোনও

কৃত্রিমতা নেই। টেবিলে হাত ঠুকে বলল,— আছি, আমিও আছি সঙ্গে। এখন আমি ভেনাস রবারের চিফ সেল্‌স ম্যানেজার, দ্যাখ না বিজ্ঞাপনে কেমন ফ্লাড করে দিই।

তুই চিফ হয়েছিস? কবে?

আজই।

হোয়াট আ গ্রেট নিউজ!... তা হলে বিয়ার তো আর চলে না রে, শ্যাম্পেন খুলতে হয়।

মুখ ফসকে সংবাদটা বেরিয়ে যেতেই একটু সংকুচিত হয়ে পড়েছে তুহিন। লজ্জা লজ্জা মুখে বলল,— ধ্যাত, সিন ক্রিয়েট করিস না। বরং হুইস্কি বল।

বিয়ারের পর হুইস্কি? বাহ্‌, জমে যাবে।

শুধু হুকুমের অপেক্ষা, মদিরা এসে গেল টেবিলে। চলছে পান, চলছে কথা। কখনও বা স্মৃতি রোমন্থন। কখনও লঘু আলাপন।

হঠাৎই সুজয় বলল,— রোববার কী করছিস? চলে আয় না আমার বাড়ি।

কেন?

একটু খাই-দাই করব। অঞ্জন দীপকদেরও ডাকছি। সবাই মিলে বউ-টউ নিয়ে... দুপুর দুপুর আমার গাড়িটায় সদলবল...

দোলা কি আসবে? সংশয় আছে তুহিনের।

তবু তুহিন আগ্রহভরেই জিজ্ঞেস করল,— কোথায় যাবি?

আছে, আছে। সুজয় চোখ নাচাল,— সাসপেন্স।

হেঁয়ালি ছাড় তো। ঝেড়ে কাশ।

ফার্স্টে সোজা ডায়মন্ড হারবার। ওখানে শর্ট ব্রেক, চা-ফা খেয়ে আবার এগোনো। কুলপির কাছে গিয়ে আমরা ঘুরব ডাইনে। ওখানে আমি একটা ফ্যান্টাস্টিক স্পট আবিষ্কার করেছি। একদম গঙ্গার ধারে।

তারপর?

তোরা জায়গাটা দেখবি। ওখানে জমি কিনছি আমি। তিন-চার বিঘে মতন। সুজয় ঠোঁট ছুঁচোলো করল,— মাথায় একটা আইডিয়া ঘুরছে, বুঝলি। ওখানে যদি ছোট ছোট কয়েকটা কটেজ বানাতে পারি... ধর একটা বৃদ্ধাবাস মতন...

তার জন্য কুলপি কেন বাছা? কলকাতা কী দোষ করল? অদ্দূরে, ধ্যাধেড়ে গ্রামে...

উঁহুঁ। বল, নিরালায়। নির্জনে। আমি তো সোশাল সার্ভিস করছি না? নিজেদের জন্য বানাতে চাইছি। আই মিন, আমি আর বীথি, তুই, তোর বউ, দীপক অঞ্জনরাও উইথ ওয়াইফ...

কী করব সেখানে? খোল-করতাল বাজাব?

আরে ব্যাটা, সবাই মিলে বুড়ো বয়সে একসঙ্গে থাকব। সুজয়ের স্বর সহসা উদাস,— আমার আর বীথির তো বন্ধন চুকেই গেছে, পাঁচ-সাত বছর পর তোদেরও একই হাল হবে... মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে, ছেলে ছেলের মতো সংসারী... আমরা বাপ-মা তো সেখানে বাড়তি। তখন জীবনের বাকি ক'টা দিন নিজেদের মতো করে থাকা, আনন্দ করা...। ইচ্ছে হল বাগান করলাম, নয়তো গঙ্গার ধারে চুপচাপ বসে রইলাম...। জায়গাটা তো দেখিসনি তোরা, সে যে কী সুন্দর! সূর্য যখন ডোবে, নদী লাল হয়ে যায়, আর সারাদিন জলের ছলাতছল শব্দ...

তুহিনের নেশা নেশা চোখে এক প্রশান্ত ছবি। দীর্ঘ ম্যারাথন দৌড়ের পর ঠিক যেমন একটা বিরামভূমিতে পৌঁছোতে সাধ যায় মানুষের। কিন্তু দোলা তখন তুহিনের পাশে থাকবে কি? অংশু রায়ের স্মৃতি ছেড়ে আর কি কখনও ধরবে তুহিনের হাত? অবশ্য তুহিনের হাতও তো এখন ময়লা। দুগ্‌গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চামেলি, কামিনী... কত যে শরীর...! তার মতো পাপিষ্ঠের পাশে বসবে কি দোলা? গঙ্গার ধারে... কলকল বয়ে যাচ্ছে নদী... মৃদুমন্দ বাতাস বইছে... দোলার চুল উড়ছে হাওয়ায়...!

তুহিনের কান্না পাচ্ছিল। হবে না...। হবে না...।

চোদ্দো

শরতের সন্ধ্যা গাঢ় হয়েছে অনেকক্ষণ। আলো ঝলমল হস্তশিল্প মেলাপ্রাঙ্গণের একটু ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল তিয়া। খানিক তফাতে সূর্য, কানে মোবাইল, হাতে হেলমেট। দু'জনেরই চেহারা বিধ্বস্ত, রণক্লান্ত সৈনিকের মতো। একটাই যা সান্ত্বনা, আজকের মতো সাঙ্গ হয়েছে কাজ। এবার পাততাড়ি গুটিয়ে বেরোনোর পালা।

মোটামুটি বড় একটা কাজের বরাত ছিল আজ। ইভিটা পত্রিকার উদ্যোগে রান্নার ওয়ার্কশপ, যুগ্ম প্রায়োজক অনুরাগ বাদাম তেল। শুরু হয়েছিল

আড়াইটেয়, চলল পাক্কা সাড়ে তিন ঘণ্টা। দারুণ জমেছিল আজ অনুষ্ঠান। মেলার ছোট্ট অডিটোরিয়াম প্রায় টইটম্বুর, না হোক শ'দেড়েক মহিলা তো এসেছিলই। যে সে ব্যাপার তো নয়, সাত তারা হোটেলের প্রধান পাচক রাহুল শেনয় স্বহস্তে তিন তিনখানা পদ রেঁধে দেখাল। ইয়াখানি পোলাও। ফিশ রেশমি কাবাব। কড়াই চিকেন। চমৎকার বাক্‌চাতুর্য আয়ত্ত করেছে রাহুল, রসবোধও আছে দুর্দান্ত, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কত যে মজার গল্প শোনাল। হাত খুনতি নাড়ছে, মুখ চুটকি ছাড়ছে, আর নানান বয়সের মহিলা গড়িয়ে পড়ছে হাসিতে। প্রোগ্রামের চটক বাড়ানোর জন্য টিভিতারকা রিমা রায়কেও আনা হয়েছিল, রাহুল সমানে খুনসুটি করে গেল তার সঙ্গে। রন্ধন, আর অভিনয়, দুই শিল্পের যুগলবন্দিতে করতালি বাজল মুহুর্মুহু। দর্শক আর শিল্পীর মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করতে তিয়া আর সূর্যকেও ছুটে বেড়াতে হল গোটা অডিটোরিয়াম। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ, শিল্পীদের কাছে তাদের প্রশ্ন পৌঁছে দেওয়া, এসবও তো কানেক্টিভিটির কাজের অঙ্গ।

মূল অনুষ্ঠানের পর রিমা আর রাহুল দু'হাতে অটোগ্রাফ বিলোল খানিকক্ষণ। নারীবাহিনীর হাত থেকে তাদের উদ্ধার করে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল তিয়া। উপহার আর প্রায়োজকদের রকমারি গিফ্‌ট ভাউচার সমেত। এবং অবশ্যই নগদানগদি টাকা, উপস্থিতির সম্মানদক্ষিণা। এরপর ডেকরেটর ইলেকট্রিশিয়ানদের মাল বুঝিয়ে দাও রে, অনুরাগ তেল কোম্পানির অফিসাররা সন্তুষ্ট হল কিনা তার খোঁজখবর নাও রে, এজেন্সি থেকে আনা ছেলেমেয়েদের ছাড়ো রে... ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই। সেই সকাল ন'টা থেকে দৌড়ঝাঁপ শুরু, এখন সাড়ে সাতটা, তিয়ারা যে শ্রান্ত হবে, এ আর বিচিত্র কী!

ফোন শেষ করে শরীরটাকে একটু ঝাঁকাল সূর্য। বোধহয় হাড়গোড়গুলোকে স্বস্থানে ফেরাল। তিয়া কফি খাচ্ছে দেখে বলল,— আমার জন্য নিলে না?

খাবে তুমি?

দিনটাই তো কফির ওপর চলছে। হোক আর এক কাপ।

পাশের স্টল থেকে উষ্ণ পানীয় নিয়ে এল তিয়া। সূর্যকে ধরিয়ে দিয়ে বলল,— কার সঙ্গে কথা বলছিলে? ইভিটা?

আর কে! একটা ভারবাল রিপোর্ট দিয়ে দিলাম। সঙ্গে তাগাদাটাও সেরে রাখলাম।

পুজোর আগে কি ছাড়বে পেমেন্ট? মেলার গেটের দিকে এগোতে এগোতে তিয়া বলল,— মনে তো হয় না।

দেখা যাক। বলল তো, কাল লাস্ট আওয়ারে গিয়ে রিপোর্ট-টিপোর্ট জমা দিতে। সঙ্গে বিলও। সূর্য টেরিয়ে একবার দেখল তিয়াকে,— আমি কিন্তু জমা দিয়েই খালাস। পেমেন্টের তাগাদা তুমি করবে। চান্স পেলেই শোনাবে ফিনানশিয়াল ম্যাটার আমি একা কন্ট্রোল করি, ওটি আর হচ্ছে না। নিজে যাও, হাইহিলের সুখতলা ক্ষয়াও।

তিয়া মুচকি হেসে বলল,— দেখুন স্যার, আমি কিন্তু আজ হিলস পরিনি। স্নিকারস।

মোল্ডেড রাবার-সোলেরই বারোটা বাজাও দৌড়ে দৌড়ে। আমি অফিসে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকব, আর শুধু ফোন করে যাব। ও কে?

খিলখিল হেসে উঠল তিয়া। পরপর কয়েক দিন তিয়ার দাবড়ানি খেয়ে বাবুর বুঝি একটু গোঁসা হয়েছে। চান্স পেলেই এরকম পিন ফোটাচ্ছে পুটপাট। তবে সিধে হয়েছে অনেকটা, দুমদাম আর হুকুম ঝাড়ে না। তিয়ার পরামর্শও শুনছে মন দিয়ে। এক দিক দিয়ে এটা তো ভালই, নিজের নিজের পজিশনটা ক্লিয়ার থাকলে, পরে অনেক অশান্তি এড়ানো যায়। মুখে বলবে আধাআধি বখরা, অথচ সম্পর্ক হবে মনিব-চাকরের, এটা তো চলতে পারে না।

হাসতে হাসতেই তিয়া বলল,— বুঝেছি, বুঝেছি, তোমার খুব খিদে পেয়েছে।

উঁহুঁ, পেয়েছিল। পাস্ট টেন্স। এখন মরে গেছে।

সত্যি, ঝড় গেল বটে। এক দিকে সেলিব্রিটির নখরা সামলানো, অন্য দিকে অডিয়েন্সকে গুড হিউমারে রাখা... লাইফ হেল হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

বকবক করতে করতেই গেটের বাইরে দু'জনে। সূর্য জিজ্ঞেস করল,— এখন কী প্ল্যান?

তিয়া সূর্যর পিঠে হাত রাখল,— চলো আগে ভাল করে ফুয়েল নিই।

কী খাবে?

আমাকে চয়েস দিলে তো চাইনিজ। রাসবিহারী কানেক্টারে একটা গলতা খুলেছে, শুনছিলাম বেশ কোজি, ফুডটাও ভাল, এখনও তেমন ভিড়ভাট্টা নেই...

সূর্য ভাবল একটু। তারপর বলল,— সেই ভাল, একটু ফাঁকাতেই যাই। এখন আর লোকজন ভাল লাগছে না।

মোটরসাইকেলের সাইডবক্সে রাখাই থাকে তিয়ার হেলমেট। মাথায় চড়িয়ে চেপে বসতেই গতিময় হয়েছে দ্বিচক্রযান। ছুটছে মহানগরীর বাইপাস ধরে। দুর্গাপুজোর আর দেরি নেই, পরশু মহালয়া। এবার পুজো আশ্বিনের মাঝামাঝি, ভাদ্রের পচা গুমোট সরে বাতাসে সামান্য শিরশিরে ভাব। বুঝি বা ছুটি ছুটি গন্ধও। হাওয়াটায় আরাম হচ্ছিল তিয়ার, মুছে যাচ্ছিল ক্লান্তি।

নতুন চিনা রেস্তোরাঁটি ছোট, তবে বেশ ছিমছাম সাজানো। দেওয়ালে চৈনিক পেন্টিং, মৃদু বাতির ঢাকনিতে চিনা কারুকাজ, গোটা পাঁচেক টেবিলে বড়জোর জনা কুড়ির সংকুলান। কাস্টমারের মনোরঞ্জনের জন্য রঙিন টিভির ব্যবস্থাও আছে একখানা। চলছে হিন্দি নাচাগানা। নিচুগ্রামে।

হেলমেট রেখে বসতে বসতে সূর্য বলল,— যাহ্ বাবা, এ যে একেবারে জনশূন্য!

কোথায়! ওই তো একটা কাপ্‌ল। তিয়া চোখের তারা ঘুরিয়ে কোণের টেবিলটা দেখাল। তাদেরই মতো এক জোড়া জিন্‌স-টিশার্ট টেবিলে প্রায় ঝুঁকে পড়ে কথা চালাচ্ছে নিবিষ্ট মনে। রেস্তোরাঁয় আর কারও উপস্থিতিকে যেন গ্রাহ্যই নেই। তিয়াদের থেকে খানিক ছোটই হবে জুটিটা। গলা নামিয়ে তিয়া বলল,— ওরাও বোধহয় আমাদের মতো ক্রাউড অ্যাভয়েড করতে চায়।

হুম্। মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল সূর্য। চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বলল,— তা হলে ম্যাডাম, লক্ষ্মীপুজো অবধি আমরা এখন বেকার।

কী আর করা। তিয়া ঠোঁট উলটোল,— একটাও শারদ-সম্মান তো ধরা গেল না।

নিরাশ হয়ো না বেবি। ওতে অনেক বেশি লোকবল লাগে। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরও মজবুত করতে হবে। সামনের বার জান লড়িয়ে দেব।

টেবিলে ওয়েটার। খুদে চোখ, চ্যাপটা নাক, পাহাড়ি তরুণ। তিয়া মেনু-কার্ড উলটোতে উলটোতে বলল,— স্টার্টার কিছু নেবে? স্যুপ-ট্যুপ?

যা বলবে, তাই খাব।

চিকেন অ্যাসপারাগাস স্যুপ বলি তা হলে? খেতে খেতে মেন কোর্সটা...

ওটাও এখনই বলে দাও না। পেটে স্যুপ পড়লেই খিদেটা ঝটাকসে বেড়ে যাবে।

ছেলেমানুষ না ছেলেমানুষ! তিয়া হাসল মুখ টিপে। খাচ্ছে না তো খাচ্ছে না... কাজে ডুবে থাকলে খাওয়ার কথাই বেমালুম ভুলে যায়। কিন্তু একটু রিল্যাক্সড হয়ে খেতে বসলে সূর্যকে থামানো মুশকিল। সেই বুঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্ডার দিল তিয়া। প্রন, চিকেন, মাশরুম, সব মিলিয়ে-জুলিয়ে।

নির্দেশ ছুড়ে তিয়া গুছিয়ে বসেছে। টিভিতে শাহরুখ-সুস্মিতার নাচ চলছে জোর। ম্যায় হুঁ না। সে-দিকে আলগা চোখ রেখে ফের কাজের কথায় এল,— শারদ সম্মানের কাজটা কিন্তু খুব চ্যালেঞ্জিং। একটা তুলতে পারলে কানেক্টিভিটির হেব্‌বি পাবলিসিটি হবে।

যাক গে যাক, দুগ্‌গা তো হল না, দেখি যদি সরস্বতীটাকে ধরতে পারি।

পুজোগুলোও আমাদের ওপর ছাড়ে না কেন বলো তো? তিয়া আহ্লাদি গলায় বলল,— ধরো যদি ম্যাডক্স স্কোয়্যার বা মহম্মদ আলি পার্কটা কানেক্টিভিটিকে দিয়ে দেয়...

হব্‌বে, হব্‌বে। সব মোরগাই ফাঁসবে। আর দুটো বছর দ্যাখো, সব বড় বড় পুজো মাল্লু-টাল্লু কামিয়ে লোডটা আমাদের ট্রান্সফার করে দেবে।

আহা, তাই যেন হয়। তিরিশ-চল্লিশ লাখ টাকার পুজোর দশ পারসেন্টও যদি আসে... উফ, আমি ভাবতে পারছি না! তখন কিন্তু আমরা একটা ঝক্কাস অফিস নেব। ভাল কোম্পানিকে দিয়ে ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন করাব। ফুললি এসি... অল দা ফারনিচার উইল বি স্লিক অ্যান্ড মডার্ন... ওই যে একটা ইটালিয়ান কোম্পানি আছে না, ওদের কাছ থেকে কিনব। তখন তোমার ওই টু-হুইলার বাতিল। তোমার একটা গাড়ি থাকবে, আমারও একটা...

হয়েছে, হয়েছে। স্বপ্নে এবার ব্রেক মারো। সূর্য হাসছে,— কাজের কথাটা শোনো। রুচির চেক আজকালের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, মহালয়ার পর দিন তুমি পঁচিশ হাজার ড্র করে নিয়ো। বিজয় নীলেশের পুজোর পয়সাকড়িও সেদিন মেটাতে হবে।

আর তোমারটা?

আমিও নেব।... বিজয় নীলেশের কিন্তু এটা বোনাস নয়। এখন থোক একটা অ্যামাউন্ট পাবে, ফিনানশিয়াল ইয়ার কমপ্লিট হলে বোনাসের ব্যাপারটা সেটল করব।

হুম্‌।

তিয়া আনমনে মাথা দোলাল। পঁচিশ হাজার শুনতে বেশ লাগছে বটে, অন্য মাসের চেয়ে পরিমাণটাও বেশি, তবে দেওয়া-থোওয়াও তো কম নেই। গত বছর হাত ফাঁকা ছিল, পড়াটা চালাচ্ছিল তখন, কিন্তু এ-বছরটা তো অন্য রকম। এই পুজোতেই না সে প্রথম স্বাবলম্বী হল! মুখে না প্রকাশ করুক, সবাই নিশ্চয়ই মনে মনে আশা করবে। মা'র জন্য একটা দামি শাড়ি কিনবে। বাবাকে পাজামা-পাঞ্জাবির সেট। তিতানটাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে না, বড্ড বেশি রং দেখায়... তবু ওর জন্য একটা জিন্‌স...। আর হ্যাপি হোমে এক ডজন শার্ট। একদম সস্তার নয়, তবে দেখতে হবে লটে কোথায় কমে পাওয়া যায়...। দিদাকেও শাড়ি দেবে? না ভাল দেখে বেডকভার? আর বাবলিটাকে কেপ্রি? নাকি স্কার্ট-ব্লাউজ? সব মিলিয়ে আট-দশ হাজার টাকার বাজেট তো আছেই। সূর্যকে কি দেওয়া যায়? সেদিন একটা মলে গিয়ে খুব রিস্টওয়াচ দেখছিল...

এত কী ভাবনা শুরু হল ম্যাডাম?

কিছু না। তিয়া নরম হাসল,— তোমার পুজোর কেনাকাটা নেই?

সূর্য চোখ নাচাল,— কী চাই তোমার? বলে ফ্যালো।

আমারটা ছাড়ো।... তোমার বাড়ির কথা বলছি।

ওসব ঝামেলায় সূর্য চ্যাটার্জি নেই। মা'র হাতে মাল ধরিয়ে দেব, যাও চরে খাও, যা খুশি শপিং করো। মা ভি হ্যাপি, ছেলে লায়েক হয়েছে।

যাহ্, হাতে টাকা দেওয়াটা মোটেই ভাল দেখায় না। বরং কিছু কিনে দিলে মা-টারা বেশি খুশি হয়।

তার জন্য দোকানে ঘুরে ঘুরে মা'র শাড়ি কিনব? কিংবা ড্যাডের ট্রাউজারস? পোষাবে না ডার্লিং।

আমি কিনে দেব। বাড়ির জন্য তো শপিং করবই, তুমিও থেকো সঙ্গে।

স্যুপ এসে গেল। গরম ধোঁয়া উঠছে। সূর্য অল্প টম্যাটো সস মেশাল, তিয়া চিলি। পোর্সিলিনের চামচে সামান্য স্যুপ তুলে ফুঁ দিতে দিতে তিয়া বলল,— অফিস কি লক্ষ্মীপুজো অবধি বন্ধ থাকছে?

এবার থাকুক। তবে ষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের যেতে হবে রোজ।

পুজোর আগে কি আর কোনও অর্ডার হবে?

চান্স নিতে হবে। খুচখাচ যদি এসে যায়... দোকান-টোকান ওপেনিং...। প্লাস, পেমেন্ট কালেকশন...।

ইভিটারটা মিলবে কি? হোপ দিল কিছু?

পুজোর সময়ে তো... পসিবিলিটি একটু আছেই। এখন তোমার ক্যালি।

আর কানেক্টিভিটির লাক।

হাসি-গল্পের মাঝেই এক পরিবার ঢুকেছে রেস্তোরাঁয়। বাবা, মা আর দুটো বাচ্চা। অবিকল একরকম দেখতে বাচ্চা দুটো। সম্ভবত যমজ। দুষ্টুমিতে দুটো ছেলেই সমান ওস্তাদ, এ-টেবিল ও-টেবিল দৌড়ে বেড়াচ্ছে। জিন্‌স জুটি কোল্ড-ড্রিঙ্ক নিল। একই বোতলে দু'খানা স্ট্র। ফুড়ুক ফুড়ুক টানছে, আর ফিকফিক হাসছে দু'জনে। কাউন্টারের বাঙালি ম্যানেজার, মালিকও হতে পারে, চ্যানেল ঘুরিয়ে দিল। টিভিতে এখন ক্রিকেট। পুরনো ম্যাচ। ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া।

সচিন বোল্ড। দ্রাবিড় নামছে। তিয়া টিভি থেকে চোখ সরিয়ে নিল। স্যুপ শেষ করে মুখ মুছছে ন্যাপকিনে।

সূর্যর পাত্র আগেই সাফ। একদৃষ্টে তিয়ার খাওয়া দেখছিল সূর্য। হঠাৎ বলল,— এবার আমাদের কাজের কথাটা হোক?

কী?

পুজোয় আমরা কী করছি?

তিয়া চোখ রাখল সূর্যর চোখে। তারপর আচমকাই ফিক করে হেসে ফেলেছে,— ডায়মন্ড হারবার কিন্তু যাচ্ছি না।

কেন? কী হয় গেলে?

ত্যাত্, ওরকম দু'-চার ঘণ্টার জন্য হোটেলে...

ও কে। দু'-চার দিনের জন্যই চলো কোথাও। দিঘা... কিংবা ঝাড়গ্রামের কাছে একটা এক্সেলেন্ট রিসর্ট আছে... জঙ্গল জঙ্গল, পাহাড় পাহাড়... কলেজে পড়ার সময়ে একবার গেছিলাম।

তিয়ার মন পলকের জন্য দুলে উঠল। পরক্ষণে ছদ্ম গাম্ভীর্যে চোখ পাকিয়েছে,— ইস রে, যাব বললেই যাওয়া যায় নাকি?

মুশকিল কেয়া হ্যায়?

বাড়িতে কী বলে যাব?

দিঘাতে সেবার যা বলে গেছিলে। কোনও বন্ধু-টন্ধুর নাম করে দেবে।

তিয়া ঈষৎ দূরমনা আবার। সৌরভ স্ট্রেট ড্রাইভে চার মারল, দেখেও দেখল না। বাড়িতে মিথ্যে বলবে? গত বছর অষ্টমীর দিন সকালে বেরিয়ে সন্ধেয় ফিরেছিল, মা কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি, কৈফিয়ত দেওয়ারও প্রয়োজন

ছিল না। তা বলে তিন-চার দিন...? যাদের নাম করে যাবে, তারা যদি কোনও কারণে বাড়িতে ফোন করে... টুপি তখন একটা দেওয়া যেতেই পারে, কিন্তু তিয়া কি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে না?

দু'দিকে ঘাড় নেড়ে তিয়া বলল,— নাহ্, তা হয় না।

কিউ?

গুল মেরে যাওয়াটা আমার কেমন কেমন লাগে।

ও কে, দেন স্পিক আউট দা ট্রুথ। স্ট্রেট বলো, আমার সঙ্গে যাচ্ছ। দুটো অ্যাডাল্ট ছেলেমেয়ে... দোজ হু আর এনগেজড... যেতেই পারে একসঙ্গে।

খুউব, অ্যাঁ? তিয়া চোখ পাকাল। বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল,— ছাঁদনাতলায় বসার আগে আর ওসব হচ্ছে না স্যার।

প্লিজ তিয়াস। সূর্য হাতে হাত রেখেছে। মৃদু চাপ দিয়ে বলল,— চলো না।

খাবার হাজির। প্লেট, চামচ, কাঁটা, সাজিয়ে দিল ওয়েটার। সূর্যর প্লেটে মিক্সড চাউমিন তুলে দিল তিয়া। খানিকটা গার্লিক প্রনও। নিজেও নিয়েছে।

কাঁটায় একটা চিংড়ি গেঁথে মুখে পুরল সূর্য। উৎসুক মুখে তিয়া জিজ্ঞেস করল,— কেমন বানিয়েছে?

চলতা হ্যায়। তবে আমার জন্য রসুনটা একটু বেশি।

আমার কিন্তু রসুনের স্মেল দারুণ লাগে। ইনফ্যাক্ট, আমি তো মাঝে মাঝে কাঁচা রসুন খাই।

কই, গন্ধ পাইনি তো?

আমি একই দিনে চুমু আর রসুন খাই না।

সূর্য হা হা হেসে উঠল। ও-পাশের টেবিলের পরিবারটি জুলজুল চোখে দেখছে। তিয়া চোখে ধমক এঁকে তাকাতেই সূর্য গপ করে গিলে নিয়েছে হাসিটা। একবারে অনেকটা চাউমিন মুখে ভরে বলল,— তা হলে কী ঠিক হল? আমরা যাচ্ছি তো?

দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি যে জাস্ট নাউ কায়দা মেরে বললে, দোজ হু আর এনগেজড...! তিয়া ভ্রূভঙ্গি করল,— আমাদের এনগেজমেন্টটা হল কবে?

হয়নি, না? সূর্য খিকখিক হাসল,— চলো তা হলে সেরে ফেলি। পুজোয় তোমায় একটা ডায়মন্ড রিং কিনে দিই।

ব্যস, তাতেই বুঝি হয়ে যায়? আর কোনও ফরম্যালিটি নেই?

বলো কী আছে?

অনেক অনেক কিছু। তোমার বাবা-মা আমায় দেখেননি, আমার বাবা-মাও তোমাকে মিট করেনি, আমিও তোমার বাবা-মাকে দেখিনি, তুমিও আমার বাবা-মাকে চেনো না...

উরেব্বাস, এ তো সিরিজ অব ইভেন্ট!

এটুকু তো লাগবেই সোনা। আমরা তো পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করব না। রেজিস্ট্রি করি, কি সোশাল ম্যারেজ... দু'বাড়ির কনসেন্ট নিয়েই করব। অবশ্য অসম্মতির তো কোনও কারণ দেখি না। তবে হ্যাঁ, ফার্স্ট স্টেপটা তোমাকেই নিতে হবে।

কী রকম?

অনেক দিন ধরে তো বলছি, মা তোমায় দেখতে চেয়েছে। চলো একদিন।

সে তো আমার মাও কবে থেকে বলছে...

উঁহুঁ। নিয়ম এখন উলটো। আগে মেয়ের বাড়ির লোক ছেলেকে দেখবে, তারপর মেয়ে গিয়ে দর্শন দেবে।

ওয়েল...। সূর্যর চোখে কপট উদ্‌বেগ,— অ্যাকর্ডিং টু ইউ, তোমার মা তো ললিতা পাওয়ার টাইপ নন!

গেলেই টের পাবে।

তোমার বাবাও কি প্রেজেন্ট থাকবেন?

থাকতেই পারে। আগে থেকে বলব কেন?

না মানে... ইন্টারভিউয়ের জন্য তো সেভাবে প্রিপেয়ার্ড হতে হবে। সূর্যর ঠোঁটে হাসি, কপালে ভাঁজ,— আচ্ছা, উনি কি ভীষণ কড়া?

তিয়া এককথায় উত্তর দিতে পারল না। বাবাকে কঠিন, নরম, কোনও ধাঁচেই ফেলা যায় কি? মা'র সঙ্গে বাবার ব্যবহার, আর রাতবিরেতে তিয়া যখন কম্পিউটারে, তখন হঠাৎ হঠাৎ এসে তার মাথায় হাত রেখে বাবার নরম কথা বলা— দুটো কি এক? বাবার কোন রূপটা সত্যি, তাও তো তিয়ার বোধগম্য হল না এখনও।

সূর্যর চোখে কৌতুক চিকচিক। তিয়ার দৃষ্টি সূর্য থেকে সরে গেছে। সৌরভ মিড-উইকেটে ক্যাচ তুলে আউট, কাউন্টারের লোকটা দুম করে বদলে দিল চ্যানেল। রিমোট টিপে পর পর প্রোগ্রাম ঘুরছে। দু'-চার সেকেন্ডের বেশি স্থির হচ্ছে না কোথাও।

আচমকা পরদায় এক চেনা মুখ! পলকের জন্য! পলকে সরেও গেছে!

তিয়া অস্ফুটে বলে উঠল,— আরে, ইন্দ্রজিৎ না?

সূর্য চোখ কুঁচকোল,— কে ইন্দ্রজিৎ?

আরে, হ্যাপি হোমের সেই ভদ্রলোক! তিয়া গলা উঠিয়ে কাউন্টারের লোকটাকে বলল,— দাদা, আগের চ্যানেলটা একটু দেবেন?

কোনটা?

ঘোরান, ঘোরান।... হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো। এখানে।

হ্যাঁ, ইন্দ্রজিৎই। তিয়া স্তম্ভিত চোখে দেখল, দু'জন পুলিশ থানায় ঢোকাচ্ছে ইন্দ্রজিৎকে। রুমালে মুখ ঢাকার চেষ্টা করছে ইন্দ্রজিৎ, তবে তাকে চিনতে কোনও অসুবিধে হয় না। পরনে সেই জিন্‌স-পাঞ্জাবি।

সূর্য ঘুরে বসেছে। চেঁচিয়ে বলল,— বাড়ান তো, বাড়ান তো সাউন্ডটা।

সংবাদ পাঠিকার গলা বেজে উঠল,— আজ সকালেই নরেন্দ্রপুরের আশ্রম থেকে এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, ইন্দ্রজিৎ রায় এক প্রথম শ্রেণির ধূর্ত প্রতারক। মূকবধিরদের নিয়ে হ্যাপি হোম বলে যে এন-জি-ও-টি সে চালাচ্ছিল, তার কাগজপত্র সবই জাল। যে সব মানুষের নাম এন-জি-ওর সদস্য হিসেবে দেখানো আছে, সেগুলোও ভুয়ো। হ্যাপি হোম দেখিয়ে নানান সংস্থা থেকে অর্থ সংগ্রহই ছিল ইন্দ্রজিতের মূল পেশা। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ জাল হিসেবপত্র পাঠিয়ে বিদেশ থেকেও সে বিস্তর টাকা পেয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, এই ইন্দ্রজিৎ রায়ের অতীতও অতি বর্ণময়। দশ বছর আগে একটি প্রাইভেট কোম্পানির তহবিল তছরুপ করে তার প্রতারণার জীবন শুরু। তখনই সে গ্রেফতার হয়েছিল, কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে সে একটি বিয়েও করেছিল, তার স্বরূপ জানতে পেরে তার স্ত্রী বছর পাঁচেক আগে তাকে ত্যাগ করে। লোক ঠকানো বিপুল অর্থ ডিসকো, নাইটক্লাবে গিয়ে দু'হাতে ওড়াত ইন্দ্রজিৎ। সম্প্রতি তাকে নাইটক্লাবে দেখে হ্যাপি হোমকে সাহায্যকারী এক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের মনে সন্দেহ জাগে। তাঁরই অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। লেক গার্ডেন্সে ইন্দ্রজিতের একটি ফ্ল্যাটেরও সন্ধান পেয়েছে পুলিশ এবং সেখান থেকে আরও চাঞ্চল্যকর সব নথিপত্র মিলেছে...

শ্রবণেন্দ্রিয় যেন অসাড় হয়ে আসছিল তিয়ার। যা শুনছে, তা কি সত্যি? হ্যালুসিনেশন নয় তো? এই তো দিন দশেক আগেও তিয়া হোমে গিয়েছিল, লোকটা তখন বলল, পুজোয় ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে

আসবে...! সে-দিনও খুব অনুনয় করছিল, একটা-দুটো কোম্পানিতে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে... সব মিথ্যে? সব?

তিয়ার গোটা শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। একটা বমি উঠে আসছিল গলায়। তখনই সূর্যর স্বর, বিকৃত উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল,— দেখেছ তো, দেখেছ তো, তোমার ইন্দ্রজিৎ কী মাল? শিক্ষা হল তো?

তিয়া কপাল টিপে ধরল,— চুপ করো। ভাল লাগছে না। আমার কষ্ট হচ্ছে।

এখন কষ্ট হলেই হল? কেন চুপ করব? বারবার তোমায় মানা করেছি লোকটাকে নিয়ে নাচানাচি করতে। চারদিকে এখন এরকম বহুত ফ্রড বেরোচ্ছে। লোকটা তোমায় পাকড়াও করে সেন্টু দিল, তুমিও তার পিছনে ছুটতে লাগলে!

অসহায় চোখে সূর্যকে দেখছিল তিয়া। সবই তো বুঝছে সে, কিন্তু সূর্য কেন তাকে অনুভব করার চেষ্টা করছে না? তার কেজো জগতের বাইরে অন্য এক ভুবনের সন্ধান পেয়েছিল তিয়া, সেই পৃথিবী নিমেষে চুরচুর, এ কি কম যন্ত্রণার? এ যন্ত্রণা ইন্দ্রজিৎ নামের জোচ্চরটার কাছে ঠকে যাওয়ার কষ্টের চেয়ে ঢের ঢের বেশি। অন্তত এই মুহূর্তে কি সূর্য একটু নরম করে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে না?

ক্ষণিকের জন্য তিয়ার চোখে হ্যাপি হোম ভেসে উঠল। একটা সবুজ খেত... নয়ন-কমল-গণেশদের মুখ... সরল উজ্জ্বল চোখ... শব্দহীন হাসি...! প্রাণপণে কান্না চেপে তিয়া বলল,— ছেলেগুলোর এবার কী হবে?

সূর্য বিদ্রূপের স্বরে বলল,— গন টু মায়ের ভোগ। চিটিংবাজের পোঁ ধরে ছিলি, এবার ঠ্যালা বোঝ!

কিন্তু ওদের এখন চলবে কী করে? ওরা তো কোনও দোষ করেনি?

ওসব তোমার না ভাবলেও চলবে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সূর্য বলল,— ওরা এখন গভর্নমেন্টের হেডেক। থাউজ্যান্ড অ্যান্ড ওয়ান হোম আছে, কোথাও একটা ঠিক পুশ করে দেবে।

তিয়ার স্বর ভিজে এল,— তুমি জানো না সূর্য, ছেলেগুলো বড্ড ধাক্কা খাবে। ওদের কপাল।

আমাকেও ওরা ভীষণ ভালবাসে সূর্য।

অ্যাই, স্টপ দিস ননসেন্স। ঢংয়ের কথাগুলো বোলো না তো। কোথায় কোন এক চিটিংবাজের আখড়ায় গিয়ে পড়েছিলে, মানে মানে বেরিয়ে

আসতে পেরেছ, পুলিশ-ফুলিশের গাড্ডায় ফাঁসতে হল না, এটাই তো এনাফ। সূর্য গলা ঝাড়ল,— একটা কথা শুনে রাখো, তিয়াস। এবার থেকে দুমদাম উলটোপালটা জায়গায় আর ভিড়বে না। নিজেকে বেশি ওস্তাদ ভাবার দরকার কী, অ্যাঁ? আমি মানুষ চিনি, আমার কথা একটু শুনে চোলো।... ঢুকল মাথায়?

সূর্যর স্বর হঠাৎ বাবাকে মনে পড়িয়ে দেয় কেন? অবিকল এই ভঙ্গিতেই না মাকে দাবড়ায় বাবা? তিয়া টের পেল, বুকটা তার আচমকা শুনশান হয়ে গেছে। নাকি এ এক দুঃসহ ভার? যা অবশ করে দেয় হৃৎপিণ্ড?

টেবিলে ভর দিয়ে তিয়া উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। পারছে না। পা দুটো যেন জেলির মতো তলতলে সহসা।

সূর্যর নজরে পড়েছে। অবাক মুখে বলল,— কী হল তোমার? যাচ্ছ কোথায় এখন?

তিয়া ক্ষীণ গলায় বলল,— বাড়ি।

কেনওও? খাও, খাওয়াটা শেষ করো। এত কিছু নিলে...

ইচ্ছে করছে না সূর্য। বিশ্বাস করো।

কী ব্যাপার বলো তো? ফ্রডটাকে খিস্তি মারলাম বলে চটে গেলে নাকি? সূর্য হ্যা হ্যা হাসছে। গলায় ফের ব্যঙ্গ হেনে বলল,— এখনও হারামিটার ওপর থেকে তোমার উইকনেস যায়নি, অ্যাঁ?

এই হৃদয়হীন, বোধবুদ্ধিবিহীন, অনুভূতিশূন্য সূর্যর সঙ্গে একটা গোটা জীবন পাড়ি দেবে তিয়া?

মাথা ঘুরছে বনবন। দুলছে পৃথিবী। কোনওরকমে টলতে টলতে বেসিন অবধি গিয়ে তিয়া হড়হড় বমি করে ফেলল। যাক, নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধু বেরিয়ে যাক।

পনেরো

একটা চোরা আশঙ্কায় দোলা ক্রমশ বিহ্বল হয়ে পড়ছিল। এ কী এক অস্বাভাবিক আচরণ করে চলেছে তিয়া? নয় নয় করে পাঁচটা দিন কেটে গেল, এখনও নিজের কুঠুরি ছেড়ে প্রায় বেরোচ্ছেই না। ওই হয়তো দোলা সাত বার ডাকাডাকি করল, তো মেয়ে এল খেতে। তবে টেবিলে বসাই সার, মুখে কিছুই তুলছে না সেভাবে। মাথা নিচু করে ভাত খুঁটছে, কিংবা অভিব্যক্তিহীন মুখে

কুচুর কুচুর চিবোচ্ছে রুটি। যেন স্রেফ খেতে হয় বলেই খাওয়া। যেন খিদেতেষ্টা, স্বাদগন্ধের বোধই আর নেই। ঘরেও কি সে করছে কিছু? শুয়ে আছে, শুয়েই আছে। হয় চোখ বোজা, নয় বোবা দৃষ্টি সিলিংয়ে স্থির। কম্পিউটার খুলছে না, আইপড অবহেলায় পড়ে, এমনকী মোবাইল পর্যন্ত বন্ধ রেখেছে পাকাপাকি। হল কী মেয়ের?

তুহিনও কম দুশ্চিন্তায় নেই। তাকে দেখেও দোলা যথেষ্ট চিন্তিত। মুখ-টুখ কেমন যেন হয়ে গেছে তুহিনের, গলার তেজ উধাও। কেমন দিশেহারা দিশেহারা দশা। অফিসে গেলে কস্মিনকালে বাড়ির ব্যাপারে তুহিনের হুঁশ থাকে না, এখন দু'বার-তিনবার করে ফোন। কেমন আছে? খেয়েছে তো? কথা বলল? টিভি দেখছে? তুহিনের এত উৎকণ্ঠা দোলা কখনও দেখেনি। চাকরি নিয়ে, মায়ের অসুখের সময়ে, অনেক দুর্বিপাক গেছে, তখনও না। টেনশনে টেনশনে মানুষটা অসুস্থ না হয়ে পড়ে!

কালও তো অফিস থেকে ফিরেই প্রথম প্রশ্ন,— কিছু বুঝলে? জানতে পারলে?

দোলার হতাশ জবাব,— নাহ্।

ছেলেটা আবার ফোন করেছিল?

সে তো বারবারই করছে। তিয়া এসে ধরছে কই! বিছানা ছেড়ে উঠছেই না।

কী বলল ছেলেটা আজ?

একই কথা। ওর সঙ্গে তিয়ার কিছুই হয়নি। যে এন-জি-ও-টায় তিয়া নাকি যেত, সেখানকার লোকটা ফোরটোয়েন্টি কেসে ধরা পড়েছে দেখেই তিয়ার নাকি শরীর খারাপ লাগতে আরম্ভ করল, ছেলেটা তিয়াকে পৌঁছে দিয়ে গেল, ওপরেও নাকি আসতে চেয়েছিল, তিয়া মানা করায়...।

ওই এন-জি-ও-র সঙ্গে তিয়া জড়িয়ে পড়েনি তো? কিংবা ওই লোকটার সঙ্গে...?

সূর্যর কথা শুনে... তেমন তো মনে হল না। তবে ছেলেটাও ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছে। বারবার বলছে, আমি একবার যাই, কথা বলি...! আমি বললাম, আর দু'-চারটে দিন যাক।

তুমি জানিয়েছ তিয়াকে?

কী?

ওই যে... ছেলেটা আসতে চাইছে?

তিয়া দেখা করতে চাইছে না বলেই তো আমি বারণ করলাম।

উম্‌ম্‌। কিন্তু কেন মিট করবে না? যদি কিছু নাই হয়ে থাকে...

জানি না। বুঝতে পারছি না।

না পারলে তো চলবে না। তুহিন রীতিমতো অধৈর্য,— আজ আমি এক ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। অফিসের দত্তর চেনাজানা। সাইকিয়াট্রিস্ট, বেশ নাম আছে। ওভার ফোন কথা হল। উনি তো শুনে বললেন, ডিপ্‌ মেন্টাল ডিপ্রেশন। নিজে নিজে কাটিয়ে উঠতে পারলে ভাল, নইলে মেডিসিন দিতে হবে। ...তুমি কিন্তু ওকে চোখে চোখে রেখো। বলা তো যায় না, হঠাৎ যদি কিছু...

রাখছি তো। সারাক্ষণ গিয়ে গিয়ে দেখে আসছি।

রাতেও তো ঘুমোচ্ছে না। আমার অমন চনচনে মেয়েটার কী যে এমন ঘটল...!

এই প্রশ্নটাই তো এখন অনবরত পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে গোটা ফ্ল্যাটে। ছুঁয়ে যাচ্ছে, বিঁধছে বাড়ির তিনটে প্রাণীকেই। হ্যাঁ, বাইরের দুনিয়া নিয়ে যে সর্বক্ষণ মশগুল, বাড়ির প্রতি যার ডোন্ট কেয়ার ভাব বেড়ে চলেছে দিন দিন, সেই তিতানও এর বাইরে নেই। সে তো তিয়াকেই কতবার বলল,— তোকে যে হার্ট করেছে, তার নাম-ঠিকানাটা আমায় দে তো দিদি। সেই এলাকার লোকাল কমিটিকে দিয়ে অ্যাইসান্‌ কড়কাব, জিন্দেগিতে আর লোচা করার হিম্মত হবে না!

এই বলশালী আশ্বাসও ভস্মে গেছে। আমল দেয়নি তিয়া।

নাহ্‌, দোলা থই পাচ্ছে না। কোনও হিসেবই মিলছে না তার। তবে বলতে নেই, আজ সকাল থেকে একটু যেন বদলেছে মেয়ে। না ডাকতেই টুকটুক করে এসে জলখাবার খেয়ে গেল। খুবই সামান্য অবশ্য, মাত্র দু'পিস স্যান্ডুইচ। কম্পিউটারও একবার খুলেছে। মিনিট পনেরো-কুড়ি কী সব করল, তারপর ফের বিছানায়।

বেলা বারোটা নাগাদ হঠাৎ তুহিনের ফোন। ঈষৎ উত্তেজিত গলা,— আজকের কাগজটা পড়েছ?

এখনও দেখা হয়নি। কেন?

আমিও দেখিনি। অফিসে একজন, ক্যাজুয়ালি বলছিল, কোন একটা এন-জি-ও-র ফ্রড কেস নিয়ে কাগজে কী সব লিখেছে আজ। কথা শুনে মনে হল, তিয়ার সেই নরেন্দ্রপুরের ঘটনাটা। ...একটু দ্যাখো তো।

হ্যাঁ, তুহিনের আন্দাজই ঠিক। ভয়ংকর এক শয়তানের কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। এবং সূর্য যেমন বলেছিল, লোকটা সেই ইন্দ্রজিৎ রায়ই। গতকাল লোকটাকে আবার কোর্টে তোলা হয়েছিল, আরও পনেরো দিন তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

উফ্, এই লোকটাই কি যত নষ্টের গোড়া? আর একবার খবরটা খুঁটিয়ে পড়ল দোলা। তারপর ভাবল একটু। কী মনে করে সটান এসেছে মেয়ের ঘরে, কাগজটা নিয়েই।

তিয়া চোখে হাত চেপে শুয়ে। শান্ত গলাতেই মেয়েকে ডাকল দোলা,— শুনছিস?

উঁ?

ওঠ তো একটু। কথা আছে।

মাত্র ক'দিনেই কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেছে তিয়া। দোলার স্বর শুনে সেই নীরক্ত মুখে আবছা বিস্ময়। উঠে বসল আস্তে আস্তে।

দোলা সন্ধানী চোখে জিজ্ঞেস করল,— ইন্দ্রজিৎ রায়ের নিউজ বেরিয়েছে আজ। নিশ্চয়ই দেখিসনি?

মা'র মুখে নামটা শুনে তিয়া কি চমকাল একটু? দোলা বুঝতে পারল না। তিয়ার ঠোঁট শুধু নড়েছে সামান্য,— না।

দোলা খবরের কাগজখানা বাড়িয়ে দিল,— দ্যাখ্।

তিয়ার যেন তেমন কৌতূহল নেই। ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে পাশে রেখে দিল কাগজ।

দোলা সংশয়ের সুরে বলল,— পড়া হয়ে গেল?

নতুন তো কিছু নেই। মেয়ের মুখ ফুটেছে,— সেদিন টিভিতেও তো এ-সবই বলল।

বাব্বা, এ তো সাংঘাতিক বদমাইশ! ধরা পড়ে আপদ চুকেছে।

আশ্চর্য, তিয়াও সায় দিল,— অবশ্যই।

দোলা এতক্ষণে বুঝি খানিক জোর পেল মনে। মেয়ের কাঁধে হাত রেখে বলল,— তা হলে বুঝছিস তো, এমন একটা বাজে লোকের জন্য মন খারাপ করার কোনও মানে হয় না!

তিয়া চোখ কুঁচকে তাকাল,— ইন্দ্রজিৎ রায়ের জন্য মন খারাপ? এরকম উদ্ভট ধারণা তোমার হল কী করে?

দোলা নরম করে হাসল,— বুঝি রে, বুঝি। এক আধটা ভুলভাল এই বয়সে হয়েই যায়। ও এমন কিছু দোষের নয়। ...সত্যি তো, কে যে কী রকম সব সময়ে কি চেনা সম্ভব?

হঠাৎই ছিটকে সরে গেল তিয়া। নিষ্প্রভ চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠেছে। তীক্ষ্ণ গলায় বলল,— কিস্যু বোঝোনি। আমি সূর্যকে ভালবাসতাম। এখনও বাসি। ফর নাথিং ইন্দ্রজিৎ রায়ের ওপর আমার উইকনেস গ্রো করবে কেন?

ও। দোলা থতমত,— তা হলে তো... কোনও সমস্যাই নেই!

আছে মা, আছে। তিয়ার স্বর ফের নিবে এল,— কোনও একটা বিশ্বাস, কিংবা কোনও একটা আদর্শ, যদি ভেঙে যায়, সেটা মানুষকে দুঃখ দেয় মা। কিন্তু সেই দুঃখটাকে যদি একান্ত আপনজনও ফিল করতে না পারে, সেটা কি আরও বেশি দুঃখের নয়?

দোলা কথাগুলো ঠিকঠাক অনুধাবন করতে পারল না। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছে।

তিয়া খাটের বাজুতে হেলান দিল। দোলাকেই দেখছে। হঠাৎই জিজ্ঞেস করল,— তুমি নাটকের গ্রুপটা ছেড়ে দিয়েছিলে কেন মা?

অতর্কিত প্রশ্নটার জন্য দোলা এতটুকু প্রস্তুত ছিল না। আমতা আমতা করে বলল,— বা রে, সংসার-টংসার ফেলে কি ওসব নিয়ে মাতলে চলে?

উঁহুঁ, তুমি সত্যি বলছ না।

আর কী কারণ থাকতে পারে?

নিজের মুখেই বলো। এত বছর পর আর মিথ্যে যুক্তির প্রয়োজন আছে কি?

কেন জিজ্ঞেস করছিস তিয়া? দোলা ঈষৎ অশান্ত হয়েছে। অভিমানী স্বরে বলল,— দেখেছিসই তো, তোর বাবা কেমন করত! তার পরে কারও আর...

জানি। তখন আমি এমন কিছু শিশু ছিলাম না। ...এবার বলো তো, তখন কি তোমার বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়নি? চিরকালের মতো? সম্পর্কটাকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে?

দোলা থরথর কেঁপে উঠল। মেয়ের চোখ কি সার্চলাইট? এ যেন সেই দৃষ্টি, যা দিয়ে একটা মেয়েই শুধু আর একটা মেয়ের ভেতরটাকে পড়তে পারে। কিন্তু দোলা কী করে তিয়াকে বলে, এখনও সেই বাসনাটা মনে মনে গুমরোয়? ধিকিধিকি জ্বলে? দোলাকে পোড়ায়?

তিয়া ফের বলল,— কী হল? চুপ কেন? বলো? আটার সামথিং।

দোলা সত্যিটাকে অসন্তোষের আবরণে ঢাকতে চাইল। বিরক্ত মুখে বলল,— কেন আজেবাজে বকছিস? এসব প্রশ্নের কোনও অর্থ হয়?

এতক্ষণে তিয়ার ঠোঁটে এক ফালি হাসি দেখা দিয়েছে। মলিন। আকাশছাওয়া ঘন মেঘের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো আসে, এ যেন ততটুকুই। মৃদু গলায় বলল,— থাক। জবাব আমি পেয়ে গেছি।

কী...? কী...? কী বুঝলি?

শুনে কী হবে? তুমি তো আর নিজেকে...। তিয়া থেমে গেল। অনেকটা বাতাস টানল ফুসফুসে। কেটে কেটে বলল,— আমি তোমার মতো নই মা। সারেন্ডার আমি করব না। নেভার। যাকে ভালবাসি, তার কাছেও না।

তুই সূর্যকে ছেড়ে দিবি নাকি?

ডিসিশনটা কঠিন ছিল। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করা তো...।

ভুল করবি তিয়া। সূর্য তোকে এত ভালবাসে... দিনরাত তোর জন্যে পাগলের মতো করছে...

শুধু ভালবাসাই যথেষ্ট নয় মা। সংসার গড়ার জন্য আরও কিছু লাগে। তুমি জানো না...?

দোলা স্তব্ধ তাকিয়ে। হঠাৎই অনুভব করতে পারছিল, তিয়া অনেক অনেক বড় হয়ে গেছে। বুঝি বা দোলার চেয়েও। মেয়েকে সে এত দিনে যেন একটু একটু চিনতে পারছে। হয়তো মেয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেকেও।

ইস, কেন যে একটা গোটা জীবন ভুল ভাবে কাটাল দোলা!

দোলার স্বামী তুহিন সেলস অফিসার, অফিসের কাজে সে বাইরে বাইরে ঘোরে। ছেলে তিতান কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন নিয়ে জোর মজে আছে। মেয়ে তিয়ার চাকরি এক গাড়ি ডিস্ট্রিবিউটারের শো-রুমে। তিয়ার বয়ফ্রেন্ড সূর্য। সবাই যার যার মতো ব্যস্ত। শুধু দোলারই নিজস্ব জীবন নেই, সে সবার জীবনের সহকারিণী মাত্র। সুচিত্রা ভট্টাচার্যর 'চার দেওয়াল' উপন্যাস স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের এক আশ্চর্য কাহিনি।

9 788177 566932